# মানসা-মঞ্জুষা

[ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য কবিতাবলীর সহায়িকা ]

মঞ্জুষা-সম্পাদক

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও বসু

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা ১২

# মানসী-মঞ্জুষা

# MANASI-MANJUSHA

A Critical and Annotated Edition of Tagore's MANASI

[ Selected pieces only ]

*Manjusha Editor* :

PROF. BHATTACHARYA AND BASU

অক্টোবর, ১৯৬০

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীবিভূতিভূষণ রায় কর্তৃক বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৫এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কলিকাতা ৭ হইতে মুদ্রিত

## নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যখানি রবীন্দ্রসাহিত্যে অধিকারপ্রাপ্ত, বিজ্ঞ পাঠক ও সমালোচকদের নিকটই দুর্গম বলিয়া মনে হয়, শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের নিকট ইহা তো জটিল বোধ হইবেই। অনেকেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য-প্রবিষ্ট স্নাতকশ্রেণীর জন্য এরূপ গ্রন্থ ও ইহার কবিতাগুলি নির্বাচিত করিবার সার্থকতা কী? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও বয়সের যে-কোনও ধরণের কাব্যই শিক্ষাতালিকার সবস্তরে আসন পাইতে পারে। যে-কোনও ধরণের পাঠার্থীই তাহা হইতে আপন জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচিমত রবীন্দ্রপ্রতিভার সামর্থ্য অনুভব করিবে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও গ্রন্থই পাঠকসাধারণের নিকট হইতে যে সূক্ষ্ম রসবোধ, গভীর অভিনিবেশ ও আন্তরিক অন্তরঙ্গতা দাবী করে, মানসী তাহা হইতে ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মানসী অপেক্ষা সরলতর অথবা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল কাব্য ছিল, এইরূপ মন্তব্য ছাত্রদের বুদ্ধিবিবেচনার ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া দেখিবার পক্ষে সাধু কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সন্তোষজনক নয়।

পরন্তু মানসী কাব্যখানিকেই পাঠ্যগ্রন্থ করিবার কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এই গ্রন্থে আমরা সম্যকভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, মানসী রবীন্দ্রকাব্যরহস্যে প্রবেশের সিংহদ্বার-স্বরূপ। মানসী কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিকশিত-যৌবনের রবিরশ্মিগুলিকে সংযত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের কাব্য-সাধনার মুখ্য পালাগুলি মানসীতেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঋতু-প্রকৃতি-নারী-প্রেম-সৌন্দর্য এই সকল বিষয়ে কবির যে মনোভাব মানসীর কবিতাগুচ্ছে ধরা পড়িয়াছে, তাঁহার পরবর্তী কাব্যগুলি তাহারই আরও বিতানিত বিশুদ্ধ বিকাশ মাত্র। সুতরাং মানসী কাব্যটিকে মনোযোগ-সহকারে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করিতে পারিলে রবীন্দ্রকাব্য-সরণিতে প্রবেশ মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিবে, ইহাই হয়ত মানসী কাব্য-পাঠের ভূমিকা।

এইজন্য প্রথমে দীর্ঘ একান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিশেষ শ্রম ও নিষ্ঠাসহকারে মানসী কাব্যের সামগ্রিক বিশিষ্টতা বিচার করা হইয়াছে। এই আলোচনা কেবল ছাত্রছাত্রীদের নিকটই মহামূল্যবান তাহা নয়, যে কোনও সাধারণ পাঠকের নিকটও প্রয়োজনীয় বোধ হইবে। কবিতা বিশেষের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ, তাহার অঙ্গগত খুঁটিনাটি তথ্যসন্ধান ছাড়াও সমগ্র কাব্যের প্রতিটি কবিতার সহিত একপ্রকার মৌন-সংযোগ থাকে। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্ষেত্রে। তাহার কোনো কাব্যই নির্দিষ্ট সময়কালে রচিত নানাচারী কবিতার নির্বিচার সংকলন মাত্র নয়, এবং ইহার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কাব্যই একটি কোনো নির্দিষ্ট বাণীর বেদনায় উৎকণ্ঠিত, কোনো এক বিশেষ শৈল-শিখর হইতে উৎসারিত নদীর মত তাহা নির্দিষ্ট উপত্যকার উপর আসিয়া পড়ে, তারপর বিপ্রমুখী হয়। তাই তাহার পরবর্তী কাব্যের সহিত পূর্ববর্তী কাব্য কখনই একরূপতা লাভ করে না। মানসীর পর সোনার তরী, কিন্তু অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বলাকা ও পলাতকা, কী বিস্ময়কর পরিবর্তন। ইহাই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঋতুবদল।

এই ঋতুবদলের মানচিত্র অঙ্কন কাব্যের সৌন্দর্য-আবিষ্কারে বা রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণে ধরা পড়িবার কথা নয়। পাঠ্যতালিকায় সব কবিতা থাকে না, অথচ বর্জিত কবিতাগুলি কাব্যের মর্মবাণী গ্রহণে গভীর প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কয়েকটি কবিতা পাঠ্য থাকিলেও সমগ্র কাব্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীর ধারণা থাকিবে না, ইহা অমার্জনীয় অপরাধ। এইজন্য মানসীর ভূমিকা অংশে এই কাব্যের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচিত হইল। মানসী-পূর্ববর্তী কবিমানস ও মানসী-পর্বযুগের কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মানসীর যুগটির স্বরূপ, কবিতাগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস ও স্থান কালের ভিত্তিতে ইহাদের বৈশিষ্ট্য, মানসী নামকরণের সার্থকতা ও কবিরচিত ভূমিকার তাৎপর্য, মানসী কাব্য-রচনাকালে কবির শোকবেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রহস্য, সামাজিক কবিতাগুলির পটভূমিকা, এই কাব্যের রোমান্টিক ধর্ম এই অংশে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি অধ্যায়ে মানসী কাব্যে কবির ছন্দোচাতুর্য ও

মানসীর বিবিধ ছন্দের অভিনবত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে ও তৎসহ ইহার রূপসৌন্দর্যধর্মেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। মানসী কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে নৈরাশ্যবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাও বিস্তারিতভাবে বিচার করা হইয়াছে। সবশেষ দুইটি অধ্যায়ে প্রেমের কাব্য ও প্রকৃতির কাব্য হিসাবে মানসীর প্রেম ও প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির সুচারুবিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

মোটের উপর মানসী কাব্যের এইরূপ সবাঙ্গ-সম্পূর্ণ আলোচনা এই জাতীয় সহায়ক গ্রন্থে পূর্বে করা হয় নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যরসিক সাধারণ পাঠকের নিকটও মানসী সম্পর্কিত এই আলোচনাটি বহুমূল্য বিবেচিত হইবে। বিভিন্ন রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনা-গ্রন্থের মতামত উদ্ধার করিয়া ইহা ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। সুনিপুণ রসবোধ, বিশ্লেষণশক্তি ও অধিকার ইহার প্রতিটি পংক্তিরচনায় নিয়োজিত হইয়াছে, ইহা পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন। প্রতিটি কবিতা স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিবার পূর্বে এই অংশ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে ছাত্রছাত্রীদের নিকট মানসী কাব্য আস্বাদন যে আনন্দজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নাতক পাঠার্থীগণ এই ভূমিকাংশ সযত্নে পাঠ করিলে উপকৃত হইবে।

**অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও বসু**
সম্পাদক

# সূচীপত্র


| | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সাধারণ আলোচনা ও কাব্যভূমিকা | | ... | ১ |
| নিষ্ফল কামনা* | ... | ... | ৫২ |
| একাল ও সেকাল | ... | ... | ৭৪ |
| সিন্ধুতরঙ্গ | ... | ... | ৯৩ |
| সুরদাসের প্রার্থনা | ... | ... | ১২১ |
| গুরু গোবিন্দ | ... | ... | ১৪৮ |
| ভৈরবী গান | ... | ... | ১৬৩ |
| বর্ষার দিনে | ... | ... | ১৮৩ |
| অনন্ত প্রেম | ... | ... | ১৯১ |
| মেঘদূত | ... | ... | ২০০ |
| অহল্যাব প্রতি | ... | ... | ২৩০ |


*চিহ্নিত কবিতা বর্তমান বৎসর পাঠ্য নয়

# মানসী-মঞ্জুষা

## সাধারণ আলোচনা ও কাব্যভূমিকা

### মানসী-পূর্ববর্তী কবিমানস

মানসী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণায়ত যৌবনের শক্তিপরীক্ষার কাব্য। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পরবর্তী সম্ভাবনা ও প্রবণতাগুলি প্রায় আত্মশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম যৌবন সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ ধারণাগুলি এখানেই ধীরে ধীরে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। অবশ্য বিপুল কাব্যসাধনার দিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাকাইলে কবির নিতান্ত কৈশোর বয়সের অপটু রচনাগুলিও আজ আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অপটু অপ্রাপ্তবয়স্ক লেখনীর চল-চাঞ্চল্যের ভিতরেও তাঁহার পরবর্তী কবিজীবনের মুখ্য বাণীটিকে ঐতিহাসিক-গণ ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়াছেন। অথচ আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা হইতে সেই বালগোপালের ব্রীড়া-ক্রীড়াচিহ্নগুলিকে মুছিতে পারিলে কবি যেন কতই স্বস্তি পাইতেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মানসীর পূর্ব পর্যন্ত স্বরচিত কাব্যগুচ্ছকে কবি কেন মূল্যমান বা মর্যাদা দিতে চাহেন নাই, এবং মানসী হইতেই কেন আপনার কাব্যজীবনের সূচনা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

মানসী কাব্যে পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্যের স্থায়ী-ভাব

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে কবি যে আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন, সেখানে মানসী কাব্য রচনাকালের কোনো বিবৃতি নাই। জীবনস্মৃতি কবির শৈশব ও কৈশোর বয়সের স্মৃতিসৌহার্দ্যের বর্ণনা। জীবনের সিংহদ্বারে আসিয়াই কবি শিল্পীর হাত হইতে তুলিকা কাড়িয়া লইয়াছেন। তথাপি মানসী-পূর্ব কালের মানস অবস্থার একটি পরিচয় তথা হইতে সংকলিত করা যাইতে পারে। জীবনস্মৃতির শেষ পরিচ্ছেদে কবি লিখিয়াছেন,

প্রাক্‌মানসী কবিমানস

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশ ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালমন্দ সুখদুঃখ বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে। তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত হাল্‌কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া,

জীবনস্মৃতির সমাপ্তি-পর্ব

কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন, তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।"

জীবনস্মৃতির পাঠক দেখিতে পাইবেন, কড়ি ও কোমল কাব্য হইতেই কবির এই 'খাস মহলের দ্বার' আত্মচরিত পাঠকের নিকট রুদ্ধ হইয়া গেছে। কড়ি ও কোমল কাব্য কবির তেইশ-চব্বিশ বৎসরের রচনা। কড়ি ও কোমলের পরই মানসীর যুগ সুরু হইয়াছে। ১২৯৪ হইতে ১২৯৭ পর্যন্ত সময়ের কবিতা মানসী কাব্যে সংকলিত হইয়াছে। এই ছাব্বিশ হইতে

মানসীর মূল্য

উনত্রিশ বৎসর বয়স সম্বন্ধেই জীবনস্মৃতিতে কথিত 'ভাঙা-গড়া জয়পরাজয় সংঘাত ও সম্মিলনের' পর্ব বলা যায়। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, "মানসীই তাঁর প্রথম কাব্য যেখানে কবিমানস 'যৌবনের আত্মবিস্মৃত বে-আইনি প্রমত্ততা' অতিক্রম করে গভীরতর আকৃতির স্বাক্ষর রেখেছে, সেখানে তাঁর জীবনব্যাপী ধ্যানসাধনা, তাঁর সৌন্দর্যকল্পনা প্রথম মূর্ত হয়েছে। মানসীই তাঁর প্রথম কাব্য যেখানে মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা প্রবলকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। যেখানে তারই সঙ্গে বেদনার বেগে জেগে উঠেছে অসীমের ধ্যান, অনন্তের দিব্যকল্পনা।"

মানসী কাব্যের কবিমনটিকে বুঝিবার জন্য সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের ধারার সহিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। বনফুল হইতে ভগ্নহৃদয় পর্যন্ত কাব্যগুলি কবির নিতান্তই অস্ফুট কৈশোর কালের, তেরো হইতে উনিশ বৎসরের মধ্যে রচিত। এই কাব্যসাধনায় কবি

সন্ধ্যাসংগীত

তখনও অনুচিকীর্ষু, স্বাতন্ত্র্যের 'স্বে মহিম্নি' পথটি তখনও তিনি আবিষ্কার করেন নাই। আপন চিত্তের অস্ফুট ভাবোচ্ছ্বাস তখনও সংহত হইতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি ১২৮৮ সালে অর্থাৎ কবির কুড়ি বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি পরিণত হয় নাই, কাঁচা হৃদয়াবেগের দোলাচলতায় ভাব তরঙ্গিত এবং ছন্দ ফেনায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু মানবিক প্রেম-প্রণয়, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ, ব্যর্থতা-নৈরাশ্য। "সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি আগা-গোড়া একটা নিরাশা একটা অশান্ত হৃদয়ের অকারণ ক্রন্দনপরায়ণতায় পূর্ণ।"

যেন সদ্য-যৌবনাভিষিক্ত কবি প্রেম নামক স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আসিয়া হৃদয়ারণ্যে হারাইয়া গিয়াছেন। এই 'হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ' ঘটিয়াছে প্রভাতসংগীতে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের অন্তরালে যে একটি ভূমা আছে, প্রাত্যহিক মানব সম্পর্কের অতীত যে অসীম হৃদয়োৎসব আছে, এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় কবি তাহা ব্যক্ত করিলেন। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' এবং 'আজি এ প্রভাতে রবির কর' অর্থাৎ 'প্রভাত উৎসব' ও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই দুই কবিতার মধ্য দিয়া কবির সমস্ত কাব্যের ভূমিকা রচিত হইয়াছে। কবির নিজের ভাষায়, "প্রভাতসংগীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার ব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালবাসি—কিন্তু সে এরকম উদ্দামভাবে নয়—আমার ভালবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে—সেই দীপ্তিতে এক এক সময় পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এবং ভারি আপনার বোধ হয়।"

প্রভাত সংগীত

প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সমালোচকদের কাছে বহু কারণে আলোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত কবিপ্রাণের নিবিড় সম্পর্কের কথা এই কবিতাগুচ্ছে বিচিত্র বর্ণরাগে সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্য শেষ হইয়াছে আত্মমগ্ন নৈরাশ্য হইতে মানব-সম্বন্ধলোকের সহজ জীবনসৌন্দর্যে কবির নিষ্ক্রমণের ইচ্ছায়—

জগৎ স্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই
চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই।

প্রভাতসংগীতের পর ছবি ও গান রচিত হইল। নাম হইতেই বুঝা যায়, চিত্র ও সংগীতধর্মিতাই ইহার কবিতাগুলির মূল লক্ষণ। কিন্তু এ লক্ষণ তো এমন কিছু নূতন নয়। তবে এই সংগীত যেন সম্প্রতি আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল, এই চিত্রাঙ্কন-প্রয়াস যেন আরও রঙে রঙে রাঙা হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রজীবনীকারের ভাষায়, 'নিজ হৃদয়ের দুঃখসুখের উদ্‌বেগ-উচ্ছ্বাস হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে মুখ তুলিতেই পৃথিবীর বিচিত্র ছবি তাঁহার মুগ্ধনেত্রে উদ্‌ভাসিয়া উঠিল, তখনই তাঁহার সাহিত্যে নূতন রূপ ও নূতন সুরের উৎস দেখা দিল ছবি ও গানের মধ্যে।" ছবি ও গানের কবিতাগুলি যৌবনের আত্মবিস্মৃত আবেগে লিখিত, কবিত্বের খ্যাপামি

ছবি ও গান

যেন তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহার ভাষা হয়ত তখনও বিকশিত-যৌবনা হইয়া উঠে নাই, ভাবের মধ্যেও প্রগাঢ়তা আসে নাই। কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালের অন্তঃগাম্ভীর্য এবং দৃষ্টিচাঞ্চল্যরূপসন্ধিৎসায় পথ খুঁজিয়া মরিতেছে, সুর খুঁজিয়া ফিরিতেছে, প্রেম চাহিয়া বেড়াইতেছে। অভিজ্ঞতা বিক্ষিপ্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, ধৈর্য শিথিল, হৃদয়ের রসও কাঁচা। কিন্তু এইসব কিছু অপরিণত অভিজ্ঞতা সহসা ঘনগম্ভীরসরসা হইয়া উঠিল কড়ি ও কোমলে।

কড়ি ও কোমলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সারস্বত জীবনের প্রেরণাদাত্রী, কবির কৈশোর যৌবনের বহু সুখদুঃখের সঙ্গিনী, জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই মৃত্যুশোক কবির তরুণ কবিচেতনাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল, অনেকগুলি কবিতায় সেই রুদ্ধহৃদয়ের অসহ্য বেদনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে এবং এই ব্যক্তিগত লোকের তরঙ্গাঘাত পরবর্তী কালের কাব্যেও সাধারণীকৃত হইয়া সংক্রামিত হইয়াছে। তবে কড়ি ও কোমলে একদিকে যেমন এই শোকজনিত বিষাদ ও বৈরাগ্য আছে, তেমনি যৌবনের উল্লাসও ইহার অন্যতম মুখ্য সুর। "কাব্যখানির মধ্যে শিশুকবিতা প্রেমসংগীত ব্রহ্ম সংগীত স্বদেশ সংগীত সবই আছে, সমস্তগুলিকে খণ্ডভাবে গ্রথিত করিয়া একটি সমষ্টিগত রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে…সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, সমগ্র মানবতার বিচিত্র সাধনরূপ কাব্যখানির মধ্যে দেখাইবার প্রয়াস হইয়াছে মাত্র। সংসার স্বদেশ ও ঈশ্বর—এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্যকরণই হইতেছে মানব-জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ—এই কাব্যে সেই সমন্বয়ের অপূর্ণ আভাস দিয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা রবীন্দ্রজীবনে এই তিনটি হইতেছে মূলকথা—সংসার স্বদেশ ও ঈশ্বর। অর্থাৎ নিকটের মানুষ, দূরের মানুষ এবং নিকট ও দূরকে যিনি মিলাইয়াছেন সেই পরমাত্মাকে বাদ দিয়া জীবনের সকল কর্ম নিরর্থক। কিন্তু এই কাব্যে নিকটের মানুষের সহিত আমাদের যে বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহাকেই কবি নানারূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশ ও ঈশ্বর গৌণ।"

কড়ি ও কোমল

কড়ি ও কোমলে মৃত্যু-শোক

কড়ি ও কোমলের যে সূচনা কবিতাটিকে কবি সমস্ত কাব্যখানির কেন্দ্র-ভাব বলিতে চাহিয়াছেন তাহা 'প্রাণ'—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। কবি এই জীবন্ত হৃদয়-পূর্ণ পৃথিবীতে, সমগ্র মানব মধ্যে বাঁচিতে চান।

কবির যৌবনস্বপ্নে যেন বিশ্বের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন, নারীর সৌন্দর্য কবিকে পাগল করিয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে একটি অপ্রাপ্তির বেদনা যে অনিবার্যভাবে জড়িত, ইহাও কবি ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছেন। 'মানবের সুখদুঃখে গাঁথিয়া সংগীত' একটি অমর কাব্য-আসর রচনার আত্মগত ইচ্ছা জন্মিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রেম ও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবিকে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। তাই সব মিলিয়া একটি বিষাদ ও নৈরাশ্য কবিকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। ইহার সহিত ব্যক্তিগত বিচ্ছেদবেদনার তীব্রতা যুক্ত হইয়া একটি জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যধ্যান স্থির দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই দিব্য প্রেম-সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধান করিতে করিতেই মানসী কাব্যরচনার পালা আসিল। কিন্তু মানসীতে এ পালা শেষ হইল না। মানসীতে যাহাকে খাড়া করিলেন সে শেষ পর্যন্ত মানস-চারিণীই রহিয়া গেছে। সে শিল্পীর হাতের অসম্পূর্ণ প্রতিমা।

## মানসীর যুগ

কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস

মানসী কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার কাব্য রচনায় স্থানকালের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া মানসীর কবিতাগুলিকে সুবিন্যস্ত করা যায়। মানসীর কবিতাগুলিকে কালগতভাবে কয়েকটি শ্রেণীগত ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগের কবিতাগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভুলে | বৈশাখ | ১৮৮৭ | [১২৯৪] |
| ভুলভাঙা | ঐ | ঐ | |
| পত্র | ঐ | ঐ | |
| বিরহানন্দ | জ্যৈষ্ঠ | ঐ | |
| শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা | আষাঢ় | ঐ | |
| সিন্ধুতরঙ্গ | ঐ | ঐ | |
| শ্রাবণের পত্র | শ্রাবণ | ঐ | |
| নিষ্ফল কামনা | ১৩ অগ্রহায়ণ | ঐ | |
| বিচ্ছেদের শান্তি | ১৪ ঐ | ঐ | |
| তবু; সংশয়ের আবেগ | ১৫ ঐ | ঐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিষ্ফল প্রয়াস ; হৃদয়ের | | | |
| ধন এবং নিভৃত আশ্রম | ১৮ অগ্রহায়ণ | ১৮৮৭ | [১২৯৪] |
| নারীর উক্তি · | ২১ ঐ | ঐ | |
| পুরুষের উক্তি · · | ২২ ঐ | ঐ | |

এই পর্বে কবি মুখ্যত কলিকাতা-নিবাসী। অক্টোবরে অর্থাৎ শরতে কয়েকদিনের জন্য দার্জিলিং গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পর কবি কিছুকাল পার্ক স্ট্রীটের বাসায় ছিলেন। এই সময় প্রায় অল্পদিনের ব্যবধানেই অনেকগুলি কবিতা রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'।

মানসী কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১২৯৫ সালের শেষদিকে বিহারের গঙ্গাতীরে একটি গোলাপক্ষেত-প্রধান আধা-শহর গাজিপুরে কবি স্ত্রী ও কন্যা লইয়া কিছুসময় অতিবাহিত করিতে আসেন। মানসীর বহু কবিতা এই পরিবেশের স্মৃতি বহন করিতেছে। অভ্যস্ত সমাজ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃতির স্বেচ্ছাবিহারের স্বাধীন ক্ষেত্রে কবির চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন আসিল এবং কবিতার ধারাও স্বচ্ছন্দবেগে চলিল। এখানে অবস্থানকালে অনেকগুলি কবিতা লেখা হয়। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ মানসী আলোচনা-প্রসঙ্গে বারবার এই গাজিপুরের কবিতাগুচ্ছেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিতাগুলির তালিকা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| শূন্যগৃহে | ১১ বৈশাখ | ১৮৮৮ | [১২৯৫] |
| নিষ্ঠুর সৃষ্টি | ১৩ ঐ | ঐ | |
| জীবন-মধ্যাহ্ন | ১৪ ঐ | ঐ | |
| প্রকৃতির প্রতি | ১৫ ঐ | ঐ | |
| শ্রান্তি | ১৬ ঐ | ঐ | |
| মরণস্বপ্ন | ১৭ ঐ | ঐ | |
| বিচ্ছেদ | ১৯ ঐ | ঐ | |
| আকাঙ্ক্ষা | ২০ ঐ | ঐ | |
| একাল ও সেকাল | ২১ ঐ | ঐ | |
| মানসিক অভিসার | ২১ ঐ | ঐ | |
| কুহুধ্বনি | ২২ ঐ | ঐ | |
| পত্রের প্রত্যাশা | ২৩ ঐ | ঐ | |

| | | |
|---|---|---|
| বধূ | ১১ জ্যৈষ্ঠ | ১৮৮৮ [১২৯৫] |
| ব্যক্ত প্রেম | ১২ ঐ | ঐ |
| গুপ্ত প্রেম | ১৩ ঐ | ঐ |
| অপেক্ষা | ১৪ ঐ | ঐ |
| দুরন্ত আশা | ১৮ ঐ | ঐ |
| দেশের উন্নতি | ১৯ ঐ | ঐ |
| বঙ্গবীর | ২১ ঐ | ঐ |
| সুরদাসের প্রার্থনা | ২৩ ঐ | ঐ |
| নিন্দুকের প্রতি নিবেদন | ২৪ ঐ | ঐ |
| কবির প্রতি নিবেদন | ২৫ ঐ | ঐ |
| গুরু গোবিন্দ | ২৬ ঐ | ঐ |
| নিষ্ফল উপহার | ২৭ ঐ | ঐ |
| পরিত্যক্ত | ২৮ ঐ | ঐ |
| ভৈরবী গান | ২৯ ঐ | ঐ |
| ধর্মপ্রচার | ৩২ ঐ | ঐ |

মানসীর বাকি কবিতাগুলি বিভিন্ন স্থানে রচিত, কিছু সোলাপুর 'পুনা ও কয়েকটি কলিকাতায়। এইগুলির তালিকা—

| | | |
|---|---|---|
| নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ | ২৩ আষাঢ় | ১৮৮৮ |
| প্রকাশ বেদনা | ৩ বৈশাখ | ১৮৮৯ [১২৯৬] |
| মায়া | ১ জ্যৈষ্ঠ | ঐ |
| বর্ষার দিনে | ৩ ঐ | ঐ |
| মেঘের খেলা | ৭ ঐ | ঐ |
| ধ্যান | ২৬ শ্রাবণ | ঐ |
| পূর্বকালে | ২ ভাদ্র | ঐ |
| অনন্ত প্রেম | ২ ঐ | ঐ |
| ক্ষণিক মিলন | ৯ ঐ | ঐ |
| আত্মসমর্পণ | ১১ ঐ | ঐ |
| আশঙ্কা | ১৪ ঐ | ঐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| উপহার | ৩০ | বৈশাখ | ১৮৯০ | [১২৯৭] |
| ভাল করে বলে যাও | ৭ | জ্যৈষ্ঠ | ঐ | |
| মেঘদূত | ৮ | ঐ | ঐ | |
| অহল্যার প্রতি | ১২ | ঐ | ঐ | |
| গোধূলি | ১ | ভাদ্র | ঐ | |
| উচ্ছৃঙ্খল | ৫ | ঐ | ঐ | |
| আগন্তুক | ৫ | ঐ | ঐ | |
| বিদায় | | আশ্বিন | ঐ | |
| সন্ধ্যায় | ৭ | কার্তিক | ঐ | |
| শেষ উপহার | ৯ | ঐ | ঐ | |
| মৌন ভাষা | ১০ | ঐ | ঐ | |
| আমার সুখ | ১১ | ঐ | ঐ | |

এইগুলির মধ্যে 'মেঘদূত' কবিতাটি শান্তিনিকেতনে রচিত হয়, সম্ভবত 'অহল্যার প্রতি'ও। ১২৯৭ সালের শেষদিকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট সোলাপুরে ছিলেন। সোলাপুরে 'গোধূলি', 'উচ্ছৃঙ্খল' ও 'আগন্তুক' রচিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সহিত কবি এই সময় বিলাত যাইতে মনস্থ করেন। 'আগন্তুক' কবিতা লিখিবার দুই দিনের মধ্যে কবি বিলাত যাত্রা করেন (১৮৯০ অগস্ট ২২)। বিলাতে এযাত্রা মাসখানেক ছিলেন। বিলাত বাসকালে 'বিদায়' রচিত। প্রত্যাবর্তনকালে রোহিত সমুদ্রের উপর 'সন্ধ্যায়', 'শেষ উপহার' 'মৌন ভাষা' ও 'আমার সুখ' লেখা হয়। 'শেষ উপহার' কবিতাটি কবির বন্ধু লোকেন পালিতের একটি ইংরাজি কবিতার ভাবানুবাদ। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই মানসী প্রকাশিত হয় (১২৯৭ পৌষ ১০)। মানসী কাব্যে ১৮৮৭ হইতে ১৮৯০ এই চারি বৎসরের কবিতা সংকলিত হইয়াছে। ১২৯৭ সালের ৩০ বৈশাখ লিখিত 'উপহার' কবিতাটি এই কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় স্থাপন করা হইয়াছে। "এই দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে কবির জীবনের ও মনের ইতিহাস প্রভূত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মনে হয়, তজ্জন্যই এই কাব্যের মধ্যে বিচিত্র ছন্দ ও বিধির রসের সমাবেশ ঘটিয়াছে। সেইজন্য মোহিতচন্দ্র সেন কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) মানসীর কবিতাগুলিকে নানা ভাবানুসারে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজাইয়াছিলেন। অবশ্য কবির অনুমোদনেই তাহা সম্পন্ন

সমকালীন অন্যান্য রচনা

হয়। মানসীর যুগের মধ্যে মায়ার খেলা রাজা ও রানী এবং বিসর্জন রচিত হয়।" গদ্য রচনার মধ্যে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'ও এই পর্বেরই রচনা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানসী রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিণত বিকাশের কাব্য-প্রযত্ন। ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা প্রভৃতি কাব্য ও নাটকের ভিতর দিয়া কাব্যলক্ষ্মীর একখানি অস্পষ্ট মূর্তি এতকাল ক্রমস্ফুটমান হইতেছিল। মানসীতে তাহাকে আরও পূর্ণতর ও রূপায়ত করিয়া পাওয়া গেল। ভাষা, শব্দচয়ন-নৈপুণ্য, বাণীভঙ্গিমা, সংগীতধর্ম, ছন্দোকুশলতা এইসব দিক দিয়াও মানসীর বিস্ময়কর সার্থকতা ঘটিয়াছে। মানসীর অনেকগুলি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে রচিত প্রথম শ্রেণীর কবিতার প্রতিবেশীত্ব দাবী করিতে পারে। 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি'র মত কবিতা সমগ্র কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাত্র রচনা করিয়াছেন।

মানসীতে কবির প্রতিভার পরিণতি

মানসীর পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল কাব্যে সুরের বৈপরীত্য, দৈহিক সৌন্দর্যের পরিণাম-ব্যর্থতা ও বাস্তব প্রেমের ক্লান্তিজনিত অবসাদের স্মৃতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মানসী কাব্যে প্রেমের এই অস্বস্তিকর যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি বা ব্যর্থতা নাই, মোটামুটি বিষণ্ণতার ভিতর দিয়া দেহাতিরিক্ত প্রেমের স্বরূপটি ধীরে ধীরে কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য আসিয়া কবির নিঃসঙ্গ হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিয়াছে। মর্মের সেই কামনাকেই কবি 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। এই মানসী-প্রতিমাই মানসী কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত কড়ি ও কোমল প্রভৃতি নামকরণে কাব্য বিষয়ের প্রতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। বিষাদঘন হৃদয়ে স্তিমিত সন্ধ্যার কুহেলি ছায়া কবিমনে কাব্যমায়া সৃজন করিয়াছিল সন্ধ্যাসংগীত কাব্যে। আবার 'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের 'পর'—এই প্রাতঃজাগরণের হিল্লোল সমগ্র কাব্যকে আলিঙ্গিত করিয়াছে বলিয়াই প্রভাতসংগীত নাম সার্থক। কবির হৃদয়-সংগীতে প্রভাতের রবিকরোজ্জ্বল দীপ্তিরেখা দেখা দিয়াছে। আর সেই প্রভাতী আলোকে পুনরায় কবি দেখিয়াছেন চিত্রিত বিশ্বকে, অমূর্ত বাসনার

রবীন্দ্রকাব্যের নামকরণ

সন্ধ্যাসংগীত হইতে কড়ি ও কোমল

সুর যুগপৎ তরঙ্গিত হইয়াছিল ছবি ও গান কাব্যে। যৌবনের আনন্দ-বেদনা, বাসনার তীব্রতা ও নৈরাশ্য এই দুই কড়ি ও কোমল পর্দায় কড়ি ও কোমল কাব্যখানি বাঁধা। এই পর্যন্ত বুঝিতে অসুবিধা নাই।

মানসীর নামকরণ

মানসী নামকরণের ইঙ্গিতধর্মিতা আরও সূক্ষ্ম ও শিল্পসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। মানসী কবিযৌবনের প্রথম পরিণতফলশ্যাম কাব্য। ব্যাপক অর্থে ধরিলে কবির মানসচেতনা ধ্যান-ধারণা হইতে প্রসূত ভাবনা-ভাষা-কবিতা মাত্রই মানসী, কারণ কাব্যশিল্প কবির মানসলোকেরই দান। রচনাকালে কবি প্রধানত গাজিপুর-প্রবাসী, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ কল্পনার এক প্রকার মানসলোকই। অভ্যস্ত সংসার থেকে কবি দূরান্তে বিচরণশীল বলিয়া ইহা মনোলোকে অবগাহনের সার্থক পটভূমি। একটি পত্রে কবি বলিয়াছিলেন, 'মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগতে তাহার উৎস, মনোজগতে তাহার উৎসারণ, কাব্যে তাহারই উৎসব। বিশ্বের বিচিত্র স্পর্শ কবির চিত্তলোকে যে ভাবময়ী বাণী গ্রহণ করে তাহাই মানসী।

কড়ির ও কোমলে দেহ এবং দেহাতীতের দ্বন্দ্ব

কড়ি ও কোমলের যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে ভোগ ও ভোগ-বিরতির একটি দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি যোগাসন করেন নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি শিথিল বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত দেহের প্রান্ত হইতে অসীমের বিপুল বিস্তারে কবি যেন সরিয়া আসিতে চাহিয়াছেন। একটি রূপাতীত আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে মূর্তিধারণ করিতেছে, কবি তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ যেন বুঝিতে পারিতেছেন না—

প্রাণ দিলে প্রাণ আনে কোথা সেই অনন্ত জীবন!<br>
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে কোথা পাই অসীম আপন,<br>
সেকি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

মানসীতে সেই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি

বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার এই যে অব্যক্ত ব্যাকুলতা ইহারই মধ্য দিয়া মানসীর যুগ যেন অস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতির অনন্ত রূপনিকেতনে কবি সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, দেহের কারাগারে বন্দী হইয়া

মরিতেছেন। তারপর মানসীতে আসিয়া সেই বাঞ্ছিত মুক্তি ঘটিল যখন কবি উপলব্ধি করিলেন—

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী যে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।

এই বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য-গান-গন্ধের সহিত রূপতৃষ্ণ প্রেমপিপাসিত অনন্ত আকুল কবিচিত্তের যোগাযোগ ঘটিল মানসীতে আসিয়া। সেই মিলনের 'আনন্দমুহূর্তগুলি', সেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ'গুলি মানসী কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে।

মানসীর প্রথম পর্ব

এখন ঐতিহাসিক দিক হইতে মানসীর কবিতাগুলির ক্রমবিকাশ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১২৯৪ বৈশাখ [ ১৮৮৭ ] হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলি মানসীর প্রথম স্তরের কবিতা। কবি এই সময় কলিকাতায় আছেন, শরৎকালে দার্জিলিং গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করেন। জোড়াসাঁকো হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে স্থান পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা 'পত্র' কবিতায়। পরবর্তী কবিতাগুলি প্রধানত প্রণয় সংক্রান্ত। 'ভুলে' 'ভুলভাঙা' প্রভৃতি কবিতা সম্পর্কে মানসী-অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মন্তব্য করিয়াছিলেন "মানসীর প্রথম পাঁচ ছটা কবিতা বেদনার কবিতা।" এই বেদনার মূলে রহিয়াছে প্রধানত বিরহস্মৃতি—'কেউ ভোলে কেউ ভোলে না যে তাই এসেছি ভুলে' ( ভুলে )।

প্রথম পাঁচছটি কবিতা

'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য় নূতন মানব-প্রেমে কবি তাঁহার বঞ্চিত হৃদয়ের আর্তনাদ ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই পর্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'। 'নিষ্ফল কামনা' যেন কড়ি ও কোমল ও মানসীর মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ। দেহের রহস্যময় জীবনসম্ভোগে অপরিসীম গ্লানি অনুভব করিয়া কবি যেন দেহের বাতায়ন দিয়া কোনো নিবিড় অলংকৃত নীলিমা দেখিতে পাইলেন। কামনার নিষ্ফলতা অনন্ত প্রেমের আকুলতায় পরিণত হইয়াছে।

'নিষ্ফল কামনা'র পরিশিষ্ট যেন 'সংশয়ের আবেগ' কবিতাটি। 'ভালোবাসো প্রেমে হও বলী—' এই অনুভব হইতে কবির নতুন বিশ্বাস জাগিয়াছে—

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে।
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।

'বিচ্ছেদের শান্তি' কবিতায় কবি স্বরচিত বিচ্ছেদের দ্বারা প্রেমের বিকৃতি নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'তবু' কবিতায় পুনরায় স্মৃতির অমরলোকে পুরাতন প্রেমের মধুর নির্যাস নিষ্কাশনের প্রয়াস করিয়াছেন। 'নিষ্ফল প্রয়াস' 'হৃদয়ের ধন' ও 'নিভৃত আশ্রম' কবিতা তিনটি ইহারই কয়েকদিন পরে রচনা। 'নিষ্ফল প্রয়াস' ও 'নিষ্ফল কামনা'র মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য আছে। 'নিষ্ফল কামনায়' কবি বলিয়াছিলেন,

যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!

'নিষ্ফল প্রয়াসে' বলিলেন, 'রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস'। 'হৃদয়ের ধন' একই উপলব্ধিতে বাঁধা—

নাই নাই, কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

অবশেষে 'নিভৃত আশ্রমে' ইহার সান্ত্বনা পাওয়া গেল। দেহ হইতে রূপকে যখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না, পার্থিব সৌন্দর্যভোগে যখন ক্লান্তি অনিবার্য তখন মানসিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমিকের উর্ধ্বায়ন ব্যতীত কবি-চিত্তের মুক্তি নাই। নির্জনতার মধ্যেই কবি অন্তর মিলনের জন্য প্রস্তুত হইলেন—

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী মূরতি
স্থাপন করিব যত্নে হৃদয়-আসনে,
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।

'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় ইতিপূর্বে এই কথাই আভাসিত হইয়াছিল, চিরক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আঁখির সম্মুখে বাস করা যায় না, বরং—

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে
যাবে অভিমান
হৃদয়-দেবতা হবে করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।

এই হৃদয়-দেবতাই 'অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি' হইয়া 'হৃদয়আসনে' স্থাপিত হইল। 'সুরদাসের প্রার্থনায়' এই মাধুরী-মুরতিকেই পুনরায় দেবীরূপে দেখিতে পাইব। 'নারীর উক্তি' কবিতাটির সহিত 'ভুল-ভাঙা' এবং 'পুরুষের উক্তির' সহিত 'ভুলে' কবিতাটির ভাব-সাদৃশ্য আছে। তবে এই পুরুষ ও নারীর উক্তিকে কবিজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। তথাপি মনে রাখা দরকার, পুরুষ ও নারীর যুগপৎ আত্মবিশ্লেষণ ও পারস্পরিক সমালোচনার মধ্য দিয়া কবি নরনারী-প্রেমের সেই অন্তহীন সংশয়, অতৃপ্তি ও হাহাকারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় পুরুষের সৌন্দর্য-সন্ধানী দৃষ্টির আলোকে নারীর রূপবিবর্তনের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতার ধারাবাহিকতা বুঝিতে সাহায্য করে। নারীর রূপ-সৌন্দর্য যে দেহ-সর্বস্ব হইতে পারে না, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের অন্তরালে কোথাও আত্মার রহস্যশিখা আছে, এ কবিতার বক্তা পুরুষের মুখেও তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

গাজিপুরের কবিতা
মানসীর দ্বিতীয় পর্ব

গাজিপুর বাসকালে মানসী কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হইল, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গাজিপুরের রোমান্টিক গোলাপ-পুষ্পিত অবকাশে কবির সৌন্দর্য-কল্পনা মুক্তি লাভ করিবে, ইহাই কবির বিশ্বাস ছিল। কিন্তু—

"সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যাবসাদারের গোলাপের ক্ষেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ সেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড় রেখায় ছাপ দেয়নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মত, সেও কোনো বড় ঘরের ঘরনী নয়।"

মানসীর সূচনায় গাজিপুর সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গের স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে; বলা বাহুল্য গাজিপুরে রচিত কবিতার তাহার প্রমাণ আরও তীব্র ভাবে উপস্থিত। সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন,

গাজিপুর সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গ

"সেখানে কিছুদিন কাটাইবার পরই তিনি অনুভব করিলেন যে সৌন্দর্যের কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের তৃপ্তি নাই। কর্মহীন জীবনের একটা অবসাদ তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।"

১২৯৪-এর শেষ দিকে সপরিবারে কবি গাজিপুরে আসেন এবং ১১ই বৈশাখ ১২৯৫ [১৮৮৮] হইতে ২৩ আষাঢ় ১২৯৫ তারিখের মধ্যে রচিত কবিতগুলিই মানসীর কেন্দ্রগত কবিতা। ইহার সূচনায় আছে 'শূন্য গৃহে' এবং সমাপ্তিতে আছে 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ।' একটির বিষয় বিষাদ আর একটি বিদ্রূপ। এইভাবে বিষণ্ণতার উদ্বোধন এবং ব্যঙ্গের সমাপ্তির দ্বারাই গাজিপুর-প্রবাসী কবিতাগুচ্ছের প্রকৃতি চিহ্নিত হইল। 'শূন্য গৃহে' কবিতাটি মৃত্যু-বেদনার গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন—

"মানসী কাব্যের অনেকগুলি কবিতা (এইগুলিকে মানসীর কেন্দ্রগত কবিতা বলা যায়) একটি নিদারুণ মৃত্যু-শোকের উৎস হইতে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ এই শোকের অভিজ্ঞতা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের মৃত্যুশোক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।" তাঁহার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় আঘাতের নৈদারুণ্যে প্রথমে কিছুদিন তিনি অন্তর্লোকে একটা নৈরাজ্যের মত অনুভব করিয়াছিলেন। মানসীর 'ভৈরবী গান' কবিতায় এই ভাবটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এমন নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যপূর্ণ কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নাই—মানসীতেও নয়। কিন্তু এমন দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও চলিল না। শোকের মধ্যেই শোকের প্রতিষেধক মিলিল।"

মানসীর শোক-কবিতা

সমালোচক বলিয়াছেন যে, কড়ি ও কোমল কাব্যে কবি সীমার দিক হইতে অসীমকে দেখিয়াছেন, আর মানসীতে একবার সীমার দিক হইতে

অসীমকে, আর একবার অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন। 'শূন্যগৃহে' কবিতার তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে—

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য একি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত ?

অবশেষে কবি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সীমাই সব নয়, মৃত্যুতে সব কিছুর অবসান ঘটে না। সত্তা "স্মৃতিতে প্রেমরূপে বিরাজ করে, নিখিল বিশ্বে সৌন্দর্য-রূপে বিরাজ করে।" অবশ্য পরবর্তী কাব্য সোনার তরী ও চিত্রায় এই বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত। গাজিপুরে লিখিত কবিতাগুলি সম্পর্কে ডকটর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন, "বৃহৎ প্রকৃতির উদার সান্ত্বনায় হৃদয়াবেগের স্থিতিভূমি লাভ—এই কবিতাগুলির রহস্য।"

প্রকৃতির নিকট যে সহৃদয়তা ও শান্তি তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহার বদলে দেখিলেন তাহার নিষ্ঠুর রূপ। একটি বিশেষ মৃত্যুর হৃদয়হীনতা সমস্ত সৃষ্টির অন্ধ নিষ্করুণ জড়তাকেই যেন প্রমাণ করিল 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায়। কিন্তু ইহা কবির ধর্ম নয়। তাই পরদিবসই অবারিত বিশ্বনিসর্গের মাঝখানে বিশ্বস্রষ্টার শাশ্বত নৈতিক বিধানের আনুগত্য মানিয়া কবি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে সুধীরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন। একটি মঙ্গলমধুর প্রেমের ধ্যানে জীবনকে গতিবান করিবার আকাঙ্ক্ষা, ধূলিধূসর দুঃখশোককে অবশেষে শান্ত শুভ্র করিবার কামনা, 'বিশ্বের নিশ্বাস' লাগিয়া 'জীবনকুহরে মঙ্গল আনন্দধ্বনি' শুনিবার সদিচ্ছা 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার বক্তব্য। প্রকৃতির প্রতি নতুন করিয়া দৃষ্টি দিয়া কবি বিস্মিত ব্যাকুল মূঢ় দৃষ্টিতে তাহার চঞ্চল মায়াশ্রিত রূপ দেখিলেন। প্রকৃতিই যে কবির চিরনিবিড় সান্নিধ্যস্থল তাহা যেন ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছেন—

প্রকৃতিদর্শনে বৈপরীত্য

যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

পরবর্তী অধিকাংশ কবিতাতেই প্রকৃতি সম্পর্কে কবির এই নূতন আকর্ষণের পরিচয় আছে। গাজিপুরের গঙ্গাবক্ষ, প্রভাত সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, নদীতে গুণটানা নৌকার মন্থর যাত্রা, ইঁদারার জলতোলার শব্দ, গোলকচাঁপার ঘন পল্লব হইতে মধ্যাহ্নে কোকিলের কুহুধ্বনি, গৃহের পশ্চিমবর্তী মহানিম গাছের বিস্তীর্ণ ছায়াতল এইগুলি অনেক কবিতায় একটি স্থানিক লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছে। 'কুহুধ্বনি'র মধ্যাহ্নটি যেন রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হওয়াটিকে পর্যন্ত ধরিয়া রাখিয়াছে। 'মরণস্বপ্ন' কবিতার প্রথমেই গঙ্গার উপর অবনত সন্ধ্যার ম্লানিমা আঁকা হইয়াছে। 'বিচ্ছেদ' কবিতাতেও এই সূর্যাস্তকালের নদীবক্ষ, পরপারের শস্যক্ষেত্র প্রভৃতির চিত্র আছে। কিন্তু সরল প্রকৃতিশোভা-নিসর্গের স্নিগ্ধ রম্যদৃশ্য হৃদয়ের গভীর ক্রন্দনকে যেন ভুলাইয়া দিতে পারিতেছে না। বৈশাখ মাসেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল। সম্ভবত এইজন্য বৈশাখ মাসেই কবির মনে সেই মর্মান্তিক বৈশাখের স্মৃতি দুরন্ত দুর্মর হইয়া জাগে। তখন বাহিরের সকল প্রলেপ ফাটিয়া হৃদয়ক্ষতের শোকরস পুঞ্জপুঞ্জ ঝরিতে থাকে—

প্রকৃতি সম্পর্কে পুনরায় দৃষ্টিবদল

মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবনগাথা
আপনার মনে—
চিরজীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গলে আসে
নয়নের কোণে। (শ্রান্তি)

স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে কবি যেন ডুবিয়া যান, অথৈ ক্লান্তি বক্ষে লইয়া মৌনী অন্ধকারে হারাইয়া যাইতে চান, 'স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে'। এ বেদনা কত গভীর, এই বিচ্ছেদ বিরহ কী অনন্ত যন্ত্রণার, এই অস্থির অবিস্মরণীয় আকুলতা কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে জালাইয়া তোলে, 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় তাহার প্রমাণ রাখিয়াছেন তিনি—

এ নিভৃতে এ নিস্তব্ধে এ মহত্ত্ব-মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে—
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা।
প্রেমপূর্ণ চারিচক্ষু জাগে চারি তারা।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ধীরে ধীরে কবিমানসী কবির নিঃসঙ্গ বিরহবিদীর্ণ

হৃদয়ে ব্যক্তিরূপ হইতে উধ্বর্ায়িত হইয়া উঠিতেছে। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে।

এই যে অসীমের সিংহাসনের দিকে মৃত্যুর দ্বারা ব্যবহিত প্রেমের সংগীত রচনা ইহাই পরবর্তী কালে কবিকে জীবনদেবতার বন্দনা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। 'বিচ্ছেদ' কবিতার বিষয় অবশ্যই বক্তিগত বিচ্ছেদ, কিন্তু একদা যে মুখচ্ছবিটি ছিল সকলের কাছে দ্রষ্টব্য, মৃত্যুর বিচ্ছিন্নতায় তাহা কবির কাছে রূপান্তরিত হইল অপরূপ ভাবে—

শোক হইতে অসীমতায় উত্তরণ

দিবসের শেষ দৃষ্টি অন্তিম মহিমা,
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে—
বিষণ্ণ কিরণ পটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

বলা বাহুল্য এই মোহিনী প্রতিমাটি ইতিপূর্বে কথিত 'হৃদয়-আসনের' 'অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতি' এবং পরবর্তী কালের সোনার তরীতে ইহারই নাম মানস-সুন্দরী। কখনও তাহার সহিত 'মানসিক অভিসারের' ইচ্ছা জাগিতেছে—

জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতির ধ্যান

মানস-মূরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

মনে হয় যেন বৈশাখের ভোরের হাওয়া তাহারই অদেহী অঙ্গগন্ধে সুরভিত ও উদাসীন। 'শ্রান্তি' কবিতায় যে 'স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ' বলিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নই 'মরণস্বপ্ন' হইয়া দেখা দিতেছে কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদের প্রথম সন্ধ্যায়। 'স্বদেশ পুরব' কলিকাতা হইতে 'দূর স্বজনের বিরহের শ্বাস' বহিয়া আনিতেছে সন্ধ্যার বাতাস, 'অলস ভাবনা আধো-জাগা মনে' অর্থহীন অনির্বচনীয় ব্যথার তরঙ্গ তুলিয়া যাইতেছে। আগত রাত্রির অন্ধকার 'তুষার কঠিন মৃত্যুহিম' এক তমিস্রার মত মনে হইতেছে। 'একাল ও সেকাল' কবিতায় ইহারই আর এক সান্ত্বনায়িত রূপ—

এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

পরদিন লেখা 'কুহুধ্বনি' কবিতায় মধ্যাহ্নের কুহুতানের মধ্যেও সেই পুরাতন স্মৃতির ক্রন্দন—

অতীতের দুঃখসুখ দূরবাসী প্রিয়মুখ
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান—
ওই কুহুমন্ত্র বলে জাগিতেছে দলে দলে,
লভিতেছে নূতন পরান।

এই কবিতায় দেখা গেল, কবির ব্যক্তিগত মানস-প্রিয়া আবার অসীমের সিংহাসনারূঢ়া, তিনি পুনরায় 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতি'—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী—
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।

মানসীর পর সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী'তে এই প্রেয়সীর 'কবিতা কল্পনা-লতা'য় পরিবর্তনও এই ভাবেই ঘটিয়াছে।

গাজিপুরে লেখা অন্যান্য কবিতাগুলিতে এইরূপ ব্যক্তিগত প্রেমের নৈষ্ফল্য, মানস-অভিসার, বিরহ-বিলাপ, স্বপ্নাতুরতা নাই। বৈশাখ কাটিয়া গেলে কবিমন যেন অন্য চিন্তায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। আলাপের পর সংগীত দ্রুতলয়ে যেন তান বিস্তার করিয়াছে। তখন জগতের কাজের চিন্তা কর্ম-কোলাহল বাঁশিতে প্রবেশ করিয়াছে। 'বধূ' হইতে 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' পর্যন্ত কবিতা তাহারই নিদর্শন।

অন্যান্য কবিতা

'বধূ' একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। ইষ্টক-বেষ্টিত পাষাণকায়া রাজধানীর বুকে গ্রামের কিশোরী বনলতার মত নববিবাহিতা বধূর মূক মর্মযাতনা ইহার মধ্য দিয়া করুণস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্তপ্রেম' কবিতা দুটিতেও নারীর প্রেমের নাট্য-বিবৃতিময় আত্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটিতে পুষ্পনিরুদ্ধ মধুর মত সংগুপ্ত প্রেমের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশের জন্য পুরুষের হঠকারিতাকে দায়ী করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে নীরূপ নারীর গোপন-নিষিদ্ধ ভালোবাসাকে কবি ভাষা দিয়াছেন। 'অপেক্ষা' কবিতায় এক বাসকসজ্জা নারীর মিলন-শৃঙ্গার অপূর্ব সংযম ও কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে।

মানসীতে আর কতকগুলি কবিতা আছে যে[illegible] সংঘাত, জনজীবনের কর্মকোলাহল, বৃহৎ জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহ, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য-বিসর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল মানসীতে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেই এই প্রকার অস্থির চাঞ্চল্য এবং বিশ্বজীবনায়নের ব্যাকুলতা একাধিকবার দেখা গিয়াছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে তাঁহার রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের মধ্যে সংঘাত

"আমাদের দেশের চারিদিকের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন, ক্ষুদ্র কাজকর্ম কবিকে তখন বড়ই আঘাত দিতেছিল। নিজেরও কেবল অনুভূতিময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল—খুব একটা বড় ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—'দুরন্ত আশা' কবিতাটি পড়িলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ কেবল আত্মমগ্ন প্রেমবিভোর সৌন্দর্যধ্যানী কবি ছিলেন না, জাতীয় জীবনের সর্বদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। বাঙালী জীবনের দুঃস্থ গ্লানি, গার্হস্থ্য সংকীর্ণতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, আর্যত্বের আত্মম্ভরিতা, মধ্যবিত্ত অন্তঃসারশূন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এসবই তাঁহার পরিচিত ছিল—ইহাদের প্রতি সূচীমুখ শ্লেষ নিক্ষেপে তিনি কখনও ইতস্তত করেন নাই। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ধর্মসম্পর্কে কিছুদিন পত্রসংঘর্ষ চলিতেছিল। সনাতন

সমকালীন সমাজ ইতিহাস

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের নেশায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সংগ্রামে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দেশের কতিপয় গোঁড়া প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের নেতা বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। মহান ঔপন্যাসিকের এই ধর্মাচরণগত ক্ষুদ্রতায় কবির মন স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। কড়ি ও কোমলের বিরুদ্ধে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর ভাষায় 'মিঠে কড়া' প্যারডি লিখিয়াছিলেন। এই ঘটনাতেও কবি অত্যন্ত আহত হইয়াছেন। এই সকল মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে, 'দুরন্ত আশা' 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', 'গুরু গোবিন্দ,' 'নিষ্ফল উপহার', 'পরিত্যক্ত', 'ধর্মপ্রচার', 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' ইত্যাদি কবিতায়। 'দুরন্ত আশা' একটি

অসামান্য কবিতা—একদিকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতি আত্মবিদ্রূপে মুখর, অন্যদিকে বলিষ্ঠ অকুণ্ঠ জীবনের প্রতি কবিপ্রাণের আদিম আকুতিতে পূর্ণ। পরবর্তী কালে এই দুরন্ত আশাই সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বাত্মবোধে পরিণত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় কবি কত পারদর্শী

বিদ্রূপের কবিতা

ছিলেন, 'দুরন্ত আশা', 'ধর্মপ্রচার' এবং 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' এইগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর' এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। দেশহিতৈষিতার প্রতি এই প্রকার তীব্রতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ইতিপূর্বে কবি কখনও করেন নাই। 'গুরু গোবিন্দ' এবং 'নিষ্ফল উপহার' একই দিবসে রচিত, এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাহিনীর মধ্য দিয়া কবির আপন স্বদেশচেতনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'পরিত্যক্ত' কবিতায় সমকালীন বাঙলার প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতি কবির ভৎর্সনা প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুধর্ম তথা আর্যধর্ম রক্ষার জন্য নব্য হিন্দুত্বাভিমানী যুবকগণ কিরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, Salvation armyর সদস্য কতিপয় গৈরিকধারী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের উপর তাহাদের সমবেত লাঞ্ছনার বিবরণ কাগজে পড়িয়া কবি 'ধর্মপ্রচার' লেখেন। নব্য হিন্দুদের বাল্যবিবাহের সমর্থক হইতে দেখিয়া শ্লেষকণ্ঠে কবি লেখেন 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ'।

মোটামুটি এই হইল গাজিপুরে লিখিত কবিতাবলীর আলোচনা। কেবল ইহাদের মধ্যে 'সুরদাসের প্রার্থনা' ও 'ভৈরবী গানে'র আলোচনা বাদ পড়িয়া গেছে। ইতিপূর্বে গাজিপুর-গুচ্ছের আলোচনা-সূচনায় এই কবিতাগুলির উৎসমূলে যে শোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, 'ভৈরবী গান' সেই শোকেরই অনুষঙ্গে রচিত। অন্ধকবি সুরদাসের কাহিনীর রূপকে কবি নিমীলিতদৃষ্টি সুরদাসের হৃদয়-আকাশে যে দেবীর দেহহীন জ্যোতি অনুভব করিলেন, তিনিই যে পূর্ববর্তী কবিতার 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী মূরতি' তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যথাসময়ে এই কবিতাদ্বয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা গ্রন্থে করা হইবে।

মানসীর শেষ কবিতাগুলি বিভিন্ন স্থানে রচিত—জোড়াসাঁকো, সোলাপুর,

শেষপর্বের কবিতা

খিড়কি, শান্তিনিকেতন, লণ্ডন ও রেড সী। রচনাকাল ১২৯৬ (৬ বৈশাখ) হইতে ১২৯৭। "বিরহী প্রেমভাবনার সঙ্গে জীবনাদর্শ মিলাইবার চেষ্টা এবং তাহার মধ্যে চরম প্রেয়ঃ উপলব্ধি এই কবিতাগুলির অধিকাংশের মর্ম।"

মানসীর 'উপহার', প্রথম দিকের আরও দুইটি কবিতা 'ক্ষণিক মিলন' ও

'আত্মসমর্পণ' এবং শেষাংশের 'প্রকাশবেদনা' হইতে শেষ পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্গত। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' এবং 'রাজা ও রানী' রচনা করেন।

সোলাপুরে

সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশবেদনা' কবিতাটি লেখেন। কবির অন্তরের একটি অতৃপ্ত প্রকাশ-ব্যাকুলতা ইহার বিষয়—সম্ভবত বৈশাখ মাসের সহিত বিজড়িত স্মৃতি-বেদনাই এই ব্যাকুলতার কারণ। 'মায়া'য় এই বেদনার মূল সুরটি আরও স্পষ্ট এবং উদ্দেশ্যমূলক—

কত দেখা শোনা কত আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত—
শুধু তারই মাঝে একটি কে আছে
তারই তরে ব্যথা কত।

এক বর্ষণমুখর নিবিড় মেঘান্ধকার দিবসে বৃষ্টিধারায় বিরামহীন পতন-ধ্বনির মধ্য দিয়া যেন তাঁহার অবরুদ্ধ বেদনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি পাইতেছেন—

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

শ্রাবণে কলিকাতায় ফিরিয়া লিখিলেন 'ধ্যান' কবিতাটি। বিরহ-বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে বেদনা এতকাল নানা ভাবে, ক্রন্দনে, বিবশ বেদনায়, অপ্রকাশের ব্যাকুলতায় ভাষা খুঁজিয়া মরিতেছিল, এই কবিতায় তাহা কবিমনের গভীরে একটি স্থির প্রাপ্তিতে প্রশান্ত। উত্তরকালে যিনি বলাকার 'ছবি' কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল—
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল—

তাহারই পূর্বাভাস যেন এই 'ধ্যান' কবিতা। যে মানসী মূরতিটিকে এতকাল প্রকৃতির মধ্যে, অনন্ত জীবনের মধ্যে, শাশ্বত মানবমানবীর প্রেমের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া করিয়া কবি ক্লান্ত, এখন তাহাকে নিশ্চিন্ত উপলব্ধিতে পাওয়া গেল আপন কবিস্বরূপের উৎসমূলে—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।

এই ধ্যানগভীরতা হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কবি বুঝিলেন 'যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার'। এই যে 'যত দূর হেরি' বাক্যাংশটি, ইহার তাৎপর্য সামান্য নয়। আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি, রোমান্টিক কবি তাঁহার বাস্তব জগতের বিরহ-বিচ্ছিন্নতা ভুলিবার জন্য কালচিহ্নহীন অতীতে অভিসার করেন। যে বেদনা সাম্প্রতিক, তাহাকে নিত্যকালের বলিয়া মনে হয়। অভীষ্ট মানসীকে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে স্থাপন করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। 'ধ্যান' কবিতা হইতে তাহার সূত্র পাওয়া গেল, 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেমে' এই সূত্রেরই বিকাশ ঘটিল। কবির কল্পমূর্তি অসীম কালের চিরপ্রেয়সী মূর্তিতে রূপান্তরিত হইলে, কবির প্রেম হইয়া উঠিল অনন্ত প্রেম। মেঘদূত কাব্যে যক্ষের যে প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা উজ্জয়িনীর নির্জন প্রকোষ্ঠে বিরহশয়নে ক্ষীণতনু মেলিয়া দিয়াছিল, সে নারী কবির অন্তরের চিরবিরহিণী সৌন্দর্য প্রতিমায় পরিণত হইল। এমন কি, অহল্যার হৃদয়মন লইয়া কবি বিশ্বের অন্তরে প্রবেশের গভীর বাসনা প্রকাশ করিলেন।

রোমান্টিক অতীত-প্রিয়তা

'অনন্ত প্রেম' কবিতায় একটি প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্য দিয়া কবি নিখিল মানবলোকের প্রেমানুভূতির স্পর্শ পাইয়াছেন। প্রকারান্তরে কবি এই উপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, ব্যক্তিজীবনের প্রেম প্রেমিকার তিরোধানে হারাইয়া যায় না, তাহা জন্মজন্মান্তর লোকান্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়াই বিবর্তিত হয়। পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে এই ভাবটি বিশিষ্টতা অর্জন

করিয়াছে। কবির প্রেম এখন আপনাকে ছাড়াইয়া অনন্ত বিশ্বে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাঁহার সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব চিন্তা চেতনা এখন ঐ মানসীর কল্পনাতেই আচ্ছন্ন—

দিবসনিশি জাগিয়া আছি
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক ঠাঁই নাই।

ইহার পর দীর্ঘ কয়েকমাস কোনো কবিতা নাই, ইতিমধ্যে কবি বিসর্জন নাটক লিখিয়াছেন, মন্ত্রী-অভিষেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠে আবার নূতন কবিতার ধারা দেখিতেছি। এই শেষগুচ্ছের কবিতায় পূর্বের অস্থিরতা, চাঞ্চল্য অনেক স্তিমিত; প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় সান্নিধ্য ঘটিয়াছে। কবির প্রেমকল্পনা তো ইতিপূর্বেই অসীমকালের পটে স্থাপিত হইয়াছে—কবির প্রেয়সীও অনন্ত প্রেয়সীতে রূপায়িত হইয়াছে। মানসীর 'উপহার' কবিতাটি এই সময়েই রচিত। ইহার ভিতর দিয়া কবি তাঁহার কবিকর্মের সূচীপত্রটি জানাইয়া দিলেন—

মানসীর 'উপহার'

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা—
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

সুতরাং কবির মানসী অসীমের কোটিতে অবস্থান করিতেছেন, কবিতায় সংগীতে কবি তাহার সীমা রচনা করিয়াছেন মাত্র।

'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কেবল মানসীরই নয়, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের দুইটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। নিসর্গসৌন্দর্যের গভীরে ডুব দিয়া রোমান্টিক কবি এই জাগতিক প্রাকৃত রূপ-শোভার অন্তরালে লক্ষ্য করিয়াছেন এক জাগ্রত সত্তার অস্তিত্ব। কালিদাসের কাব্যভাবনা অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন এক নবমেঘদূত রচনা করিলেন। 'অহল্যার প্রতি' যেন সোনার তরীর 'বসুন্ধরা'

কবিতায় প্রকাশিত কবির বিশ্বচেতনার পূর্বাভাস। যথাসময়ে কবিতাদ্বয়ের আলোচনা করা যাইবে।

শেষ দিকের কয়েকটি কবিতা বিশেষত্বহীন। সোলাপুরে লিখিত 'গোধূলি' ও 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতার বিষাদময়তা এইপর্বে যেন প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। কবির অশান্ত বিরহব্যাকুল হৃদয়ের পুরাতন ক্ষত নিসর্গ ও সৌন্দর্যের সহস্র সান্ত্বনা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অনাবৃতভাবে বাহির হইয়া পড়ে, ইহা কবির আজীবন কাব্যধারায় দেখা যাইবে। সীমা যতই অসীম হইয়া উঠুক, লৌকিক ব্যথা যতই অলৌকিক স্তরে রূপান্তরিত হোক এই বিষাদ স্মৃতিটিকে মুছিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে কোনোদিনও সম্ভব হয় নাই।

বিদেশ যাত্রা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সময় কবি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো অনির্দেশ্য কারণে মাত্র একমাস পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে থাকাকালীন লেখা 'বিদায়' কবিতায় কবি যেন তাঁহার স্বদেশস্বজন-বাসভূমির স্মৃতিবন্ধনে জড়িত মানস-রূপিণী প্রেয়সীর সহিত অবোধ এক বিচ্ছেদ অনুভব করিয়াছেন। সমুদ্রবক্ষে বসিয়া কাহার স্মৃতি ধ্রুবতারকার মত কবির হৃদয়-আকাশে জাগিয়া থাকে ভগ্নহৃদয়ের উপহারে ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-পাঠকের কাছে অজানা নাই। এ কবিতায় সেই একই অনুষঙ্গ-ব্যবহার ঘটিল—

সম্মুখেতে তোমারই নয়ন জেগে আছে
আচ্ছন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ;

শেষের কবিতাগুলি প্রেমেরই কবিতা এবং সন্ধ্যার শীতল মৃদু অন্ধকারে কবির আত্মগত ভাবনা সম্বোধনের সুরে এইগুলিতে আলপনা আঁকিয়া গেছে। বহু অপূর্ব পংক্তি কবিতাগুলি হইতে সংকলন করা যায়। রেড সীতে বসিয়া লেখা 'সন্ধ্যায়' 'শেষ উপহার' 'মৌন ভাষা' 'আমার সুখ' প্রতিটি কবিতায় প্রেমের অনুভবের মধ্যেও একটি বেদনা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, মানবী ও মানবের মধ্যে প্রেম-সম্পর্কের কথা ইহাদের মধ্যে বলা হয় নাই, মানবী ও মানসীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে। সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি দিয়াই এই কবিতাগুলির পরিচয় এবং

শেষের কবিতা

আলোচনার সমাপ্তি টানা যাইতে পারে। এক অসমাপ্ত মানবী প্রেমকে স্মরণ করিতে করিতে কবি আর্টিস্টের হাতের অসম্পূর্ণ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া বসিয়াছেন। ইহাই তো কবির সুখ—সেই সুখেই মানসী কাব্যের সৃষ্টি।

## মানসী কাব্যে ছন্দোসংগীত

উত্তরকালে রবীন্দ্ররচনাবলীতে মানসী কাব্যের ভূমিকা রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবরূপ ধারণ করল। পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমলের সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

মানসীর স্বাতন্ত্র্য

কবির সঙ্গে শিল্পীর যোগ

বস্তুত রবীন্দ্রকাব্য-বিকাশে মানসী কাব্যখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা যেমন শত ধারায় উৎসারিত হইয়াছে, তেমনি ইহার ছন্দোসংগীতেরও তুলনা নাই। মোট ৬৬টি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে যত প্রকার ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা যায়, মানসীতে তাহার প্রায় সবগুলিই আছে। বিশেষ করিয়া বাঙলা ছন্দের ব্যাকরণে যাহাকে ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে, যে ছন্দে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যুক্ত অক্ষরের পূর্ণ মূল্য' দেওয়া হয়, তাহা মানসী হইতে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যে এই ছন্দেরই অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। মানসীর 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় কবি প্রথম স্তবকের শেষ চরণে লিখিয়াছেন—

ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা

যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দান

বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

জনৈক ছান্দসিক কৌতুক করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই 'বন্ধন' শব্দটিই বাঙলা ছন্দের বন্ধন মোচন করিয়াছে।

অবশ্য যুক্ত ব্যঞ্জনকে পূর্ণ মূল্য দিয়া কবিতা রচনা বাঙলা কাব্যে ইতিপূর্বে কেউ করেন নাই, ইহা নয়। ইতস্তত দৃষ্টান্ত একাধিক কবির রচনা হইতেই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই ব্যতিক্রম মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল-স্থিত 'বিরহ' কবিতাকেই এই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে—

কড়ি ও কোমলে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাত যাইবে ছলিয়া
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে॥

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহা ছন্দের মৌলিক সূত্রানুযায়ী সাধিত হয় নাই, ব্যতিক্রম হিসাবেই ইহাকে দেখিতে হইবে। পরবর্তী 'আহ্বানগীত' নামক কবিতাতেই তাহার স্পষ্ট বৈপরীত্য দেখা যাইতেছে—

তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে
নৃত্যগীত নব নব—
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠ স্বরে
এক-কণ্ঠ হয়ে কব।

'বিরহ' কবিতাটি সংগীত-রূপে রচিত, হয়ত এইজন্যই গানের সুরে যুক্তব্যঞ্জন তাহার পূর্ণ মূল্য পাইয়া গিয়াছে। কবিতা হিসাবে সেই মূল্য দান করিলে 'ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে' পারা যাইত, ইহা হয়ত কড়ি ও কোমলে কবি আবিষ্কার করেন নাই, মানসীতেই তাহা আবিষ্কার করিলেন। ইহার ফলে আমরা পাইলাম—

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মত
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা
জীবনহত। (ভুল-ভাঙা)

শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে।
অভাবকঠিন মলিন মর্ত
কোমল চরণে বাজে। ( আত্মসমর্পণ )

কলস ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু। ( অপেক্ষা )

অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস। ( সুরদাসের প্রার্থনা )

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা মানসী কাব্য হইতেই কবি ব্যাপকভাবে সুরু করিয়াছেন। প্রথম দিকে যুক্ত অক্ষর যথাসম্ভব বাদ দিয়া ছয় মাত্রার, পাঁচ মাত্রার, সাত মাত্রার পর্ব রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে যুক্ত-ব্যঞ্জনের মাত্রাদীর্ঘত্ব স্বীকৃত হইলে তাহার ব্যবহার স্বচ্ছন্দ হইয়াছে। এই নূতন প্রণালীকে জনপ্রিয় করিবার জন্য মানসীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছিলেন—

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের সূত্রপাত

"এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই-অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেইরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

মানসীর ভূমিকায় এই ছন্দের ব্যাখ্যা

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'ঊর্ধ্ব' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কেবল বাঙলা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য

মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই—পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।"

এই মাত্রামূল্য-প্রধান ছন্দে কবি প্রধানত পাঁচ মাত্রার ও ছয় মাত্রার পর্বই ব্যবহার করিয়াছেন। কচিৎ সাত মাত্রার পর্ব দেখা যায়। যথা,

পাঁচ ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব

ছয়-মাত্রার— ভুলে, ভুল-ভাঙা, আত্মসমর্পণ, বঙ্গবীর, সুরদাসের প্রার্থনা, নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, গুরু গোবিন্দ, পরিত্যক্ত, ভৈরবী গান, ধর্মপ্রচার, নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ, প্রকাশবেদনা, মায়া, ধ্যান, পূর্বকালে, অনন্ত প্রেম, ভালো করে বলে যাও, উচ্ছৃঙ্খল, আগন্তুক।

পাঁচ মাত্রার—শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, অপেক্ষা, দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, আশঙ্কা।

সাত-মাত্রার—বিরহানন্দ, ক্ষণিক মিলন, বধূ, গুপ্তপ্রেম, বর্ষার দিনে। ইহাদের মধ্যে 'বিরহানন্দ' এবং 'ক্ষণিক মিলনে'র পর্ব সাত মাত্রার হইলেও বিন্যাস বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থাৎ ৩ ৪। ৪ ৩ এইভাবে করা হইয়াছে। মানসীতে চার মাত্রার পর্বের ছন্দও আছে—'নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল' পূর্বোদ্ধৃত 'নিষ্ফল উপহারে'র কবিতায় তাহার নমুনা আছে। অবশ্য মানসী গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলোচ্য কবিতাটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়, তাহা চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান গতানুগতিক ছন্দে লেখা। সম্ভবত, সেটিই কবি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, পরে তাহার শব্দ সংস্কারের দ্বারা ধ্বনিপ্রধানে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 'নিম্নে যমুনা' ইত্যাদি প্রথম দুই চরণের পূর্বরূপ ছিল—

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল,
দুই তীরে গিরিতট উচ্চ শিলাতল।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দে পর্ব ব্যবহারের বৈচিত্র্য ব্যতীত চরণ ও স্তবক বিন্যাসের অভিনবত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। 'ভুলে' ও 'ভুল-ভাঙা' কবিতাদ্বয়ের স্তবক একই প্রকার। ইহার প্রতি স্তবকে মোট তিনটি অন্ত্যানুপ্রাস, আর শেষ চরণে প্রথম চরণের অন্ত্যানুপ্রাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া একটি স্তবকগত সুর ( phrasal music ) ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বলাকার প্রথম পাঁচটি কবিতার পদ্ধতিও তাহাই। উদাহরণ স্বরূপ 'ভুলে' কবিতার প্রথম চরণগুচ্ছ—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।

এবার চতুর্থ স্তবকটি দেখা যাক—

কাননের ফুল এরা তো ভোলেনি,
আমরা ভুলি!
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে!
কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

'বিরহানন্দ'.ও 'ক্ষণিক মিলনের' ছন্দে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এক কথায় রবীন্দ্রকাব্যে পূর্বের তুলনায় অভিনব। 'বিরহানন্দ' কবিতার পরিচয়ে কবি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইস্থানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক"। সম্ভবত এই জাতীয় ছন্দে তৎকালীন পাঠকের অনভ্যস্ততাই এই মন্তব্যের হেতু ছিল। কিন্তু যতিপতন-নির্দেশই আলোচ্য ছন্দোসংগীতকে অভ্রান্তভাবে বাজাইয়া তুলে না। এই পর্বগুলি প্রকৃত পক্ষে এক একটি স্বতন্ত্র চরণ এবং দ্বিতীয় চরণের পর্বটি অপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহার সম্ভাব্য বিন্যাস দেখানো যাক—

| | | |
|---|---|---|
| (৩+৪) | ছিলাম | নিশিদিন |
| (০+৪) | | আশাহীন |
| (৩+০) | | প্রবাসী, |
| (৩+৪) | বিরহ তপোবনে | |
| (০+৪) | | আনমনে |
| (৩+০) | | উদাসী। |

সুতরাং প্রথম চরণের পর্ববিন্যাস তিন-চার, দ্বিতীয় চরণের [ তিন ] চার এবং তৃতীয় চরণের তিন [ -চার ]। বন্ধনীধৃত শব্দ এখানে অনুপস্থিত, ইহার জন্যই যতিপতন অনিবার্য। দ্বিতীয় চরণটিতে কবি প্রথম চরণের মতই মিল ব্যবহার করিয়া ইহার অভ্যন্তর সৌষম্য আরও নিপুণভাবে ধ্বনিত করিয়াছেন। এত সুর, এত ধ্বনি-মাধুর্য, এত পর্ব-সুষমা ও শব্দলাবণ্য পূর্ববর্তী কাব্যে কোথায় ?

'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় পাঁচমাত্রার পর্ব ব্যবহার করিয়া কবি স্তবকের ক্ষেত্রে এক প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পংক্তিগুলি এক মাপের নহে। কোনোটিতে তিনটি পর্ব, পরের পংক্তি আবার চারটি পর্বে রচিত। পঞ্চম-ষষ্ঠ ছত্রের পর্বসংখ্যা সমান। সপ্তম-অষ্টম ছত্রের পর্বসংখ্যা আবার দ্বিতীয়-প্রথম ছত্রের মত। এইভাবে পুনরাবৃত্তির বদলে একটি মনোহারিতা সঞ্চারিত হইয়াছে। 'আত্মসমর্পণে' অতিপর্বের সাহায্যে এবং তিন চরণের দ্বারা স্তবকান্ত পংক্তিরচনায় কবি একটি নূতন প্রয়োগবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালের কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত অসংখ্য কবিতায় পুনরাবৃত্ত। 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতার চরণের অসমতা পর্বসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির পরিণামে একটি প্রবহমানতার দ্রুতি সঞ্চার করিয়াছে—

> এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছে
> কেন গো অমন করে ?
> তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে।
> আমি কেঁদেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি
> এসেছি যেতেছি সরে
> কী জানি কিসের ঘোরে।

'অনন্ত প্রেম', 'পূর্বকালে', 'ধ্যান প্রভৃতি কবিতা এই ছন্দেই রচিত। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতার প্রতি স্তবকের শেষে প্রথম স্তবকের প্রথম মিলটিরই পুনরাবৃত্তি এবং প্রথম পংক্তিটির ব্যবহার করিয়া কবি কবিতার মূল ভাব অর্থাৎ আশঙ্কার সংশয়টিকে নিপুণভাবে পাঠকমনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিয়াছেন। এই ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দটিকেই প্রাচীন ত্রিপদীর সাজে সাজাইয়া 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপে' কবি উন্মদ নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরণের উদাহরণ আরও দেখানো যাইতে পারে।

অক্ষরবৃত্ত বা প্রাচীন পয়ারজাতীয় তানপ্রধান ছন্দে কবির পারংগমতা কড়ি ও কোমলেই ধরা পড়িয়াছিল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইবার পর এই ছন্দের ওজস্বিতা ও প্রবহমানতা, অর্ধযতি-স্থাপনের স্বেচ্ছাচারিতা হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের হাতে সাফল্য লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের সূচনা-কৈশোর হইতেই এই জাতীয় ছন্দ অপটুর মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কড়ি ও কোমলে দেখিতে পাই, কবি অমিত্রাক্ষরের বদলে সনেট রচনায় মনোনিবেশী এবং কড়ি ও কোমলে অসংখ্য চতুর্দশপদী রচিত হইয়াছে। এতদভিন্ন আট-ছয় মাত্রা বিভাগে চতুর্দশাক্ষর পয়ারের প্রথাগত চরণের বদলে আট-আট মাত্রার পূর্ণ দ্বিপর্বিক চরণ ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন কড়ি ও কোমলের 'এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা')। মানসীতে এই জাতীয় ছন্দ আছে 'শেষ উপহার'—

তানপ্রধান ছন্দের কবিতা

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনই প্রভাত এল ; ফুরালো আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে 'নিষ্ফল কামনা', 'সিন্ধুতরঙ্গ' 'মরণস্বপ্ন' এবং 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি'। 'নিষ্ফল কামনা' ছন্দের দিক দিয়া বৈপ্লবিক। ইহার অসমপর্বিক চরণ, অন্ত্যানুপ্রাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াও কবিতার অভ্রান্ত লক্ষণকে ফুটাইয়া তোলার দুঃসাহসিকতা, বাক্যকে ক্রমাগত পরবর্তী চরণগুলিতে বিসর্পিত করার প্রবণতা পরবর্তী বলাকা কাব্যের প্রবহমান পয়ার ছন্দের পূর্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কেবল চরণান্ত মিল ব্যতীত ইহার সহিত বলাকার 'ছবি' বা 'শাজাহান' কবিতার যেন কোনই পার্থক্য নাই—

মহাকাশভরা
এ অসীম জগৎ জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,

কোটি ছায়া পথ মায়া পথ,
দুর্গম উদয় অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায় ;

মানসী গ্রন্থে প্রায় প্রতিটি ছন্দোরূপের কবিতাই একাধিক দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু 'নিষ্ফল কামনা'র দ্বিতীয় নাই ইহাও বিস্ময়কর। 'মরণস্বপ্নে'র স্তবক গঠন ও মিল-বিন্যাসে বৈশিষ্ট্য আছে। পাঠ করিলেই তাহার স্বাদ পাওয়া যাইবে। 'সিন্ধুতরঙ্গ' আপাতদৃষ্টিতে ত্রিপদী মাত্র, কিন্তু ইহাতে বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সামুদ্রিক ঝড় ও তরঙ্গের উন্মত্তগ্রাসিতার পরিচয় আছে, ছন্দের চরণ রচনায় যেন তাহার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথম চরণগুলি ছোট ছোট, যেন ঝড়ের সূচনায় তরঙ্গগুলি লাফাইয়া উঠিতেছে—

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্রকোলে
উৎসব ভীষণ।
শতপক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।

পর মুহূর্তেই যেন মত্তর বাতাসে আরও ভয়ংকর ঝটিকাঘাতে বিশাল সমুদ্রতরঙ্গ ক্ষুদ্র তরণীটিকে ঝাঁকাইয়া ভিজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—

আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি হা হা করে ফেনরাশি
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড় প্রকৃতির।

'মেঘদূত' কবিতাটি যেন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের সহিত মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাস যোগ করা। ইহাকে বলা যাইতে পারে সমিল প্রবহমান পয়ার। এই ছন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ পরবর্তী কালেও অক্ষুণ্ণ ছিল।

মানসীর ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন যে, এই কাব্যে 'কবির সঙ্গে শিল্পী' যোগ দিয়াছে। এই 'শিল্পী' কেবল ছন্দোদক্ষ একথা বলিলে শিল্পী-শব্দের

সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ করা হইবে। কবিতার শিল্পগুণ তাহার ছন্দ, অলংকার, স্টাইল, ভাব প্রকাশের চারুতা, রসবস্তু-নির্মাণের স্বাচ্ছন্দ্য—সব কিছুর উপর নির্ভর করে। মানসী কাব্যে এই সকল ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অভিরাম কৃতিত্ব কাব্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র কাব্য জুড়িয়া একটি অসামান্য চিত্র-ধর্মিতা প্রকাশ পাইয়াছে। সামান্য উপমায়, বিরলবর্ণ রেখায় চকিত মূর্তি উদ্‌ভাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই দ্রষ্টব্য। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় প্রকৃতি একটি রহস্যপরিপূর্ণা কৌতুকময়ী নারীমূর্তি ধারণ করিয়াছে—

"কবির সঙ্গে শিল্পী এসে যোগ দিল"

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা
রহস্য আপন।
তাই অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস আকাশতলে
জ্বালাইয়া শতলক্ষ
নক্ষত্রকিরণ।

নারীসৌন্দর্য

এমন কি 'কুহুধ্বনি' কবিতায় কোকিলের দ্বিপ্রাহরিক অবিরাম কুহুতানকে কবি এই বিশ্বকেন্দ্র-নিহিত কোনো সৌন্দর্যরূপিণী সত্তার বীণাধ্বনি বলিয়া মনে করিয়াছেন। আবার 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় প্রকৃতির রৌদ্র-ভীষণ নিষ্ঠুরতাকে কবি এক রাক্ষসীর উন্মত্ত রসনারূপে দেখিয়াছেন। 'সুরদাসের প্রার্থনা' 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতা তিনটিতে নারীসৌন্দর্যের বর্ণনায় চিত্রার 'উর্বশী'র আভাস পাওয়া যায়। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় কবি মূরতিভুবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলোকলুপ্ত বিজনতায় আশ্রয় চাহিয়াছেন, কিন্তু মূর্তিকে সম্পূর্ণ তিরোহিত করিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে নিবিড়-তিমির গোপন হৃদয়ে একটি আদর্শান্বিত মূরতি জাগিয়া উঠিয়াছে—

বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে—

সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী' কবিতায় এই নবমূর্তিরই পুনর্বর্ণনা দেখিতে পাই। 'মেঘদূত' কবিতায় যক্ষনারীর রূপকে কবি নিখিল-বিশ্বের চিরসৌন্দর্যময়ী মানস-লক্ষ্মীর অনবদ্য রূপ অঙ্কন করিয়াছেন—

অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্যচন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজ-ফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যা প্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশিরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণ এই 'মেঘদূত' কবিতা হইতেই সুরু হইয়াছে, 'অহল্যার প্রতি কবিতায় তাহা আরও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'বিস্মৃতি-সাগর নীলনীরে প্রথম উষার মত' আবির্ভূতা অহল্যাই চিত্রা কাব্যে উর্বশীতে পরিণত হইয়াছে, যে কোনও রবীন্দ্র-কাব্যে-পাঠকই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

## মানসীর নৈরাশ্যবাদ

মানসী কাব্য প্রকাশের পর প্রথম চৌধুরী এই কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে একখানি সমালোচনা-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া মানসী কাব্যব্যাখ্যায় তাহা কবিজবানি বলিয়া বিশেষ মূল্য পাইয়া আসিতেছে। পত্রটি পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের ৫ম বর্ষ (১৩২৫) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত করেন এবং অদ্যাবধি মানসীর পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত আছে। এই পত্রে কবি বলিয়াছেন—

"মানসী সম্বন্ধে লিখেছ যে, তার মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। আমি বের করতে

চেষ্টা করছিলুম এই despair এবং resignation-এর মূলটা কোনখানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে। সেইজন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর এক দিকে ফিলসাফি। এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

despair ও resignation সম্পর্কে কবি স্বীকৃতি

একথা সত্য মানসী কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় একটি নিষ্ফলতা, নৈরাশ্য ও বিষাদের ভাব যুক্ত আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা-অনুসারে তাহার মূল খুঁজিবার চেষ্টা আপাতত আমরা করিতে চাহি না, কিন্তু despair ও resignation-এর ভাবটাই মানসী কাব্যলোচনায় দেখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্থানকালের বিচারে মানসী কাব্যের কবিতাবলীকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্বে গাজিপুরে যাইবার পূর্ববর্তী কবিতা, দ্বিতীয় পর্বে গাজিপুরের কবিতা এবং তৃতীয় পর্বে গাজিপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বিভিন্ন স্থানে রচিত কবিতা। প্রথম পর্বান্তর্গত কবিতা হইতেই একটি বিষাদক্ষুব্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং মানসী কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন, মানসীর প্রথম পাঁচছটি কবিতা বেদনার কবিতা। এই বেদনার হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকে স্মরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, মানসীর 'বেদনাবিষাদের মূলে এই কারণগুলি বর্তমান—

ইহার সম্ভাব্য কারণ

ক। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবিজীবনে এক গভীর শোকের অনপনেয় ছায়া বিস্তার করিয়াছিল এবং কিছুকাল ধরিয়া জীবনের সুখশান্তি তিরোহিত হইয়াছিল।

খ। কবি এই সময় ইন্দ্রিয়জ প্রেমের সংকীর্ণতায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে-

ছিলেন এবং ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের বিশুদ্ধিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই দেহব্যতিরিক্ত প্রেমের জন্য আকুলতা ও অনেকগুলি কবিতার মর্মকথা।

গ। প্রকৃতির মধ্যে কবি চিরকালই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও প্রশান্ত সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির একটি নিষ্ঠুর জড়রূপ তাঁহাকে বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে।

ঘ। বাঙালী জীবনের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, শাস্ত্রের দ্বারা পাশবদ্ধ ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা, অমানবিক আচার তাঁহাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ করিয়াছে।

ঙ। দেশপ্রেমের নামে কতিপয় দেশহিতৈষী যুবকের অন্ধতা ও রক্ষণশীলতা তাঁহাকে অন্তরে পীড়িত করিয়াছে।

মানসীর কবিতাগুচ্ছে এই কারণগুলিও সমর্থন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ

কবির প্রকাশ বেদনা

স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন—

"কবির চিত্তের দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে বলতে চায়, সেই বলার জন্য তার মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে তার বেদনা-প্রকাশের ব্যকুলতা, এটা তাকে অতি মাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। তার জীবনের আর একটা দিকও আছে; সে অধ্যায়ে সে বেদনার উৎস হতে প্রাপ্ত ভাবকে জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যে সৃষ্টির আবেগ, এটা তাকে এমন একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়। বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখ বেদনার অতীত এমন একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে, চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গভীর থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাকে বেঁধে দেন। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।"

এই ধর্মে হয়ত মানসীর স্রষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছেন কিন্তু ঐযে প্রকাশ ব্যাকুলতা তাহাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মানসীর প্রথম স্তরের কবিতাগুলির মধ্যে যে একটি বিষাদ-মাখা ভাবনা চাপা রহিয়াছে তাহা অস্পষ্ট নহে।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 'নিষ্ফল

মানসীর বিষাদ চেতনা

কামনা' প্রভৃতি কবিতা রচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, "ইহাদের মধ্যে একটি গভীর বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, পর পর পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। প্রেমের মধ্যে কী একটা গভীর নিষ্ফল কামনা কবিকে যেন পীড়িত করিতেছে। প্রেমকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন।" গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "মাঘোৎসবের সময় যে রচিয়াছিলেন, 'নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও'—সেই সুর ধ্বনিতে দেখা যায় কয়েকটি কবিতায়—আত্মনিবেদন ও আত্মনির্ভরের ভাব সেখানে খুব স্পষ্ট। তাহার দ্বারা কাব্যের রসধারা ব্যাহত হইয়াছে কিনা তাহা গভীরভাবে বিচার্য। দুঃসাহসিক কল্পনা তীব্র আবেগের অভাবে অসহায়ভাবে প্রকাশ পায়. তাহা সাধারণ কবিতাকে দুর্বল করিয়া দেয়। 'জীবনমধ্যাহ্নে' 'তাই আজ বারবার ধাই তব পানে, ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর' —একথা বিশুদ্ধ কাব্যের বিষয় নহে। 'শূন্যগৃহে', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাতেও এই অসহায় আত্মনিবেদনের ভাব বেশ স্পষ্ট। বিশ বৎসরের যুবক প্রমথ চৌধুরী ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, despair ও resignation কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য।" এই নৈরাশ্য কেবল মানসীতে নয়, সমকালীন রাজা ও রানী নাটক এবং মায়ার খেলা গীতিনাট্যেও পাওয়া যায়। মানসী কাব্যের আলোচনা শেষ করিয়া প্রভাতকুমার পুনর্বার তাঁহার অভিমত দিয়াছেন,

রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য

"মানসী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ কোনো যুগের বিশেষ মনোভাবাশ্বিত রূপে পাইনা। মোটামুটিভাবে বলা হয় ইহাদের মধ্যে একটা বিষাদমাখা নৈরাশ্য ফুটিয়াছে।"

মানসীর অনেকগুলি কবিতা একটি সুগভীর মৃত্যুশোকের বেদনা হইতে উৎসারিত। এই কবিতাগুলির কেন্দ্রে আছে নারী, চিরবিরহের দ্বারা বিচ্ছিন্না। অনন্ত বিচ্ছেদব্যথায় কবি তাই সমস্ত বেদনা বহন করিয়া চলিয়াছেন। স্মরণের মালা গাঁথিয়া, ক্ষণিক দুঃখকে অনন্ত সান্ত্বনায় রূপান্তরিত করিয়াও কবি তৃপ্তি পাইতেছেন না। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সেই নারীকে সৌন্দর্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া কতরূপে চলিয়াছে তাহার আরতি। 'ক্ষণিক মিলন', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'আকাঙ্ক্ষা', 'মরণ-স্বপ্ন', 'নিভৃত আশ্রম', 'শ্রান্তি', 'বিচ্ছেদ', 'মানসিক অভিসার', 'ভৈরবী গান', 'মায়া', 'ধ্যানে', 'গোধূলি', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'বিদায়',

মৃত্যু শোকের কবিতা

'আগন্তুক', 'সন্ধ্যায়', এই শ্রেণীর কবিতা। 'ক্ষণিক মিলনে'র স্মৃতি বহন করিয়া কবি এক 'ছায়াবৎ জগতে' অবসন্ন পড়িয়া আছেন। 'বিচ্ছেদের শান্তি' কবিতার নাম হইলেও ইহা যে শান্তি নয়, অভিমান, তাহা বুঝা যায়। এই জাতীয় সব কটি কবিতায় মৃত্যুর পটভূমি যে একটি বিশেষ মৃত্যুকে মনে করিয়া রচিত তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। 'শূন্য গৃহে'-র কাব্যরূপ আর্তনাদের মত মনে হয়। 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতায় বেদনার তীব্রতা ভাষার মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। 'ভৈরবী গান' সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই আকস্মিক মৃত্যুর অভিঘাত যে মানসীর অনেকগুলি কবিতার despair-এর হেতু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। প্রেমের আর্তনাদও অসংখ্য কবিতার বিষাদ-বৈরাগ্য জাগাইয়া তুলিয়াছে। দেহ ও দেহব্যতিরিক্ত সৌন্দর্য, ইন্দ্রিয়জ কামনা ও বিশুদ্ধ প্রেম, বাসনার বন্ধন ও অনন্ত বহির্জগৎ—এই দুইয়ের মধ্যে কবি কোনও স্থিতি-লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনের প্রবণতা যে দ্বিতীয়টির প্রতি, তাহাও কড়ি ও কোমল হইতেই বোঝা যায়। মানসীর এই কবিতাগুলি যেন তাহারই জের টানিয়া চলিয়াছে। 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় কবি তিক্ত-কণ্ঠে প্রেম সম্পর্ক তাঁহার মোহভঙ্গের করুণ অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন—

প্রেম সংক্রান্ত বিষাদ চেতনা

বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।

প্রেমের প্রথম রোমান্টিকতার অবসানে 'চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি'র বেদনা 'পুরুষের উক্তি' ও 'নারীর উক্তি' কবিতাদ্বয়ে উভয় দিক হইতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'নিস্ফল কামনা' কবিতায় প্রেমকে বিশ্বজগৎ ও ঈশ্বরের জন্য প্রস্ফুটিত শতদল বলিয়া স্বীকার করিয়া কবি এই সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন যে, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' 'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় তথাপি কবি সেই প্রেমই প্রার্থনা করিয়াছেন। 'ব্যক্ত প্রেম' অনাবৃত নারী হৃদয়ের আর্তনাদ। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা'। প্রেমের দেহক্লান্তি এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়জ সংকোচকে অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধিতার মধ্যে তাহাকে সৌন্দর্যে গ্রহণ করিবার ব্যাকুলতা সুরদাসের কণ্ঠে প্রকাশ করিয়া কবি যেন কিছুটা তৃপ্তি পাইয়াছেন।

প্রকৃতি সম্পর্কে কবির নৈরাশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি' ও 'শূন্য গৃহে' এই কবিতাগুলিতে। ইহাদের মধ্যে 'সিন্ধুতরঙ্গ' ব্যতীত তিনটি কবিতাই গাজিপুরে লেখা, যখন প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্যে কবি মনের শান্তি খুঁজিতেই গিয়াছিলেন। 'কুহুধ্বনি' কবিতায় যে রমণীয় প্রকৃতি-মুগ্ধতা আছে, আলোচ্য কবিতাগুলির সহিত তাহার কী দুস্তর বৈপরীত্য। 'সিন্ধুতরঙ্গ' না হয় ঘটনা-বিশেষ স্মরণ করিয়া লেখা, কিন্তু অন্যগুলি তাহা নয়। অথচ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির সম্পর্কে কবির আস্থার ভাব তখনও ফিরিয়া আসে নাই। তাহার নিষ্ঠুর জড়াবর্তন হৃদয়ের স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় কবি প্রকৃতির হৃদয় বৃথাই অন্বেষণ করিয়াছেন। অন্তরাল ছিন্ন করিয়া অসীম রহস্যজাল ভেদ করিয়া মানুষকে তাহার হৃতসম্পদ, 'গুপ্ত স্নেহমুখ' কেন প্রকাশ করিয়া দেখায় না, 'শূন্য গৃহে' কবিতায় ইহাই কবির অভিমান। তাই প্রকৃতি 'জড়ময় সৃজনের স্রোত' মাত্র—আপন গর্জনে আত্মবধির, ইহাই 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতার বক্তব্য।

প্রকৃতি নৈরাশ্য

বাঙালী জীবনের সংকীর্ণতা কবিকে নৈরাশ্যক্ষুব্ধ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'দুরন্ত আশা' 'পরিত্যক্ত' ও 'ধর্মপ্রচার' কবিতায়। দেশ-হিতৈষিতার প্রতি কবির ক্ষুব্ধ বিদ্রূপ 'বঙ্গবীর', 'দেশের উন্নতি' প্রভৃতি কবিতায় দ্রষ্টব্য।

## প্রেমের কাব্য মানসী

'উপহার' বাদ দিলে মানসী কাব্যে মোট ৬৫টি কবিতা আছে। ইহাদের, মধ্যে 'পত্র', 'শ্রাবণের পত্র', 'পত্রের প্রত্যাশা', 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর', 'ধর্মপ্রচার', 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', 'কবির প্রতি নিবেদন', 'পরিত্যক্ত', 'গুরু গোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার', 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ'—এই জাতীয় কবিতাগুলি বাদ দিলে অধিকাংশ কবিতার বিষয় বস্তুই প্রেম। অধিকাংশ বলিবার কারণ ইহাদের মধ্যে 'বধূ', 'সিন্ধুতরঙ্গ' বা 'অহল্যার প্রতি' জাতীয় কবিতাগুলিকে প্রণয়-সংক্রান্ত বলিতে আপত্তি হইতে পারে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, মানসী কবি-যৌবনের কাব্য এবং যৌবনের আরক্ত সংরাগ এই

অধিকাংশই প্রেমের কবিতা

কবিতা গ্রন্থে ভালো ভাবেই পড়িয়াছে। এই কাব্যের নামকরণেও নারীর ইঙ্গিত (অন্তত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক), ইহার কেন্দ্রেও নারীরই অবস্থান। ইহার অধিকাংশ কবিতাই প্রেম কবিতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই কাব্যে কবির মনোভাবে যে despair এবং resignation দেখা দিয়াছে, তাহাও মুখ্যত এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন,

'মানসীর ভালোবাসা অংশটুকুই কাব্য কথা'

"ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্য কথা—বড়ো রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কী চায় তা কিছু জানে না।"

রোমান্টিক অনির্দেশ্যতা

এক কথায়, মানসীর প্রেম কবিতাগুলি এক অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা, রোমান্টিক দুর্জ্ঞেয়তা এবং নিরুদ্দিষ্ট মানস-লক্ষ্মীর সহিত মিলন-বিরহের সারস্বত উপাখ্যান। বহির্জগতের পরিবর্তমান নিসর্গ-দৃশ্য, বর্ণসুষমা, ধ্বনিস্পন্দ ও তরঙ্গাঘাত এই মানস-ব্যাকুলতাকে প্রতিদিন উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে। কবির নিঃসঙ্গ প্রহরগুলি ভরাইয়া তুলিয়াছে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায়, সংশয়ের আবেগে, মানস-মিলনের আতুর সম্ভাবনায়, বিচ্ছেদের অমূলক আশঙ্কায়, মানসিক অভিসারের পুলকিত আস্বাদে, ভ্রান্তি নিরসনের আকস্মিক আঘাতে। মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি সেই অস্থির উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ মাত্র। এই

'উপহার'

প্রকাশ শেষ পর্যন্ত কবিতার সম্পূর্ণতায় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে কিনা সে প্রশ্ন কালান্তরের সমালোচকের করণীয়, কিন্তু এক রোমান্টিক অনির্দেশ্যতা, শূন্যতাবোধ ও নৈর্ব্যক্তিক বিরহচেতনাই এই কবিতাগুলির মূল সুর। এইজন্য 'উপহার' কবিতায় কবি লিখিয়াছিলেন—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্তে বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা,
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।

এ চিরজীবন তাই আর কোনো কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা—
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

এই মানসী-প্রতিমাখানি আধখানি অসীম এবং আধখানি সীমা দিয়া নির্মিত। ইহার পশ্চাতে কোনো লৌকিক নারী আছে কিনা সে প্রশ্ন আপাতত অবান্তর। কারণ কবি স্বীকার করিয়াছেন—

মানসীতে কবির মানস প্রতিমার ব্যাখ্যা

"মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই—কেউ বা বলছে আছে, বলে বহির্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে—কেউ-বা জানে নেই, তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্ধনিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করছে। একেই বলো ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে, কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"

মানসী কাব্যালোচনায় মন্তব্যটি অতীব গুরুপূর্ণ। ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কবি আপনাকে অসম্পূর্ণ শিল্পী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ঈশ্বরের অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু অসীম ক্ষমতা নাই। তিনি আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসিয়া অর্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী নির্মাণ করিতেছেন এবং তাহাকে পূজা করিতেছেন। এই পূজা শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ—'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় তাহা দেখা যাইবে। কবি অনেককে ভালোবাসেন, কিন্তু 'মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে।' অর্থাৎ বাস্তব জগতে কবির প্রণয়-বিরহ-মানাভিমান অপেক্ষা কোনো কল্পনারীর সহিত প্রেমলীলাই মানসীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, (যদিও তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয় বলিয়াই অনুমান; 'অপেক্ষা' জাতীয় কবিতা কোনো কাল্পনিক নারীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহা রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতি হওয়াই সম্ভব)। এই কল্পনারীর মূলে কোনো বাস্তব নারীর স্মৃতি আছে, হয়ত মৃত্যুর দ্বারা বিরহিত বলিয়াই তাহা মানস-জগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এইজন্য মানসীতে মৃত্যুর একটি ভূমিকা আছে। মৃত্যুর বিচ্ছেদেই সে অসীমে স্থানান্তরিত, আর কাব্যের অনুভূতির দ্বারাই তাহার সীমা রচনার চেষ্টা।

মানসীর প্রেম কবিতাগুচ্ছের এক প্রান্তে আছে 'নিষ্ফল কামনা' অন্যপ্রান্তে 'মেঘদূত'। ইহাদের মধ্যে প্রায় আড়াই বৎসরের ব্যবধান। 'নিষ্ফল কামনা'র কবি বাসনা-বহ্নির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত; আর 'মেঘদূতে' আসিয়া বাসনাহীন সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ স্বরূপটি যেন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। নারীর দেহরূপের মধ্যে যে অমৃত আবৃত আছে, অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে বিজন তারকার মধ্যে যেমন 'স্বর্গের আলোকময় অসীম রহস্য' গোপন থাকে, তেমনি নারীর রূপের নিবিড় তিমির তলে 'আত্মার রহস্যশিখা' কম্পমান। কিন্তু সে রহস্যের সন্ধান তিনি এখনও পান নাই। কবি এখনও 'ভীত, কাতর, দুর্বল, ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ দিশাহারা, আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর'। 'মেঘদূত' কবিতায় কবি কালিদাসের কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার অবরুদ্ধ হৃদয়বেদনা অনেকখানি অপসারিত করিতে পারিয়াছেন—

'নিষ্ফল কামনা' ও 'মেঘদূত'

> লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
> চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
> অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

এই বিরহের স্বর্গলোকে অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে চিরনিশি একাকী যে বিরহিণী প্রিয়া বাস করিতেছে, সেই হইল কবির মানস-প্রতিমা—মানসীতে যাহাকে কবি খাড়া করিয়াছেন। সীমা-স্বর্গ হইতে ভ্রষ্টা হইয়া অসীম সৌন্দর্য লোকে নির্বাসিত বলিয়াই সে চিরবিরহিণী অথবা কবি চিরবিরহী। অথচ কবির সহিত তাহার প্রেম মিথ্যা নয়। তাই সেই প্রেমের স্মৃতিকে চিরজীবী করিবার জন্যই তাহা জন্মান্তরের বলিয়া দাবী করিতে হয়, তাই অনন্ত প্রেমের পরিকল্পনা—

যক্ষনারী ও কবির মানসপ্রতিমার সাদৃশ্য

> যত শুনি সেই অতীত কাহিনী
> প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
> অতি পুরাতন বিরহ মলিন-কথা,
> অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
> দেখা দেয় অবশেষে
> কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
> তোমারই মূরতি এসে
> চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

এই 'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকা'টি কবির সকল চিন্তা ও চেতনা, কর্ম ও নিঃসঙ্গতা, অস্তিত্ব ও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে—

দিবসনিশি জাগিয়া আছি
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই। ( আকাঙ্ক্ষা )

কী অকপট বেদনাময় আত্মস্বীকৃতি। সুদূর লণ্ডনে বসিয়াও কবি ভুলিতে পারেন নাই—

সম্মুখেতে তোমারই নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন দেশ
কোন নিরুদ্দেশ মাঝে। ( বিদায় )

এই মানস-মূর্তি রচনাতেই মানসী কাব্যে কবির ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাকে ঈশ্বর বলিবার কারণ এইখানেই নিহিত। ইহার সবটাই যে মনঃকল্পিত, কবির আপন মনের মাধুরী দ্বারা নির্মিত। যে দেখার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কবি তাহারই উদ্দেশে চাহিয়া আছেন, স্বপ্নে তাহারই কেশপাশ উড়িতে দেখিতেছেন, 'বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া' তাহাকে বরণ করিতেছেন। তাই এ প্রেমের মাধুরীটুকু কবিরই আস্বাদ্য। এ বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনা যেমন তাঁহার, এ মানস-মিলনের, প্রীতি-ধ্যানের অনন্ত সুখও তাঁহারই। তাই শেষ পর্যন্ত কবির দিনযামিনী ধৈর্যহারা অর্থহীনতার প্রলাপ হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতি তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছে, সংসার তাঁহাকে তৃপ্তি দিয়াছে, জীবন তাঁহাকে উদ্দেশ্য দিয়াছে—

প্রকৃতির শান্তি

এই যে অলস বেলা অলস মেঘের মেলা
জলেতে আলোতে খেলা
সারাদিনমান,

এরই মাঝে চারিপাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ ওই হাসি
ওই দুনয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে,
তুমি মোরে ডাকো।
তাই ভাবি এ জীবনে, আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাকো।

এই জন্যই কাব্যখানির নামকরণ করিয়াছেন মানসী। মানসী এই কবিসৃষ্ট মানস-প্রতিমা।

## মানসী কাব্যে প্রকৃতি

কড়ি ও কোমল কাব্যের 'প্রাণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দুইটি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, মানবের জীবন্ত হৃদয় মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে এবং 'সূর্যকরে প্রফুল্ল কাননে' একটি অংশ লাভ করিতে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে এখানে মুখবন্ধ নিষ্প্রয়োজন। মানসী কাব্যে প্রকৃতি নিসর্গের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে মানসীর কবিতাগুলি মুখ্যত তিনপর্বে বিভক্ত—প্রাক্‌গাজিপুর, গাজিপুর এবং গাজিপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া। গাজিপুরের কবিতাগুলিতেই প্রকৃতির রমণীয় ভূমিকা স্থাপিত হইয়াছে, মন নিমগ্ন হইয়াছে অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবা মাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে।" কিন্তু গাজিপুরের পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতেই দেখা যায়, কবির প্রেমচেতনা আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতিই কবির বিরহের উদ্দীপক, মিলনের স্মৃতি—

গাজিপুরের পূর্ববর্তী কবিতার প্রকৃতি

বিরহে তারই নাম শুনিতাম পবনে
তাহারই সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে।

পাতার মরমর কলেবর হরষে ;
তাহারই পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারই সুধা স্বপনে। ( বিরহানন্দ )

তবে এই পর্বে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে 'সিন্ধুতরঙ্গ' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় প্রকৃতি কবির কাছে জড় অন্ধশক্তি হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের রুদ্র ভয়ংকর লোলুপ লেলিহজিহ্ব প্রাণগ্রাসিতার সহিত তাহার চিরশান্তময়ী শোভাশ্রীকে কবি যেন মিলাইতে পারিতেছেন না। বরং এই স্নেহহীন বিমাতৃসুলভ প্রকৃতির তুলনায় মানবিক স্নেহপ্রেমকে কবি মৃত্যুঞ্জয়ী বলিয়া মনে করিয়াছেন। প্রকৃতির এই জড় শক্তির প্রতি কবির এক জাতীয় অসন্তোষ গাজিপুরে লেখা কবিতাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতা তাহার প্রমাণ। কিন্তু যে প্রকৃতি মানবের বিকল্প তাহা দীর্ঘকাল স্নেহহীন নিষ্ঠুর জড়শক্তি হইয়া থাকিতে পারে না। মানসীর সান্নিধ্য বঞ্চিত বিরহী কবির কাছে প্রকৃতিকে স্নেহময়ী করিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার ক্ষেত্র হইতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়াই কবি তাঁহার মানসী প্রতিমার সহিত হরণ পূরণের লীলানাট্য অভিনয় করিবেন। গাজিপুরে লেখা পরবর্তী একটি কবিতায় তাই কবির এই সুরবদলের আভাস দেখিতে পাওয়া গেল—

নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতি

প্রকৃতি সম্পর্কে সুর বদলের আভাস

তবু তোরে ভালবাসি, পারিনে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী।
স্নেহহীন আলিঙ্গনে জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।…
যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি—
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি। ( প্রকৃতির প্রতি )

গাজিপুরে ইহার পর হইতে প্রকৃতিকে কবি সাগ্রহে সাদরে গ্রহণ করিলেন, প্রকৃতির পটে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণসিংহাসন পাতা হইল। প্রায় প্রতিটি কবিতার

অন্তরালে তাই একটি নৈসর্গিক ভূদৃশ্যের বর্ণাভা লক্ষ্য করা যায়। সে স্মৃতির কথা ১৯৪০ সালেও কবির কাছে কতখানি স্পষ্ট, ভূমিকায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন কবি—

"...গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে। সেখানে যবের ছোলার পাটের ক্ষেত, দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি অনাদৃত, বাঙলা দেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চাল-ওয়ালা পল্লী।"

গাজিপুরের স্মৃতি

এ বর্ণনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিখুঁত তথ্যপুঞ্জিত বাস্তব। কিন্তু ইহার সকল বস্তুসমারোহের মধ্য দিয়া একটি গভীর নিসর্গ সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে 'কুহুধ্বনি' কবিতায়। একই বর্ণনা উক্ত কবিতাতেও পাওয়া যায় কিন্তু সেই দ্বিপ্রহরের নিদ্রা-হীনতার মধ্যে যখন কোকিল ডাকে কবি তখন শুনিতে পান "প্রকৃতির মর্মগান পশিতেছে মানবের ঘরে।" সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতিকে একটি অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র অখণ্ড মাধুরীর স্রোতে ডুবাইয়া এই কুহুতান অনাদিকালের বিরহ-বেদনাকে অভ্রান্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানবমনে ইহার রেশ থাকিয়া যায়, যুগযুগান্তর মানবজীবন এই গানে আর্দ্র হইয়া আসে। আর তখন কবির মনে হয়—

কুহুধ্বনি

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি! (কুহুধ্বনি)

'মরণস্বপ্ন' কবিতায় গাজিপুরের এক নিস্তব্ধ কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির প্রথম যাম কবিমনের অলস ভাবনা বহন করিয়া একটি শিথিল বিরহবেদনাতুর মৃত্যুস্মৃতিময়

স্বপ্নাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে রাত্রির গভীর নিবিড় হইয়া জাগ্রত চৈতন্য লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, কবি যেন ধীরে ধীরে কালচিহ্নবিহীন ব্যাপ্তিহারা অনন্ত শূন্যসিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুচেতনার এমন রহস্যময় অচিন্তনীয় মুহূর্ত রচনা করা বিস্ময়কর। এই শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রনাথ সমগ্র কবিজীবনে খুব কমই লিখিয়াছেন। পুনর্বার তাঁহার অবসন্ন চেতনা অবলুপ্তির অতল হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তখন সম্মুখের প্রাকৃত জগৎ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হইয়াছে—

মরণস্বপ্ন

নয়ন মেলিনু সেই বহিছে জাহ্নবী—
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটিরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

স্বপ্ন ও বাস্তব জগতের সীমায় দাঁড়াইয়া দুই চেতনাকে স্পর্শ করিবার এই অবিশ্বাস্য অনুভূতি মানসী কাব্যে আর নাই! এই কবিতার কয়েকদিন পূর্বে লেখা 'জীবনমধ্যাহ্ন' কবিতাতেও গাজিপুরের সন্ধ্যাকালীন নিসর্গের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, অনন্ত দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার মানস-লক্ষ্মীকে বিশ্বময়ী করিয়া দেখিয়াছেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে শান্তমন্দ প্রকৃতি নয়নসম্মুখে নিবিড় স্নিগ্ধ জীবনসুধা বিতরণ করিয়াছে—

জীবনমধ্যাহ্ন

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমল বাহিনী
ক্ষীণগঙ্গা সৈকত-শয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগযুগান্তর
ইতিহাসে নিবিষ্ট নয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

জগতের মর্ম হইতে জীবনলহরী লইয়া এই যে দিন যামিনী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কবি প্রকৃতির শান্তি পান করিয়াছেন, 'চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা' লাভ করিয়াছেন। তখন মনে হইয়াছে—

প্রকৃতির ভিতর দিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা

প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা—
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ ধারা।

একই প্রকৃতি-চিত্র আছে 'বিচ্ছেদ' কবিতাতেও—

চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির।
প্রান্তে নীল নদীরেখা দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

অন্ধকার নদীতীর এবং শান্তি ও সান্ত্বনাদাত্রী প্রকৃতি 'পত্রের প্রত্যাশা' কবিতাতেও প্রাপ্তব্য। 'অপেক্ষা' কবিতা দুইটি ভিন্ন জাতের হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া যে গ্রামীণ জীবনচিত্র পাওয়া যায়, তাহা এই গাজিপুরের হওয়াই সম্ভব। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় আবার গাজিপুরকে পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে প্রকৃতি আর আঞ্চলিক নয়, সুরদাসের জবানিতে কবি কেবল একটি নিসর্গের আভাস মাত্র দিয়াছেন। ইহা মানসীর একটি বিশিষ্ট কবিতা। কবি সুরদাসের প্রেম জৈবিক কামনাকে ভস্মীভূত করিয়া বিশুদ্ধ নিষ্কাম সৌন্দর্যে দীক্ষিত হইতে চাহিয়াছে। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির উপরও যে আঁধারের তুলি পড়িবে, আঁখির অপরাধে নিসর্গ গোপন হইবে, এই চিন্তায় কবি শিহরিত। আজ তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন, প্রকৃতি তাঁহাকে কী অবিশ্রান্ত কল্পমুরতি দান করিয়াছে, কী সত্য মদিরস্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কবির বাঁশরিকে ইহারাই নানা সুরে উৎসারিত করিয়া দিতেছে—

'সুরদাসের প্রার্থনা'

ইহারা আমারে ভুলায়ে সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে ?
মাধুরী মদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।

সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি—
পাগলের মত রচি নব গান
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—
ডুবাইতে থাকে কুসুম গন্ধ
বসন্ত সমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্ব শরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।

কিন্তু কেবল বর্ণনা নয়, প্রকৃতির মধ্যে রোমান্টিক কবি এক অস্পষ্ট অনির্দেশ্য সত্তার চরণপাত শুনিতে পাইয়াছেন। এই যে ভুবন হইতে ভুবনমোহিনী মায়া বাহির হইয়া আসিয়া যৌবনভরা বাহুপাশে কবির কায়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, ইহারই আকর্ষণেই প্রকৃতি কবির হৃদয়ে এত মধুর লাগে। তাই ইন্দ্রিয় দিয়া যে প্রাকৃতরূপ হৃদয়ে উৎকীর্ণ তাহা লোপ করিলে কেবল নিখিলের শোভাই যাইবে না, শোভার কেন্দ্ররূপিণী 'বিশ্বের বক্ষের কাছে' উপবিষ্টা 'যেন কোন সরলা সুন্দরী' পর্যন্ত হারাইয়া যাইবে—

লক্ষ্মী যাবেন তাঁরই সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মত।

অবশ্য এই বিষাদেই 'সুরদাসের প্রার্থনা' সমাপ্ত হয় নাই। সেই ইন্দ্রিয়লুপ্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়া অর্থাৎ কামনাহীন দেহচেতনাহীন বিশুদ্ধ বিমূর্ত কামনার মধ্য দিয়া কবি একটি পরিশীলিত পরিস্রুত দেহান্তরিত প্রকৃতি ও মানসীর ধ্যান করিয়াছেন। এখানে প্রকৃতি ও প্রেমিকা ধীরে ধীরে একই উপাদানে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির বিশুদ্ধায়ন

প্রকৃতি এখন পটভূমি মাত্র নয়, প্রকৃতি ও মানসী ক্রমশ একই সত্তায় রূপান্তরিত—

বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে—
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরদিন জেগে রবে।
এই বাতায়ন ওই চাঁপাগাছ
দূর সরযূর রেখা—
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।

এই চাঁপাগাছটি অবশ্যই পূর্বকথিত গোলকচাঁপা এবং সুরদাসের সহিত সংগতিরক্ষার জন্য জাহ্নবী হইয়াছে এখানে সরযূ, এইমাত্র। এইভাবেই কবির মানস প্রতিমাকে আদর্শায়িত ও উর্ধ্বায়িত করিয়া কবি যে তাঁহাকে অন্তরে চিরকালের মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত প্রকৃতিকেও লইতে চাহিয়াছেন। এই ভাবেই অনন্ত প্রেমের সহিত প্রকৃতিও অনন্ত হইয়াছে। এইবার 'উপহার' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অর্থ স্পষ্ট হইবে—

উপহার-এর শেষাংশ ব্যাখ্যা

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।

সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা।
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তর বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।

এইভাবেই প্রেমের ক্ষেত্রে, কী প্রকৃতির ক্ষেত্রে, মানসী কাব্যে কবির 'অন্তর বাহিরের ব্যাকুলিত মিলন' ঘটিয়াছে।

অন্তরায়িত প্রকৃতি

'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রকৃতি আর বহিঃপ্রকৃতি নয়, একেবারে অন্তরায়িত প্রকৃতি। 'মেঘদূত' কবিতায় কবি কালিদাসের কাব্য অনুসরণ করিয়া একটি চিরকালীন ভারতবর্ষের বর্ষা প্রকৃতির রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যে চিত্রের অন্তরঙ্গ সুরটি চিরবিরহের বেদনায় মদির। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবি অহল্যার চেতনার সোপানে শঙ্কিত চরণ ব্যথিয়া জীবধাত্রী জননীর প্রাণের গোপন

বিশ্বচেতনার পূর্বাভাস

দুর্নিরীক্ষ্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সূক্ষ্মতম বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, 'বসুন্ধরা' কবিতায় তাহার পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছে। কবিতা দুইটি গাজিপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শান্তিনিকেতনে রচিত। গাজিপুরের পরবর্তী কালের কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।

## নিষ্ফল কামনা

### ভুমিকা

'নিষ্ফল কামনা' মানসী কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা। এই কবিতায় কবি দৈহিক কামনার নিষ্ফলতা, রূপজ মোহের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

ভাববস্তু

নারীর সৌন্দর্য তাহার দেহকে অবলম্বন করিয়াই, কিন্তু দেহের মধ্যেই সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ নয়। প্রেম দেহাতিরিক্ত কোনো অনুভূতি। দেহ স্পর্শ করিয়াই যদি কেহ মনে করে প্রেম লাভ করা গেল তবে তাহার পরিণামে এই নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতা। একটি ব্যথিত ক্রন্দনে কবিতাটির সূত্রপাত হইয়াছে। কবিতার শেষে কবি ক্রন্দন মন্দীভূত করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

রচনাকাল

১২৯৪ সালের শরৎকালে কবি দার্জিলিং যাত্রা করেন। দার্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পার্ক ষ্ট্রিটের বাসায় ১২৯৪ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ এই কবিতাটি রচিত হয়। দার্জিলিঙে বসিয়া কবি মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলি লিখিয়াছিলেন। মায়ার খেলায় কবির বক্তব্যের সহিত 'নিষ্ফল কামনা'র অংশত সাদৃশ্য দেখা যায়। 'মায়ার খেলা'য় কবির বক্তব্য "আত্মসুখ ও প্রেম প্রতিশব্দবাচক নহে। দুরাশায় মানুষ যথার্থ প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।" অমর তাহার কল্পমানসী অন্বেষণ করিতে জগৎ ভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত প্রমদার সহিত তাহার মিলন হয় নাই। অন্তিমে মায়াকুমারীগণের গান—

মায়ার খেলার সমকালীন

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মিলে না।
শুধু সুখ চলে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা।

মায়ার খেলার সহিত বক্তব্যের ঐক্য

ইহাই 'নিষ্ফল কামনা'। প্রমদার গানে আছে—

সুখে আছি সুখে আছি সখা আপন মনে।
কিছু চেয়ো না দূরে যেয়ো না শুধু চেয়ে থাকো
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

ইহার সহিত 'নিষ্ফল কামনার' এই অংশের বক্তব্য-সাযুজ্য লক্ষ্য করিবার মত—

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায়রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস।
একী দুঃসাহস!

নিষ্ফল শব্দটি মানসী কাব্যে একাধিকবার প্রযুক্ত হইয়াছে। মানসীর কবিতাগুচ্ছের সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী একদা despair এবং resignation, এই যে দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার কবিতার নিষ্ফলতা ও ঔদাস্যের কারণ। এই নিষ্ফলতার মূলে সীমা ও অসীম, সম্ভোগ-তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমাকাঙ্ক্ষা, যে ধরণের দ্বন্দ্বই থাক না কেন, 'নিষ্ফল কামনা'র মত বেদনাময় কবিতা রবীন্দ্রনাথ খুব কমই লিখিয়াছেন। অনেক সমালোচকই ইহার সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনার মূল কথাটি প্রায় একই। তাহা হইল এই, সৌন্দর্য ও প্রেম অসীম অনন্ত, খণ্ডিত দেহের মধ্য দিয়া তাহা পাওয়া যায় না। অনন্ত সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেম ঈশ্বরিক অনুভূতি মাত্র। ইহা রবীন্দ্রকাব্যে শেষ কথা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বরং পরবর্তী বহু কবিতায় কবি এই অনন্ত প্রেম ও অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কবি এই কবিতায় প্রশ্ন করিয়াছেন—

অন্যান্য সমালোচকদের আলোচনা

আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ মায়াপথ
দুর্গম উদয়-অস্তাচল।
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায় ?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর মানসী কাব্যেই কবি দিয়াছেন 'অনন্ত প্রেম,' 'পূর্বকালে', 'ধ্যান', 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায়। সুতরাং 'নিষ্ফল কামনা' মানসীর প্রতিনিধিমূলক কবিতা নয়, ইহা মানসীর প্রবেশিকা মাত্র। যে দেহজ প্রেমের সহিত আত্মার কামনার সূক্ষ্ম সংঘাত কড়ি ও কোমল কাব্যে ধ্বনিত হইতেছিল, 'নিষ্ফল কামনা' তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। কড়ি ও কোমল কাব্যের 'পূর্ণ মিলন' কবিতায় পূর্ণ মিলনকে কবি ক্ষুধাতুর মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। 'শ্রান্তি' 'বন্দী' 'পবিত্র প্রেম'—প্রতিটি চতুর্দশপদী কবিতাই মদির যৌবনের আরক্ত কামনায় যেন ধূসর বিষাদ ছড়াইয়া দিয়াছে। দৈহিক ভোগক্ষুধায় যে প্রেমের মৃত্যু ঘটে, ইহা 'পবিত্র প্রেম' কবিতায় obsession রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, 'নিষ্ফল কামনা' প্রসঙ্গে কবিতাটি

'নিষ্ফল কামনা' মানসীর প্রতিনিধি-মূলক কবিতা নয়

ছুঁয়ো না ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া !
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া
বাসনা নিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার আকুল।
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।

কড়ি ও কোমলে ইহার সূচনা

'পবিত্র প্রেম' ও
'পবিত্র জীবন'

আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়,
সাধ করে কে আজিরে হবে পথহারা—
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়।
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ।

দর্শন-স্পর্শ-হাসি-সংগীত-যৌবন ইহারা যে সত্য নয়, জীবন যে তদপেক্ষা পবিত্র, ইহা পরবর্তী কবিতারও বক্তব্য। 'পবিত্র জীবন' কবিতায় কবি প্রেমকে কত উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন তাহা এই ছত্রগুচ্ছেই প্রমাণিত হইবে—

কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী।
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব'—একই কথার পুনরুক্তি মাত্র। সুতরাং 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কড়ি ও কোমলেরই দ্বিরুক্তি। জীবন অতি পবিত্র, প্রেম একটি দৈব ব্যাপার, সৌন্দর্য অসীম—সুতরাং পার্থিব ভোগক্ষুধা ও বাসনাবহ্নি ইহার কাছে তুচ্ছ, ইহাই কবির বক্তব্য।

## ভাবার্থ

আত্মদাহনকারী এক দুরন্ত দুর্জয় দেহকামনায় ক্ষতবিক্ষত কবি অবশেষে বাসনার নৈষ্ফল্য অনুভব করিতেছেন।

তাঁহার ব্যর্থ-বাসনার পটভূমিটিও ছিল এক ধূসর সায়াহ্নের। পশ্চিমাকাশে শেষ রশ্মিচিহ্ন সংবরণ করিতে করিতে অরণ্যে ঘনান্ধকার টানিয়া সূর্য অস্তমিত হইল, মৌনী সন্ধ্যার ক্লান্ত সমীরে বিষাদের বৈরাগ্য। এই মন্থর হতাশ্বাস মুহূর্তে কবি আকুল হইয়া তাঁহার প্রিয়তমার আঁখিপল্লব স্পর্শ করিয়া খুঁজিতেছেন তাহার দেহের পাত্রে আবৃত অমৃত ধারাটিকে। নারীর মধ্যে যে

নিত্য প্রেয়সীর অনন্ত মাধুরিমা তাহারই আভাস লাগিয়াছে কবির নয়নে—দেহের দেউল হইতে সেই মাধুর্যের প্রতিমাকে সংগ্রহ করাই তাঁহার কাতর ইচ্ছা। ম্লান সান্ধ্যগগনের নিঃসঙ্গ সন্তপ্রকাশ তারকার মধ্যে যেমন অমর্ত-লোকের রহস্য কম্পমান হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রেয়সীর দৃষ্টিপাতের অন্তরালে যেন চির-আত্মার একটি জ্যোতির্ময় সত্তার ইঙ্গিত মিলিতেছে—তীব্র ক্ষুধা দিয়া তাহাই তিনি গ্রাস করিতে চান। সে তো দেহেরই শিখা। তাই দেহের আঙ্গিক-বিচ্ছুরণেই কবি সে রহস্যের সন্ধান পাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রিয়তমের দৃষ্টিপাতে, স্মিতহাস্যের আবরণনিম্নে, বাক্যের সুরমূর্ছনায় স্নিগ্ধমুখের শোভাশ্রী অন্বেষণ করিয়াও তাহার পূর্ণ অখণ্ড সত্তাটিকে পাওয়া গেল না। ইহাই কবির অপরিতৃপ্ত আর্তনাদের কারণ। [ছত্র ১—৩০]

কিন্তু আত্মার অন্তর্লীন রহস্য জ্ঞাত হওয়া শেষ পর্যন্ত কবির কাছে বিলাপিত দুরাশা মনে হইয়াছে। অখণ্ড মানবের সামগ্রিক সত্তা অপেক্ষা তাহার খণ্ড জীবন-মাধুর্য, তাহার হাস্য কণিকা, দু'একটি প্রসন্ন বাক্য, দৃষ্টি-সম্পাতমাত্র লইয়াই কবিকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সমগ্র মানবকে লাভ করিতে হইলে অনন্ত প্রেমদানের প্রয়োজন, ইহা কবি অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সেই অনন্ত প্রেম, জীবনের অনন্ত অভাব মিটাইবার ক্ষমতা কবির আছে কিনা, ইহা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নহেন। এই অসীম গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, অগণ্য ছায়াপথ, উদয়-অস্তের লীলারঙ্গস্থলের মধ্য দিয়া চির রাত্রিদিন চির-প্রেমিকাকে সঙ্গে করিয়া অনন্ত পথ পরিক্রমার শক্তি যেন কবির নাই। আজ তাঁহার ব্যক্তিহৃদয়ের অসহায়তা, দৌর্বল্য, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও হৃদয়ভারে জর্জরিত পীড়াই যেন তাঁহার অনন্ত প্রেমের স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা বলিয়া মনে হইতেছে। [ ছত্র ৩১—৫৮ ]

বাসনার দুর্বহ ভারে কবি অবসন্ন; কিন্তু মানব তো ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নয়। জৈবিক কামনার দ্বারা মানসিক সম্পর্ক নিরূপিত হয় না। প্রেম এক স্বর্গীয় বিকাশ, তাহা দৈহিক সীমাবদ্ধতার অতিরিক্ত কিছু। মানুষ ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি, ভোগের দ্বারা তাহাকে স্পৃষ্ট করা উচিত নয়। দুঃখসুখের মধ্য দিয়া সযত্নে-সংগোপনে বিপদ-সম্পদ ও ঋতু-পরিবর্তনের চক্রমণে, জীবণ-মরণ ব্যাপ্ত করিয়া চলিয়াছে এক অখণ্ড জীবনধারা। মানুষ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত একটি পরিপূর্ণ পদ্মবিকাশ। ব্যাক্তিবিশেষের কামনার সামগ্রী নয়, বিশ্বজগতের উদ্দেশেই সে উৎসর্গীকৃত। সুতরাং এমন যে মানুষ, তাহাকে

আত্মস্বার্থ বা ইন্দ্রিয়কামনার দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। প্রেয়সীর মধ্যে কবি সেই অনন্ত পবিত্রতা দেখিয়া ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ মোহের তীব্রতাকে প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন। যে প্রিয়তমাকে তিনি সম্পূর্ণ করিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন, যাহার আত্মার রহস্যশিখা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, আজ তাহা দুর্লভ বলিয়াই জানিলেন। কেবল প্রেমের দ্বারা, সৌন্দর্য উপভোগের দ্বারাই প্রেয়সীকে যতখানি পাওয়া যায়, আজ হইতে তাহাই হইবে কবির সাধনা। সম্পূর্ণ মানবাত্মা কবির দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়াই রহিল। অতৃপ্ত ক্রন্দনের অশ্রু সংবরণ করিয়া কবি স্তিমিত-কোলাহল সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিলেন।

[ ছত্র ৫৯—৭১ ]

## আলোচনা

'নিষ্ফল কামনা' অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী কবিতা এবং এই নৈরাশ্যবাদের অর্থও খুব স্পষ্ট নয়। সংকীর্ণ দেহের বহিরূপকরণের মধ্যে গভীর অতৃপ্তি অনুভবই আপাতদৃষ্টিতেই এই নিষ্ফলতার হেতু। মানসীর আরও কতকগুলি কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে কবিতাটির অর্থের বোধ স্পষ্ট হয়। এই কবিতা রচনার মাত্র পাঁচদিন পরে রবীন্দ্রনাথ আরও দুইটি চতুর্দশপদীতে 'নিষ্ফল কামনা'র জের টানিয়াছেন। 'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতায় কবি বলিয়াছেন, প্রিয়ার তনুদেহে যে উন্মাদ রূপ-সৌন্দর্য, গতির লাবণ্য উচ্ছ্বাস, আঁখির কিরণ-সম্পাত, অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস দেখিয়া বিশ্বভুবন বিস্মিত ব্যাকুল তাহা ছায়ামাত্র, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া করায়ত্ত করা যায় না। তাই রূপসন্ধানের নৈষ্ফল্যে কবির উক্তি—

'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতার সঙ্গে তুলনা

> তবে মোরা কী লাগিয়া করি হাহুতাশ!
> দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
> রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস!

পরবর্তী 'হৃদয়ের ধন' একই দিনে লেখা, একই অভিজ্ঞতার পল্লব হইতে ইহা মঞ্জরিত হইয়াছে। হৃদয়-বিতানে যাহাকে অনুরাগে বন্দী করিয়া রাখা যায়, তাহার সৌন্দর্য মন্থর করিয়া সমগ্র সত্তায় মাখাইতে চান। কিন্তু সে সৌন্দর্য কি প্রিয়দেহ হইতে শিথিলভাবে নিষ্কাশিত করা যায়? নীলিমাকে কি আকাশ হইতে ছাঁকিয়া লওয়া যায়? তাই—

'হৃদয়ের ধনে'ও একই নিষ্ফলতা

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

অবশ্য 'হৃদয়ের ধন'কে দেহে ধরার ব্যর্থতা নিষ্ফল কামনার ঠিক সগোত্র নয়। 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি আরও গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' সুতরাং কবি একটিতে মানবাত্মাকে সমগ্রভাবে পাইবার ব্যর্থতা জানাইয়াছেন, আর পরবর্তী দুইটিতে দেহ হইতে রূপ-সৌন্দর্যকে বিচ্ছিন্নভাবে পাইবার ব্যর্থতা জানাইয়াছেন। সাদৃশ্য কেবল এইখানে যে, সবগুলিতেই কবিচিত্তের একটি ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ত ইহাদের মূল নিহিত কবির প্রেম-ভাবনায়, কবির সহিত কবি-মানসীর প্রেমসম্পর্কেই এই ঔদাস্য ও নিষ্ফলতা। তৃতীয়ত, মানবাত্মাই হোক আর রূপসৌন্দর্যই হোক, আপনার বাসনার তীব্রতাকে কবি সর্বত্রই ভৎ'সিত করিয়াছেন।

উভয়ের পার্থক্য

রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী এই কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"মানসীতে আপনার ব্যক্তিগত আবরণের মধ্যে যখন প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে তাহারই মধ্যে ধরিয়া একান্ত করিয়া দেখিতেছেন, তখনও ভিতরে ভিতরে ঐ এক ক্রন্দন জাগিতেছে যে, প্রেম সব নয়, সমস্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহার যেটুকু স্থান সে তাহা ছাড়াইয়া একান্ত হইয়া উঠিতে চায়।"

অন্যান্য সমালোচকের মন্তব্য

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করিয়াছেন—

"প্রেম অনন্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খণ্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায় না। এই খণ্ডপ্রেম হইতে মুক্তি চাই। বাসনার আবেগ এবং মুক্তির কামনা এই দুয়ের হর্ষে ও ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত। অনন্ত প্রেম চাই, সে প্রেমকে পাইতে হইলে নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার শুধু সৌরভটুকু আহরণ কর, সৌন্দর্যবিকাশটকু পান কর, কিন্তু প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া চাহিও না।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দুই ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। অজিতকুমার বলিয়াছেন নিষ্ফল কামনায় ক্রন্দন হইল এই যে, "প্রেম সব নয়।" আর ডক্টর নীহাররঞ্জনের মত হইল, "খণ্ড প্রেম হইতে মুক্তি চাই"। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতকুমারের অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। এই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী আলোচনা সংকলন না করিয়া কবিতাটির একটি স্বচ্ছ পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। কবির বক্তব্য সংক্ষেপে সূত্রাকারে সাজাইলে আমরা এইগুলি পাই—

ব্যাখ্যাব সামঞ্জস্য

মূল বক্তব্য সংকেত

১। কবি 'দুরন্ত অনল-ভরা বাসনা'র ভারে কাতর ও ক্ষুধাতুর।

২। তিনি প্রেয়সীর অন্তর্নিহিত কোনো অমৃত, তাহার বহিরঙ্গের চঞ্চলতার নিম্নে সংগুপ্ত কোনো আত্মার রহস্য-শিখার প্রত্যাশী, কিন্তু তাহা না পাইবার জন্য ব্যর্থতা বোধ করিতেছেন।

৩। অবশেষে সেই প্রত্যাশা হইতে তিনি নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

৪। তাঁহার মনে হইল, হাসি কথা দৃষ্টি—এই লইয়া যে 'প্রেমের আভাস' পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। 'সমগ্র-মানব'-প্রাপ্তি কবির পক্ষে দুঃসাহস মাত্র।

৫। অনন্ত প্রেম না থাকিলে অনন্ত রহস্য শিখাকে পাওয়া যায় না। অনন্তকাল মহাজাগতিক চক্রাবর্তনের মধ্য দিয়া প্রেমকে বহন করাই অনন্ত প্রেম।

৬। কিন্তু কবির তাহা নাই। কবির আছে কেবল বাসনা। তিনি আপন হৃদয়ভাবে আতুর দুর্বল ও ক্ষুধাতৃষাতুর।

৭। মানব [ অর্থাৎ কবিপ্রেয়সী ] ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নয়। সংসারে কেহ কাহারও সহিত ব্যক্তিগত ভোগের সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়।

৮। নারী যেন একটি শতদল, সযত্নে সংগোপনে তাহা বিশ্বজগৎ ও ঈশ্বরের জন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৯। সুতরাং এই শতদলরূপ নারীকে কেবল দূর হইতে দেখিতে হইবে, তাহার সৌন্দর্য, সৌরভ ও মধু অনুভব করিতে হইবে। ইহাই কবির প্রেম।

১০। মানবাত্মা আকাঙ্ক্ষার ধন নয়, ইহা জানিয়া কবি বাসনাকে প্রদমিত করিলেন।

কবিতার এই মূল বক্তব্য-বস্তুর ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে। কেবল কবিতাটির কয়েকটি অস্পষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। 'আত্মার রহস্য-শিখা বলিতে কবি কী বুঝাইতেছেন? 'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস একী দুঃসাহস' —এই আত্ম-সতর্কতার দ্বারা কবির যথার্থ নিষেধ কী তাহাও স্পষ্ট নয়। দূর হইতে প্রেমিকার সৌরভ, সৌন্দর্য ও মধু উপভোগ করার সান্ত্বনা লইয়া কবি বিদায় লইতেছেন। 'ভালবাসো প্রেমে হও বলী'—এই যদি কবির সিদ্ধান্ত হয়, তবে অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে?

কবিতার কয়েকটি অস্পষ্টতা

আমাদের মনে হয়, কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব ইহার মধ্যমাংশে নিহিত। 'আছে কি অনন্ত প্রেম' এই জিজ্ঞাসা হইতে 'সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে' এই পংক্তি-পর্যন্ত কবি তাঁহার প্রেমের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার মৌল হেতু ও গভীরতর আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সেই ব্যর্থতা হইতে মুক্তির উপায়টুকু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথার্থ প্রেয়সী 'বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে' ফুটিয়া-ওঠা শতদল ঠিকই, কিন্তু তাহাকেও পাইতে হইবে—'চেয়ো না তাহারে' বলিলে প্রেমের কোনো অর্থই রহিল না। প্রিয়ার 'নয়নের নিবিড় তিমির তলে' যে 'আত্মার রহস্য শিখা' তিনি অনুভব করিলেন, সে রহস্য, সে আনন্দ কবির জন্য নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার লক্ষণ ও বক্তব্য হইতেই পারে না। সে রহস্যের ভেদও তিনি করিয়াছেন পরবর্তী কালে, এখানে তাঁহার ভূমিকা মাত্র আছে। তাহা কী? কবিই উত্তর দিতেছেন, 'আছে কি অনন্ত প্রেম'? কড়ি ও কোমলে অসীম অনন্ত প্রভৃতি শব্দের বহু-ব্যবহার থাকিলেও যতদূর মনে হয়, 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাতেই 'অনন্ত প্রেম' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হইল, ইহার প্রায় দুই বৎসর পর কবি 'অনন্ত প্রেম' নামে একটি কবিতাও রচনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'আছে কি অনন্ত প্রেম' মানে তাহা কোনো কালে কাহারও থাকিতে পারে না, মানবাত্মা আকাঙ্ক্ষার ধন নয়, ইহা সত্য নয়। অনন্ত প্রেমের সন্ধান কবি একদিন ঠিকই পাইয়াছেন এবং তখনই প্রেয়সীর আত্মার রহস্যশিখাও তাঁহার গোচর হইয়াছে। 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি এইটুকু বুঝিয়াছেন তাঁহার চিত্ত এখন দুর্বল, ক্ষুধাতৃষাতুর, তাই তাহা অনন্ত প্রেমের উপযোগী নয়।

কবিতাটির প্রকৃত তাৎপর্য

কবি অনন্ত প্রেমের প্রত্যাশী

অনন্ত প্রেমের সংজ্ঞাও এই কবিতাতেই পাওয়া যায়। 'মহাকাশ-ভরা অসীম জগৎ-জনতা' কবির প্রেমকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিকায় স্থাপন করিতে চায়। নিবিড় আলো-অন্ধকার, কোটি ছায়াপথ মায়াপথ এবং দুর্গম উদয়-অস্তাচল বলিতেই একটি কাল-চিহ্নবিহীন সময়হারা অনাদি কালের অবিশ্রান্ত অনুভূতি জাগে। স্থতরাং মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে কবি তাঁহার প্রেমিকাকে চির রাত্রিদিন লইয়া যাইবেন—ইহাই অনন্ত প্রেম। এই অনন্ত প্রেমের স্বরূপ 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় আরও প্রসারিত হইয়াছে। সেখানেও প্রেমকে দেশ-কাল-জন্ম-জন্মান্তরের উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে—

অনন্ত প্রেমের সংজ্ঞা

অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমারই মূরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

কবির দিক হইতে যেমন অনন্ত প্রেম, কবি-প্রেয়সীর দিক্ হইতেও তেমনি প্রেমের স্বীকৃতি চাই। সেই স্বীকৃতি না পাওয়ায় সংশয়ের সৃষ্টি করে, 'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'রই সংস্করণ মাত্র, একদিন পরে লেখা। ওখানেও কবি প্রিয়তমের মুখের উপর 'সর্বগ্রাসী আঁখি' মেলিয়া নিদ্রাহীন তৃপ্তিহীন কণ্ঠে 'যতটুকু হাসি পাই যতটুকু কথা যতটুকু গান' করিতেছেন। কিন্তু ইহা কখনই স্থায়ী শান্তির কারণ হইতেছে না, তাই অভিমান সংশয় জমিয়া ওঠে। ইহারই নামান্তর নিষ্ফল-কামনা। 'নিষ্ফল কামনা'য় কবির অভাব ছিল অনন্ত প্রেমের। এখানে তাঁহার অভাব প্রিয়তমার স্বীকৃতির। একবার তাহা জানিতে পারিলেই তাঁহার হৃদয় শান্ত হইবে, সমগ্র বিশ্বচরাচর শান্ত হইবে। তখনই—

সংশয়ের আবেগ কবিতার সঙ্গে তুলনা

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্পঅর্ঘ্য দান।

দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

প্রেমিকা হৃদয়-দেবতায় পরিণত হইবে, কবি তাহার চরণে পুষ্পার্ঘ্য দান করিবেন, ইহা আপাত-বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা নিহিত আছে 'নিষ্ফল কামনা'তেই। কবির প্রেমিকা তো বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে ফুটিয়া ওঠা শতদল। সুতরাং বাসনা কামনার জৈবিকতা তাহাকে স্পর্শ করে না। সুরদাসের সহিত দেবীর যে সম্পর্ক ছিল, কবির সহিত কবি-প্রেয়সীরও সেই সম্পর্ক। এখন, এই সম্পর্কের পর কবির প্রেমের স্বরূপ কী হইবে? তাহার উত্তর পরবর্তী স্তবকে—

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

ইহাই তো অনন্ত প্রেমের স্বভাব। যতক্ষণ অনন্ত প্রেম না আসিবে, ততক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণা দুর্বলতা হৃদয়াতুরতায় কবি ক্ষতবিক্ষত হইবেন, ততক্ষণই তাঁহার নিষ্ফল কামনা। কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়, 'চেয়ো না তাহারে' এই মন্তব্যের দ্বারা কবিতার সমাপ্তি হইলেও এই উপলব্ধিই মানসী কাব্যে চরম নয়, সূচনা মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্য-সমালোচকগণ 'নিষ্ফল কামনা'কেই রবীন্দ্র-জীবনের একটি পরম বাণী ও সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। দৈহিক কামনা তো রবীন্দ্রনাথের কাছে নিষ্ফলই, মহৎ কবি মাত্রের কাছেই তাই। কিন্তু সেই নৈতিক তত্ত্বই কি নিষ্ফল কামনার বিষয়বস্তু? আশা করি তাহা যে নয়, সে বোধ স্পষ্ট হইবে।

ছন্দের দিক দিয়া 'নিষ্ফল কামনা' নিষ্ফল হয় নাই। এই ছন্দের

বিস্ময়কর পংক্তি-সমাবেশ, অর্থাৎ ছোট পর্ব ও বড় পর্বের অবিন্যস্ত সজ্জা, মিল-হীনতা বাঙলা কাব্যে অভিনব ছিল। এমন কি রবীন্দ্রনাথও দীর্ঘকাল ইহার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এই প্রবহমাণ পয়ারই বলাকাতে আসিয়া সমিল তানপ্রধান প্রবহমাণ ছন্দে পরিণত হইয়াছে এবং পরিশেষ কাব্যে আসিয়া ইহাই আবার মিলহীন প্রবহমাণ ছন্দ হইয়াছে [ যেমন, বিখ্যাত 'বাঁশি' কবিতাটি—'কিনু গোয়ালার গলি' ]। ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যায়টিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ছন্দ

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

**বৃথা এ ক্রন্দন**—কবিতার প্রথম ছত্রেই একটি আতুর দীর্ঘশ্বাসের অভ্রান্ত ধ্বনি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কবি কোনো নৈরাশ্যভারে অবসন্ন, ক্রন্দমান, অথচ তাঁহার বিলাপের পরিণামে আছে একটি অপ্রাপ্তিজনিত ব্যর্থতা। সেই ক্রন্দনের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে পরবর্তী ছত্রে। **বৃথা এ অনল ভরা তুরন্ত বাসনা**—ইন্দ্রিয়জ মোহই হইল বাসনা, রূপতৃষ্ণা দেহক্ষুধা মানুষকে দগ্ধ করে। তাই তাহা অনলের সঙ্গে উপমিত হইয়া থাকে। এই একটিমাত্র বাক্যাংশের দ্বারাই কবিতার বক্তব্য-বিষয়ের আভাস দেওয়া হইল। কবিতাটি প্রেমের, কিন্তু প্রেমের স্বরূপ কবির কাছে অগোচর। তিনি কেবল তীব্র দৈহিক ক্ষুধার অগ্নিদাহে জ্বলিতেছেন, পার্থিব এবং জৈবিক বাসনার ব্যর্থতা অনুভব করিয়া আপনার মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছেন। তীব্র ভোগের চরিতার্থতার জন্য কবির ক্রন্দন যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইবে, ভোগের দ্বারা মানুষকে করায়ত্ত করা যে অসম্ভব, এই চিন্তাও যেন তাঁহার চিত্তে সংক্রামিত হইয়াছে।

**রবি অস্ত যায়**—কবিতাটির পশ্চাতে আছে দিবসের বিদায়মুহূর্ত। আলোকরশ্মি অন্ধকারে সংবৃত হইতেছে, ধীরে ধীরে রাত্রির তমসা পরিকীর্ণ হইতেছে। এই সন্ধ্যার রূপায়ণ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ভোগক্ষুধা, অগ্নিবৎ বাসনার লেলিহান দাহ কবিকে প্রজ্বলিত করিতেছে, তাহা যে ব্যর্থ কবি অনুভব করিতেছেন। দিবসের তপ্তসূর্য সেই 'অনলভরা তুরন্ত বাসনা'র প্রতীক। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার, সূর্যের অস্তগমন সেই বাসনার নিবৃত্তির প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে।

**অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো**—আপাতদৃষ্টিতে ইহা

সন্ধ্যারই বর্ণনা। পৃথিবীর বুকে আঁধার ঘনায়িত, কেবল উর্ধ্বাকাশে তখনও পলাতক সূর্যাভা বিতত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গভীর অর্থে অরণ্য মানব মনের দুষ্প্রবেশ্য গহন জটিলতার প্রতীক। তাহা ক্ষোভে নৈরাশ্য-বিষাদে তমসাবৃত, কিন্তু উর্ধ্বাকাশে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি দেখা যাইতেছে। **সন্ধ্যা নত-আঁখি···দিবার পশ্চাতে**—দিবস উজ্জ্বল পুরুষ, সন্ধ্যা লজ্জিতা নারী। তাই স্বামী-স্ত্রীর রূপক। দিবসের পশ্চাতে সন্ধ্যার আগমন যেন লজ্জাতুরা নত-নয়না নারীর সংকুচিত আগমন। **বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস**—সান্ধ্যসমীর মৃদুম্লান, যেন কবির অন্তরের বেদনা বৈরাগ্য তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। **দুটি হাতে হাত···আঁখি মাঝে**—কবির দৃষ্টি ভোগ বাসনায় তীব্র, সম্ভোগ ক্ষুধায় ব্যাকুল, তাই আপন ক্ষুধার্ত নয়ন আগ্রাসী করিয়া তিনি প্রেয়সীর দৃষ্টিকে যেন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রহণ করিতে চান। তাঁহার হাত দুইটি প্রিয়তমের করপল্লব ধারণ করিয়া আছে। **যে অমৃত···কোথায়**—নারীর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে একটি অক্ষয় পদার্থ আছে, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা স্বর্গীয়, যাহা অমৃততুল্য। কবি দেহের প্রতি উন্মুখ হইয়া সেই অন্তর্নিহিত পরম সুধাটুকুর জন্য ব্যগ্র। **স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম**—দূর নক্ষত্রলোক হইতে তারকার যে জ্যোতিটুকু আসিতেছে তাহাকে ঘিরিয়া মানবজগতের কতই না কৌতূহল। অনন্ত বিশ্বলোকের রহস্য মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। **আত্মার রহস্য শিখা**—মানবদেহ জড়পদার্থ মাত্র, তাহার প্রাণশক্তি, চিৎশক্তি, মনন এইগুলি তাহার আত্মিক সম্পদ। ইহা অপরের কাছে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত নয় বলিয়াই রহস্যময়। কবি তাহাকে শিখার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

**ব্যাখ্যা—অন্ধকার সন্ধ্যার······আত্মার রহস্য-শিখা**—দিবসের আলোক স্তিমিত হইয়া আসিলে কবি তাহার প্রিয়তমার করতল ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। কবির দেহমন এক দুর্নিবার উগ্র কামনায় কম্পিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রেয়সীকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তিনি অশান্ত। কিন্তু কেমন করিয়া সেই সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটিবে, ইহা তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। তাঁহার ক্ষুধার্ত চোখ আতুর হইয়া প্রেয়সীকে যেন গ্রাস করিতে চায়। তাঁহার মনে হইতেছে, দেহরূপটিই মানুষের সব নয়—দেহের গভীরে একটি আত্মার অমৃতময় রূপ আছে। তাহাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ যেন করায়ত্ত হয় না। ইহা স্বর্গীয় এক জ্যোতির মত

নয়নের প্রান্ত দিয়া যেন কম্পিত শিখায় আভাস দিয়া যায়, তথাপি তাহা নক্ষত্র লোকের মত দূরবর্তী অসীম শূন্যের সম্পদ। সন্ধ্যার আকাশে একটি তারা পশ্চিম গগনে জলজল করিতেছিল। ঐদিকে তাকাইয়া কবির মনে হইল, ঐ একক তারাটির মধ্যে যেমন মানব-জগতের দুর্নিরীক্ষ্য ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জ্যোতির শিখার মত কম্পিত হইতেছে, তেমনি প্রিয়তমের আঁখিপ্রান্তে গভীর দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, তাহার দেহরূপের তলদেশ হইতে একটি আত্মার স্পন্দন অনুরূপ জ্যোতির্ময় হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা স্থির নয়, কম্পিত, রহস্যময় এবং দূরবত বলিয়া মনে হয়। সুদূর শূন্যলোকের তারার সহিত নয়ন-প্রদীপে উদ্‌ভাসিত আত্মার রহস্য-শিখার তুলনা তাহার দুর্জ্ঞেয়তা ও অপ্রাপ্তির বেদনাই যেন সূচিত করিতেছে।

**ব্যাখ্যা—প্রাণ মন……আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে**—একবার নারীর দেহ-রূপ হইতে যে আত্মার রহস্য অনুভূত হইয়াছে, কবি তাহা পাইবার জন্য ব্যগ্রকাম। দেহকে তিল তিল করিয়া পাইলেও আত্মাকে পাওয়া যায় না, এ উপলব্ধি তাঁহার হইয়াছে। এখন তাই আত্মাটিকে চাই, তবেই প্রেয়সীকে সমগ্রভাবে অখণ্ডিতভাবে পাওয়া হইবে। কিন্তু সে পাওয়ার উপায় জানা নাই, অথচ প্রাপ্তির বাসনা তীব্রতর হইতেছে। কেবল দেহকামনা হইলে দেহ দিয়াই কবি চাহিতেন। কিন্তু প্রেমিকের দেহ ও আত্মাকে যুগপৎ পাইতে হইলে দেহমন দিয়াই চাহিতে হইবে। কবি যেন তাঁহার প্রচণ্ড কামনায় তলদেশহীন সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন।

**ব্যাখ্যা—তোমার আঁখির……তাই এ ক্রন্দন**—নারীদেহের রূপ যৌবনই সর্বস্ব নয়, জীবনের সমগ্রতা আত্মার পবিত্রতায় নির্ভর করে। দেহের প্রদীপ হইতে জলিয়া উঠে সেই আত্মার রহস্য-শিখা। যথার্থ প্রেমিকের কাছে জৈব বাসনাকে অতিক্রম করিয়া এই আত্মিক সৌন্দর্য ও গভীরতার আবেদন গিয়া পৌছায়। কবির প্রেম সেই গভীরতার সীমায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি দেহোপভোগে ক্লান্ত, কিন্তু তাহার দ্বারা রমণীকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। প্রেয়সীর আত্মার রহস্য-শিখা তাঁহার উপলব্ধিতে কম্পিত হইয়াছে, সেই আত্মাভূত সম্পদটুকু লাভ করিবার জন্য তাঁহার দেহমন ব্যগ্র উৎসুক। কিন্তু তাহা প্রাপ্তির উপায় জানেন না। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিকের আত্মার অমৃত সম্পদ তাঁহার আয়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ প্রেম সম্পূর্ণ

নয়, প্রাপ্তি খণ্ডিত, ইহাও তিনি জানেন। তাঁহার মনে হইতেছে, সেই আত্মার রহস্য বোধ হয় নারীর গভীর দৃষ্টি-সম্পাতে নিহিত। কখনও প্রিয়তমার স্মিতহাস্যের অন্তরালে, কখনও বাক্যের মাধুরী-বর্ষণে, কখনও প্রিয়ার সৌম্যসহাস শান্তশ্রী মুখের লাবণ্যে তিনি নারীর জীবন-সমগ্রতাকে বৃথাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি দেহের খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যে কাঙালের মত নারীর সকল খণ্ডরূপের অখণ্ড সত্তাটিকে ব্যগ্র হইয়া অন্বেষণ করিতেছেন এবং সেই ব্যর্থতায় বিলাপ করিতেছেন।

**এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়**—প্রেয়সীর দেহ-সৌন্দর্য বা যৌবন-সম্পদের গভীরে যে অমৃত-আত্মা নিহিত, কবি শেষ পর্যন্ত সেই পরম সম্পদ খুঁজিয়া পান নাই। তাই ব্যর্থতায় ও নৈরাশ্যে আপনাকে সেই প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। **যাহা পাস······প্রেমের আভাস**—প্রেমের যে সকল বহিরঙ্গ উপচার, প্রেয়সীর হাসি বা স্নিগ্ধ কথা, নয়নের গভীর প্রেমঘন দৃষ্টি, এইগুলি লইয়াই তাঁহাকে আপাতত খুশি থাকিতে হইবে। প্রেমের গভীরতম রহস্য, প্রেমিকের প্রেমসত্তার অন্তর্লীন মাধুরী ইহাদের মধ্যে পূর্ণভাবে নাই। কিন্তু অংশ লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। পূর্ণ তাঁহার অপ্রাপণীয়। **সমগ্র মানব তুই পেতে চাস**—এ তিরস্কার আত্মসত্তাকেই—আপন ব্যর্থতায় কবি আপনাকেই সচেতন করিতেছেন। মানুষ স্বভাবতই দুর্বল ক্ষুধাতুর দেহসতর্ক—সম্ভবত এই কারণেই সমগ্রতার বোধ তাহার ঘটিয়া উঠে না। **আছে কি অনন্ত প্রেম**—সমগ্র মানবকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের দরকার। সমগ্র মানব এখানে কবি-প্রেয়সী অর্থেই প্রযুক্ত। সুতরাং প্রিয়ার আত্মার রহস্য-শিখা লাভ করিতে হইলে কবির পক্ষে প্রয়োজন অনন্ত প্রেমের। আপনার প্রেম যদি খণ্ড সান্ত সীমাবদ্ধ হয়, তবে প্রেমিকার প্রেমের গভীর অমৃতসত্তাটিকে তিনি কিরূপে জানিবেন? **পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব**—দৈহিক ক্ষুধা ঐহিক দৈন্য মিটানো যায়, কিন্তু এমন অভাব আছে যাহা বস্তুর দ্বারা মিটানো যায় না। যেমন মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন অভাব বা চিরবিরহ। এই বিরহ দূর করিতে গেলেই অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন। কবির প্রেম যদি অনন্ত হয়, তবে এ অনন্ত অভাবকে তাহার দ্বারাই মিটানো যাইবে।

**ব্যাখ্যা—মহাকাশভরা······একা অসহায়**—কবি ও তাহার প্রেয়সী আজ বাস্তব সংসারে ধূলিমলিন গৃহে আছেন। কিন্তু ইহা কত নশ্বর

সামান্য থাকা। প্রেম এই তুচ্ছ পরিবেশে একান্ত হইয়া থাকিতে পারে না, প্রেম সমগ্র বিশ্বে আপনাকে প্রতিফলিত করিতে চায়। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাহার শূন্যলোকের শত কোটি গ্রহ নক্ষত্রের অকল্পনীয় সমাবেশ, পুঞ্জীভূত সূর্য-ঘন ছায়াপথ মায়াপথ, অসীম শূন্যে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সেই এক চক্রাবর্তন—ইহাদের তুলনায় এই মানব-জীবন কী তুচ্ছ, কী সামান্য, কী অকিঞ্চিৎকর! কিন্তু প্রেমকে যদি এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের গতির সহিত যুক্ত করিয়া দেখা যায়, কবি যদি তাঁহার প্রেয়সীকে এই অনন্ত বিশ্ব জীবনের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তবেই তাঁহার প্রেম হইবে অনন্ত প্রেম। এ অনন্ত প্রেম একটি abstract শব্দ, ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো যায় না। অনন্ত প্রেম কবিতায় ইহা খানিকটা বুঝানো হইয়াছে। চিরসহচরকে চিররাত্রি দিন মহাকাশ-ভরা জগৎ-জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইলে কী হয়, তাহার আভাস বোধ হয় বলাকার 'ছবি' কবিতায় আছে—

তোমার চিকন<br>
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত<br>
তবে<br>
একদিন কবে<br>
চঞ্চল পবনে লীলায়িত<br>
মর্মর মুখর ছায়া মাধবীবনের<br>
হত স্বপনের।......<br>
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,<br>
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।<br>
আজি তাই<br>
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।<br>
আমার নিখিল<br>
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

ব্যাখ্যা—যে-জন আপনি......চিরদিন তবে—প্রেমিক হিসাবে ইহা কবিরই আত্ম-সমালোচনা। তাঁহার অনন্ত প্রেম নাই, তিনি এখনো বাসনার দুর্বহ অগ্নিতাপে জ্বলিতেছেন। পার্থিব মানুষের মত ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহাকে ভীত কাতর ও দুর্বল করিয়া তুলিতেছে। এইজন্য প্রেমের চিরন্তনত্ব তাঁহার

চোখে ধরা পড়িতেছে না। আপন হৃদয়-বেদনা (এ হৃদয়-বেদনা কি মৃত্যুশোকের?) হইতে মুক্তি না পাইলে প্রেমকে যে অনন্ত করিয়া পাওয়া যায় না, প্রেমিকাকে চিরকালের অনন্ত প্রেমিকারূপে পাওয়া যায় না, ইহাই আলোচ্য পংক্তিগুচ্ছের মর্মকথা। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চেতনার বৈশিষ্ট্য নিহিত। আপনাকে তিনি অনন্ত প্রেমের উপযোগী করিতে চান। ক্ষুদ্র শোক দুঃখতাপ দূর করিয়া নিজেকে অনন্তের অভিলাষী করিতে ইচ্ছা করেন। তবেই তাঁহার প্রেম হইবে মৃত্যুঞ্জয়।

**ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব**—প্রেম একটি স্বর্গীয় বিকাশ, একটি দিব্য আবির্ভাব। দৈহিক মিলনের দ্বারা প্রেম পাওয়া যায় না। মানবাত্মার অমৃতই প্রেম, তাই মানুষকে জৈবিক বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন না। **অতি সযতনে···উঠিতেছে ফুটি**—নারী, কেবল নারী কেন, সমগ্র মানব জীবনই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ভগবান তাঁহার এই সৃষ্টিকে অতি সন্তর্পণে দুঃখ-সুখের মধ্য দিয়া, জীবনমৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যে-যৌবনে পদ্মের মত ফুটাইয়া তুলিতেছেন। তাই মানব-জীবন দেবতার উদ্দেশেই নিবেদিত অর্ঘ্য, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের নয়, তাহা সমগ্র বিশ্বের। **সুতীক্ষ্ণ বাসনা······ছিঁড়ে নিতে**—যাহা বিশ্বজীবনের জন্য উৎসর্গিত, যাহা দৈবসৃষ্টি, তাহাকে ব্যক্তিগত কামনা বাসনার দ্বারা করায়ত্ত করা যায় না। [কবি যেন এখানে আপনার বিচ্ছেদ-কাতরতারই সান্ত্বনা সৃষ্টি করিতেছেন। যে জীবন মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে, যাহা চিরকাল আমার বলিয়া আর দাবী করা যাইবে না, তাহাই শোকের সামগ্রী। কিন্তু শোককেই তীব্র করিয়া চরম করিয়া রাখা জীবনের ধর্ম নয়। জীবন অনন্ত, তাহা বিশ্বগত—তাহা ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্য নয়, এই বিশ্বাসের দ্বারা বিরহিত জীবনকে কবি আধ্যাত্মিকভাবে পাইতেছেন।]

**ব্যাখ্যা—লও তার······তাহারে**—প্রেমিকা আমার একান্ত সম্ভোগের পাত্রী নয়, সে বিশ্বদেবতার জন্য সৃষ্ট পূজার্ঘ্য, ইহা মনে করিলে দেহকামনার তীব্রতা কমিয়া যাইবে। কবি তাই প্রেমিকাকে সর্বশক্তি লইয়া আগ্রাসী ক্ষুধার দ্বারা একান্ত আপনার করায়ত্ত করিতে চাহিতেছেন না। কারণ এই প্রকারে সমগ্র মানবকে কখনই লাভ করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত আপন-হৃদয় দুর্বলতা ও বাসনা বিসর্জন দিয়া কবি অনন্ত প্রেমের উপযোগী না হইয়া উঠিবেন, ততদিন প্রেমিকার বহিঃসৌন্দর্য ও লাবণ্য লইয়াই

তাঁহাকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। তাহার যৌবনের সুরভি ও সৌন্দর্য, প্রেমের মধুস্বাদ মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে দূর হইতে। সম্পূর্ণ করিয়া তাহার আত্মাকে তিনি লাভ করিবেন না। আপনার প্রেমে ভালোবাসায় আপনাকে তিনি প্রস্তুত করিবেন, নিষ্কাম করিবেন—কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রমণীকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন না।

**ব্যাখ্যা—আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের**—কবিতার সূত্রপাত হইয়াছিল এই ক্রন্দনের দ্বারা—

খুঁজিতেছি কোথা তুমি
কোথা তুমি !
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।

এই অমৃত মানব-মাত্রেরই জীবন-সম্পদ, তাহার আত্মার রহস্য-শিখা। আমরা যখনই প্রিয়জনের সহিত মিলিত হই তখনই গভীর মিলনের মুহূর্তে এই আত্মার সন্ধান পাই। কিন্তু মানবাত্মার অমৃতকে লোভীর মত করায়ত্ত করা যায় না, তাহা ক্ষুধাতীব্র বাসনার সামগ্রী নয়। তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র মানবসত্তা কখনই অপর মানবের কাছে বন্দী হইতে পারে না। ইহাই কবিতার শেষে আসিয়া কবির বিশ্বাস হইয়াছে।

**ব্যাখ্যা—নিবাও বাসনা বহ্নি……ফিরে যাই**—দিবসের সদ্য-অপগত মুহূর্তে কবি তাঁহার একান্ত প্রিয়জনকে ব্যগ্র করিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহার দেহরূপ-সৌন্দর্যের অন্তঃস্থিত আত্মার কম্পিত রহস্য-শিখাটির প্রতি লুব্ধকাম বাহু প্রসারিত করিয়াছিলেন। তীব্র ভোগক্ষুধার মধ্যে তাঁহার কখনই তৃপ্তি ঘটে নাই, তাহাতে কী যেন একটা অতৃপ্ত খণ্ডতার বেদনা ছিল। অথচ বাসনার দীপ্ত দাহ তাঁহাকে অবিরাম দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মসমালোচনার দ্বারা তিনি অনুভব করিলেন, হৃদয়ভার-জর্জর ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর দুর্বল মানুষ ঈশ্বর-সৃষ্ট পবিত্র মানব-জীবনকে সমগ্র করিয়া পাইতে পারে না। এই বিশ্বাস লইয়া এখন তিনি ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা শান্ত হইয়া আসিল, কোলাহল স্তিমিত হইল। কবিও যে আপন অন্তরে ক্ষোভ-উত্তেজনা, বাসনার তীব্রতাকে প্রশমিত করিয়াছেন—শান্ত সন্ধ্যা তাহারই প্রতীক। তাঁহার ব্যর্থ বাসনার ক্রন্দন এখন প্রশান্তির মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে।

## অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

### (১) বিশ্বজগতের তরে····· চাও ছিঁড়ে নিতে ?

আলোচ্য পংক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যান্তর্গত 'নিষ্ফল কামনা' হইতে গৃহীত। মামসী কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্তর্নিহিত অনেকগুলি কবিতার বিষাদ ও বৈরাগ্যের কথা ( despair ও resignation ) স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, দেহভোগের ক্লান্তি ও গভীরতর কোনো প্রাপ্তির ব্যর্থতার জন্য যে নৈরাশ্য সূচিত হয়, তাহাই 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য পংক্তিদ্বয়ে কবি প্রেমিকার দেহ স্বরূপকে দেবসৃষ্ট, এবং মর্ত্য মানুষের ভোগ্য নয় বলিয়া আপন নৈরাশ্যের সান্ত্বনা রচনা করিয়াছেন।

প্রেমিকের আত্মার রহস্য অন্বেষণ করিতে করিতে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন যে সমগ্র মানবের সত্তা কখনই মানবের করায়ত্ত হয় না। মানুষ দেহমন লইয়া ভালোবাসে, কিন্তু এই দেহমন সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দান করিলেও অপরের কাছে পরিপূর্ণ প্রাপ্তি কখনই ঘটিবে না। তীব্র কামনা দিয়া মানব জীবনকে কোনোমতেই আত্মসাৎ করা যায় না। ভোগস্পৃহা প্রেমকে কলঙ্কিত করে। কারণ মানব ক্ষুধা-নিবৃত্তির সামগ্রী মাত্র নয়। করুণাময় ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন নিপুণ করিয়া—মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই একটি সম্পূর্ণতার দিকে যাত্রা করিতেছে। তাহার সকল ক্রিয়াকর্ম বিধি-নির্দিষ্ট।. তাহার সকল লীলাই দেবতার নামে উৎসৃষ্ট। আপন মানব জীবনকে যত্নে সাজাইয়া মানুষ দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিতেছে। তাহার শোকতাপ, দুঃখবেদনা, সুখসম্পদ, বিপদদৈন্য সবই তাহাকে শুদ্ধ করিতেছে, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহার এই পূর্ণতার সাধনা। ঋতু পরিক্রমায় যেমন পদ্মফুলটি নানা বর্ণে গন্ধে ফুটিয়া উঠে, তেমনি ভাবে মানব-জীবনও বিবর্তনের পথ দিয়া ঈশ্বরের পুষ্পার্ঘ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সুতরাং মানুষ কাহারও ব্যক্তিগত ভোগের সম্পত্তি নয়, সে বিশ্বজনীন। প্রিয়ার মধ্যেও আছে সেই ঈশ্বরিক সম্পদ, সেই বিশ্বমানবতার অংশ। সুতরাং কবি সেই প্রিয়াকে কেবল আপন কলুষভোগের ছুরিকার দ্বারা বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন বাসনার সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারেন না।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় কবি কামনাকে নিষ্ফল বলিয়াছেন কেন? ইহাকে কি রবীন্দ্র-প্রেমভাবনায় প্রতিনিধিমূলক রচনা বলা যায়?**

**উত্তর।** মানসীর অনেকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেহোপভুক্ত জীবনের গ্লানি অনুভব করিয়া একটি নির্বস্তুক ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যসত্তার জন্য রোমান্টিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যধারায় মানসী তাই একটি সীমায় দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল কাব্যে ছিল প্রণয়-বিলাস ও যৌবনের সংরাগ। মানসীতে আসিয়া দেখা গেল দেহের প্রতি বীতমোহ বৈরাগ্য ও দেহকামনার নিষ্ফলতার ঘোষণা। দেহের সীমা হইতে ধীরে ধীরে কবি অসীমের দিকে চলিতেছেন, মানসীতে তাহারই সূত্রপাত। আর 'নিষ্ফল কামনা' তাহারই প্রথম যন্ত্রণাকাতর স্বীকৃতি।

কবিতাটির মর্মকথা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক! প্রেয়সী নারীকে সমগ্র দেহমন দিয়া আত্মসাৎ করিবার দুর্নিবার অনলসম দুরন্ত বাসনায় কবি ক্ষত-বিক্ষত হইতেছেন। নারীর রূপ-সৌন্দর্য প্রেম-প্রকাশ হাসি-বাক্যের অন্তরাল হইতে একটি অমৃততুল্য জ্যোতির্ময় সত্তার আভাস পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কবি তাহা স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। ইহাই তাঁহার নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার হেতু। তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপ সমুদ্রের তলদেশে কবি ডুবিয়া যাইতেছেন, কিন্তু প্রেয়সীকে অখণ্ড করিয়া না পাইবার বেদনা ব্যথাইয়া উঠিতেছে।

তবে কি নারীকে সমগ্র করিয়া পাওয়া যাইবে না? আত্মার রহস্যশিখা কবির অগোচরই থাকিয়া যাইবে? কেবল প্রিয়ার দৃষ্টি হাসি কথা লইয়াই কবিকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? হয়ত তাহাই সত্য। সমগ্র মানবকে পাইতে গেলে কবিকে অনন্ত প্রেমের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। একটি মানুষ রূপ-রূপান্তর জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কক্ষপথে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ জীবন লইয়া সেই অনন্ত পথ পরিক্রমাকে অধিগত করা যায় না। কবি যে স্বয়ং হৃদয়-বেদনায় অবসন্ন আতুর, নশ্বর জীবনের ক্ষুধাতৃষ্ণায় ভীত ও দুর্বল, আপন বাসনার দুর্বহ জ্বালায় ক্রন্দমান। সুতরাং অনন্ত কাল হইতে ছিন্ন করিয়া মানব-প্রণয়ীকে তিনি কিরূপে আপন বাসনার সামগ্রী করিবেন?

বস্তুতঃ মানবজীবন অতি পবিত্র, দেবস্পৃষ্ট, বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আধার। তাহা জন্মান্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়া সুখেদুঃখে পূর্ণতার পথে চলিতেছে। মানুষের মধ্যে আছে বিশ্বজনীনতা, ব্যক্তিস্বার্থের দাবীতে তাহাকে অপমানিত করা হয়। মানব-জীবন একটি পরিপূর্ণ শতদলের মত ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত হইবার জন্য ফুটিয়া উঠিতেছে। কামনার বিষবাষ্পে তাহা যে শুষ্ক হইয়া যাইবে। অনন্ত জগৎ-পথ পরিক্রমায় দুইটি গ্রহ ক্ষণকালের জন্য সন্নিহিত হয় মাত্র। সেই সান্নিধ্যেই জীবন রোমাঞ্চিত হয়, সেখানে বসন্তের বাতাস বহে, প্রেমের ফুল ফোটে। তাই প্রেয়সীর নয়নের মধুর কিরণ-সম্পাত, বচনের সুধাসংগীত, প্রেমের রুচিৎ লাবণ্য এই লইয়াই কবি-প্রেমিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তদপেক্ষা বেশি দাবী করিবার অধিকার তাঁহার নাই। ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রেমিক একান্ত আপনার সম্ভোগের জন্য প্রেমিকাকে আপন বক্ষোলগ্ন করিতে পারে না। ফুলের শতদল ছিন্ন করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। তাহার সৌন্দর্যবিকাশ লাবণ্যসুধা মাত্র অনুভব করা যায়। সুতরাং—

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী।
চেয়ো না তাহারে!
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

এইজন্যই কবি তাঁহার কামনাকে নিষ্ফল বলিয়াছেন। যে কামনা রমণীকে আপন সম্পদ করিতে চায়, তাহার বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা না করিয়া বাসনার দ্বারা কলুষিত করে, দেহকে ভোগপণ্য মনে করে, সে কামনার পরিণাম নিষ্ফল ক্রন্দন মাত্র। আপন প্রেমের অভিজ্ঞতায় কবি এই সত্য লাভ করিয়াছেন।

কোনো কোনো সমালোচক 'নিষ্ফল কামনা'কে রবীন্দ্র-প্রেমভাবনার প্রতিনিধিমূলক কবিতা বলিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা আংশিক সত্য। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় কবি প্রিয়ার দেহরূপের নিম্নে যে 'আত্মার রহস্যশিখার' সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা অপ্রাপণীয় বলিয়াছেন। বাহ্যিক দেহকামনার নিষ্ফলতা রবীন্দ্রকাব্যে নূতন নয়—পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল কাব্যেই তাহার সূচনা হইয়াছিল এবং মানসীর অন্যান্য কবিতাতেই তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু কবিতায় নাম 'নিষ্ফল কামনা' হইলেও ইহাই তো একমাত্র বক্তব্য নয়। 'আত্মার রহস্যশিখা' কি কোনোকালেই পাওয়া যায়

না? যে দুর্বল হৃদয়ভাবের জন্য কবি প্রিয়াকে অনন্ত প্রেম দিতে পারেন নাই, তাহা কি কোনো কালেই পারিবেন না? মানসী কাব্যেই আমরা পরবর্তী কালে 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটি পাইয়াছি। প্রেমিক যে জন্মজন্মান্তর-রূপান্তরের মধ্য দিয়া অনন্ত বিশ্বে আপন কক্ষপথ পরিক্রমা করিতেছে, ইহা রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে বলিয়াছেন। কিন্তু কবির প্রেম কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই? পরবর্তী কালের কবিতায় কবি এই আতুর হৃদয়-বেদনা বিসর্জন দিয়া আপনাকে অনন্ত প্রেমের উপযোগী করিয়াই তুলিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'নিষ্ফল কামনা'কে ঠিক রবীন্দ্রপ্রেম-ভাবনার প্রতিনিধিমূলক রচনা বলা যায় না।

---

# একাল ও সেকাল

## ভূমিকা

'একাল ও সেকাল' কবিতাটি গাজিপুর বাসকালে রচিত। প্রকৃতির পটে মানবজীবনের দুঃখসুখ-অনুভব মানসীর অনেকগুলি কবিতার বিষয় বস্তু—এইদিক দিয়া প্রথম নাম 'একাল ও সেকাল' কবিতার। কবিতাটির বিষয় বর্ষা ও বর্ষাস্মৃতি। কিন্তু রচনাকাল ২১শে বৈশাখ ১২৯৫। সম্ভবত গ্রীষ্মের দাবদাহের পর সেইদিন অপরাহ্নবেলায় কালবৈশাখীর মেঘপুঞ্জ সমগ্র আকাশে একটি অকালবর্ষার সমারোহ সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং সেই বর্ষণমুখর সান্ধ্য দিবসটি কবিকে কালচিহ্নহীন নির্জনে নিক্ষেপ করিয়াছে, বর্তমানের ভেদলুপ্ত নিত্যকালের একটি বিষাদমন্থর মেঘমেদুর অম্বরতলে স্থাপন করিয়াছে। তখন বৈশাখ-আষাঢ় মাসের পার্থক্য তীব্র হইয়া উঠে নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সোনার তরী কাব্যের বহুখ্যাত কবিতা 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' ফাল্গুন মাসে রচিত হইয়াছিল!

রচনাকাল

বর্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির একটি স্নায়বিক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। ছিন্নপত্রে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন—

"মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ এক একটি করে দিন আসছে—কোনোটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শতশত সুখদুঃখবিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবসঃ।"

কবিজীবনে বর্ষা

ইহা নিছক কথার কথা নয়, রবীন্দ্রকাব্যপাঠক মাত্রই দেখিবেন বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোনো ঋতুতেই অবহেলা করেন নাই। বর্ষার নবীন মেঘ যখনই ধরণীর পূর্বদ্বারে আবির্ভূত হইয়াছে, কবি তখনই তাহাকে সাগ্রহে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন, কাজরি গাথায় তাহাকে প্রত্যুদ্গমন জানাইয়াছেন। বর্ষার সহিত তিনি একটি জন্মান্তরীণ সম্পর্ক অনুভব করিয়াছেন। এই স্মৃতি কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, ইহার সহিত কবির একটি অবোধ মানসযোগ আছে যাহা ঠিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্ষার মধ্য দিয়া কবি ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের কবিবৃন্দের সঙ্গে অন্তর্গূঢ় এক সংযোগ অনুভব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত নববর্ষা প্রবন্ধের এই অনুচ্ছেদটি স্মর্তব্য—

নববর্ষা

"আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে, সমস্ত বিধি-বিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়; পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি-আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান, অলকাপুরীর মাঝখানে এক সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে—নদীকলধ্বনিত সানুমৎপর্বতবন্ধুর জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার নববারিসিঞ্চিতযূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।"

এই কারণে বর্ষা কেবল আকাশ-মেঘের ঋতু নয়, তাহা কবির কাছে স্মৃতির ঋতু। বর্ষা সাহিত্য, বিশেষত কালিদাসের মেঘদূত এবং বৈষ্ণব কবিদের অভিসার বা বিরহের পটভূমিকায় বর্ষার ভূমিকাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কথা ভাবিতে পারেন নাই। আষাঢ় যখনই কবির কাছে আসিয়াছে, সে আসিয়াছে 'বহুযুগের ওপার হতে', তাই বৃষ্টির ধারাপতন ধ্বনির মধ্যে কবি শুনিয়াছেন পূর্বকালের কবিদের বর্ষণসংগীত, 'কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে', 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার ভাষায়—

স্মৃতিবেদনা

শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত-গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

হেরিয়া শ্যামলঘন নীল গগনে,
কাহার কাজল আঁখি পড়িল মনে।

'একাল ও সেকাল' কবিতায় প্রধানত বৈষ্ণব কাব্যের বর্ষাই বর্তমানের পটে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। মধ্যাহ্নে সহসা সূর্য মেঘাবৃত হইল, সমস্ত আকাশে ঘনাইয়া উঠিল অনাদিকালের বিরহ বেদনা, চেনা পৃথিবীর উপর অচেনার ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কবিমন মেঘের পথচিহ্ন ধরিয়া বর্ষার অনুষঙ্গ বাহিয়া চলিয়া গেল বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের জগতে। একালের কবির দৃষ্টি হইতে কালের যবনিকা অপসারিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরহিণী অভিসারিকা ব্রজবধূর পাশে উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরের বীণাবাদিনী যক্ষবধূও পল্লবাশ্রুসিক্তি মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এসব চিত্রের একটি মাত্র ব্যঞ্জনা, একটি মাত্র ধ্বনি, 'কৈসে গোঙায়ব হরিবিনু দিনরাতিয়া'। এ বৃষ্টিব্যাকুল দিনেই মানুষের বিরহ যেন অন্তহীন হইয়া উঠে। আর এ বিরহ এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ—বাস্তব জগতে যাহার কোন ব্যাখ্যা নাই। যাহার সহিত মিলনের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই, সেও যেন এমন প্রাবৃট অন্ধকারে মিলনের সমুদ্রতীরে বাস করে। তাই সহস্রবাধা-উল্লঙ্ঘনকারিণী প্রতিজ্ঞাপরায়ণা রাধার কানে কবি সকৌতুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—সবই তো বুঝিলাম, সব পরিশ্রমই সার্থক, সব সাধনাই আয়ত্ত, অভিসারে তোমাপেক্ষা পটীয়সী কেহ নাই, তথাপি

বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা

সুন্দরী কৈসে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥

প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত প্রবন্ধে ইহার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথই করিয়াছেন—"আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়।...মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী সুখ-সৌন্দর্য-ভোগ-

মেঘদূত

ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!"

প্রকারান্তরে 'একাল ও সেকাল' কবিতারও ইহাই বক্তব্য। এই বক্তব্য 'মেঘদূত' কবিতায় আরও প্রগাঢ় গভীর ঘনীভূত হইয়াছে, আরও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে, কিন্তু তাহার বীজ এই কবিতাতেই। একালেই বর্ষার সহিত মানব-মনের *নিত্য-বিরহের নিত্য-মিলনাকাঙ্ক্ষার* সম্পর্ক—"এমন দিনে তারে বলা যায়"। বর্ষাকালেই মানুষ আপনার অন্তরে একটি অনির্দেশ্য অপ্রতিরোধনীয় সৃষ্টিছাড়া বিরহ অনুভব করে আর তখনই মনে হয়, পৃথিবীর কাল-প্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া গেছে। এ বর্ষা যুগযুগান্তের বর্ষা। ইহার স্তরে স্তরে বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক শ্লোকাকারে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাই কবির মনে হয় 'এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে'। সুতরাং বর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে একাল ও সেকালের মধ্যে কোনো সীমারেখা নাই।

## ভাবার্থ

দিবসের মধ্যভাগে অকস্মাৎ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। অবেণীসংবদ্ধা বর্ষার আবির্ভাবে কবি সহসা স্মৃতির মুক্তদ্বার পথে দূর বৃন্দাবনের দু-একটি বর্ষাচিত্র দেখিতে পাইলেন। সেদিন এমনই অশ্রান্ত বর্ষণধারা ও বিদ্যুৎস্ফুরিত অন্ধকারে উন্মত্ত রাধিকা বিরহবিকারে কাতর হইয়া সংকেত কুঞ্জে অভিসারে ছুটিতেছিল। এমনই প্রাবৃট্ সমারোহে প্রোষিতবধূরা নিঃসঙ্গ গৃহবাসে মেঘের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। প্রিয়জনের আগমন-সম্ভাবনায় কেহ বা রোমাঞ্চিত হইত। এখনই মেঘপুঞ্জিত অবকাশে উঠিত মল্লারের মূর্ছনা—অকারণে যাহা চিত্ত বিকল করিয়া দিত। কবির মনে পড়িতেছে, এমনই এক ধারাপ্লাবিত আলোকহীন দিবসে উজ্জয়িনীর সেই বীণাবাদন-ক্লান্তা বিরহিণী যক্ষবধূকে। সব মিলিয়া আজিকার এই শ্যামগম্ভীর দিনটি মনে আনে অতীতের স্মৃতিচিত্র—পদাবলীতে বর্ণিত কদম্বমূল, যমুনাতীর, মেঘোদয়ে শিখীনৃত্য প্রভৃতি। আর ঠিক তখনই মনে হয়, বর্ষার সহিত মানুষের বিরহবেদনার সম্পর্ক এখনো অবসিত হয় নাই। এখনো শারদ-পূর্ণিমায় বা শ্রাবণ-শর্বরীতে বৃন্দাবনের রাধার মত আমাদের চিত্ত কী এক দুর্জ্ঞেয় মিলনোৎকণ্ঠায় ক্রন্দমান হইয়া উঠে। আজও মানবমনে যেন সেই নিত্য বৃন্দাবনের প্রেমলীলার অভিনয় চলিতেছে। পরম প্রেমিকের বাঁশি সেই যমুনার তীর হইতে বাজিয়া ওঠে বলিয়াই আমাদের

প্রেমাতুর চিত্ত ছুটিয়া যাইতে চায়—কিন্তু প্রিয়তমের সন্ধান না পাইয়া গৃহপাশ-বদ্ধ পরকীয়া রাধার মত ব্যর্থ যাতনায় কাঁদিয়া মরে মাত্র। প্রতি মানুষের হৃদয় আজও চিরবিরহী।

## আলোচনা

বর্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা ও অগণ্য গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল ভাববস্তুর বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। চিরকাল কালিদাস তাঁহার প্রিয় কবি এবং মেঘদূত তাঁহার পরম প্রিয় গ্রন্থ। বর্ষা ছিল তাঁহার প্রিয়তম ঋতু, প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহ তাঁহার প্রিয় বিষয়; পদাবলীর ক্ষেত্রে অভিসার এবং বিরহ, তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। ফলত এ সকলের মিলিত প্রকাশ 'একাল ও সেকাল' কবিতা। এই কবিতার অন্তর্নিহিত বক্তব্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহা এই যে, মানুষ বিরহার্ত, যাহার সহিত আমরা মিলিত হইতে চাই সে মানস লোকের অগম পারে বাস করিতেছে। কবিও একান্তভাবেই বিরহিত, আর্ত মিলনবঞ্চিত। মেঘ আসিয়া এই বিরহকে তীব্র করিয়া দেয়। তখন কবি তাঁহার সাম্প্রতিক বিরহকে নিত্যকালের করিয়া এক প্রকার সার্বভৌমত্বের সান্ত্বনা লাভ করেন, আপন ব্যক্তিগত বেদনাকে বিশ্বগত করিয়া অনুভব করিতে চান। তাই বৃন্দাবনের প্রেমলীলাকে চিরন্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবি মনে করেন, বৃন্দাবনের সেই নিত্যবিরহী রাধিকাই প্রতি মানুষের বিরহ-বেদনাকে তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

বর্ষা বিষয়ে কবি-ভাবনা

সুতরাং কবিতাটি একালের দিক হইতে সেকাল যাত্রা। ইহাও এক প্রকার মানস-অভিসার—বর্তমান হইতে অতীতে কালাভিসার বলা যায়। এই কারণে কবিতাটির নামকরণে একাল শব্দটি প্রথমে আছে। বর্তমানের বর্ষাবর্ণনাতেই কবিতাটির সূত্রপাত। প্রথমে বৃষ্টিমুখর দিনের একটি ধূসর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নিবিড় নীরদমালার গহন সমাবেশে উজ্জ্বল দিনখানি ধীরে ধীরে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আর তখনই, কেবল চেনা পৃথিবী ও দিবসের উপর হইতে নয়, বর্তমানের উপর হইতেই একটি যবনিকা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী ছয়টি স্তবকে প্রাচীন বৈষ্ণব ও সংস্কৃত কাব্যের বর্ষা বিরহের ইতস্তত রেখাচিত্র, দুএকটি সঘন দীর্ঘশ্বাস, কতিপয় বিরহ-কাতর অশ্রুজল সঞ্চারিত হইয়াছে।

মানস অভিসার

শেষ দুইটি স্তবকে কবি আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ বর্তমান যেন রূপান্তরিত বর্তমান, ইহার মূল্যমান বদলাইয়া গিয়াছে। এ বর্তমান অতীতের অবগাহন করিয়া নিত্যত্ব লাভ করিল। একাল সেকালে নিমজ্জিত হইয়া নিত্যকাল হইয়া উঠিল। কবির সকল বিরহবেদনা, তথা এযুগের মানুষের ব্যথাবিলাপ লোকশোচনা অনুতাপ-বিরহের অন্তরালে একটি কালান্তরের তাৎপর্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সেই চিরন্তন বৃন্দাবন লীলা। বৈষ্ণব কবিরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলায় পুলকিত হইয়াছিলেন। এই বৃন্দাবনলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব—তাঁহার জীবনের আচরণের দ্বারা এই লীলাকে তিনি সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াছেন—

নিত্য-বৃন্দাবন

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
ভাগ্যবান কেহ কেহ দেখিবারে পায়॥

ইহা হইল ধর্মবিশ্বাসের কথা। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখিয়াছেন, 'আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে', তখন তাহা ধর্মের সহিত নিঃসম্পৃক্ত; তাহা রোমাণ্টিক কবির উপলব্ধির কথা। সে উপলব্ধি একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষাদ, একটি দুর্জ্ঞেয় অপ্রাপণীয়ের জন্য অলৌকিক আবেগ, তাহা এক অনির্বচনীয় সুখের বেদনা, এক পরম অপ্রাপ্তির অন্তহীন হাহাকার। যেন এ জগতের কেন্দ্রে এক নিত্যকালের বিরহিণী বাস করিতেছে, বর্ষা আসিয়া তাহা জানাইয়া যায়—আর সেই অজ্ঞাত অথচ চিরচেনা বিরহিণীর জন্য অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া যায়—

বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে॥

এই যে গানের ভাষায় মানসলোকের চিরদিনের বিরহিণী, ইহাই কবিতার ভাষায় 'সারাদিন সারাবেলা' 'হৃদয়কুটীরে' ক্রন্দমানা রাধা।

চারটি চরণে এক একটি ক্ষুদ্র স্তবকবন্ধ এবং মোট নয়টি স্তবকে রচিত এই নাতিদীর্ঘ কবিতায় বর্ষার আবহসংগীত রচনা করিতে কবি কত বর্ষা-সাহিত্য হইতে এলোমেলো চিত্র ধার করিয়াছেন। ধার করিয়াছেন বলা

বোধ হয় ঠিক নয়। আসলে সেইগুলি যেন কবিবিশেষের সম্পত্তি নয়—তাহা সর্বকালের বর্ষার সহিত জড়িত, নিত্যপটের রঙ ও রেখাঙ্কনের উপকরণ। কলিদাসের সহিত জয়দেবের চরণ মিলিয়া গিয়াছে, বিদ্যাপতির ভাবের উপর বলরামদাসের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে। একটি বিদ্যুচ্চমকে মেঘদূত কাব্যের একটি বিরহ-স্তনিত শ্লোক উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ কোথাও কোনো জটিলতা নাই, নিতান্ত সহজ সরল প্রত্যয় ও বিশ্বাসে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত এই কবিতা। পংক্তিগুলি গভীর ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ ও ইঙ্গিতময়। শেষের দুইটি স্তবক তো রক্তাক্ত সত্যের মত একালের রোমান্টিক কবিতার মর্মলোক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নিসর্গকে কবি কী গভীর তাৎপর্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানবজীবনের স্নায়ুসত্তার সহিত তাহার কী নিবিড় সম্পর্ক, তাহা রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ণ যৌবনে রচিত বর্ষা কবিতা হইতে প্রমাণ করা যায়।

রোমান্টিকতা

অনেকে বলেন, কবিতাটির পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে মেঘদূতের উল্লেখ না করিলেই ভালো হইত। পদাবলীর বিরহ বেদনা, বৃন্দাবনের দিবাভিসার, হৃদয়-কুটীরে বিরহার্তা রাধিকার বিলাপ এই অনুষঙ্গেই কবিতাটির সৌন্দর্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা কিছুটা সত্য হইলেও কবি সেকালকে বিশেষ কালখণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখিতে চান নাই। বেদনার সূত্র ধরিয়া নিখিলকালের বর্ষা চিত্রই তাঁহার মানসপটে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, এবং এইজন্য মেঘদূতের প্রসঙ্গও রসবোধকে খুব একটা পীড়িত করে না।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

[ প্রথম স্তবক ]

**বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী**—নীলনবঘনে ঘন কালো মেঘের বিপুল বিস্তার দেখিয়া কবি একটি আকুলায়িতকুন্তলা নারীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। **গাঢ় ছায়া……বনশ্রেণী**—আকাশ মেঘে আবৃত হইয়া গেলে পৃথিবীর উপর একটি ধূসরতার আবরণ পড়ে, তখন চেনা জগৎ অচেনার মত লাগে, ঘনচ্ছায় অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া ওঠে। দ্বিপ্রহরে সূর্যের অভাবে সন্ধ্যার আভাস লাগে এবং বৃক্ষতরুরাজি যেন আরও কালো ঘনশ্যামল হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। মেঘাবৃত মধ্য দিবসের আর একটি বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে উদ্ধৃত হইল—

"মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই; শচীর কোনো প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গন মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ, এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে।" [ কেকাধ্বনি—বিচিত্র প্রবন্ধ ]

জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে—মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। অর্থাৎ হে রাধিকে, নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইয়া উঠিল, বনভূভাগও শ্যামল তমালতরুতে অন্ধকার, শ্রীকৃষ্ণও ভয়ার্ত—একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তুমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাও।

[ দ্বিতীয় স্তবক ]

**আজিকে এমন……পড়ে মনে**—বর্ষার মধ্যে একটি ঔদাস্য আছে, একটি অন্তর্মুখীনতা আছে। তাহা বহিঃসংসার হইতে মনকে গুটাইয়া আনে ভিতর দিকে। তখন অতীতের দ্বার খুলিয়া যায়, পুরাতন স্মৃতির পুঞ্জ ভিড় করিয়া আসে মনের মধ্যে। সেই স্মৃতি নিকট ও দূর অতীতের, কালপরিচয়-হীন নিশ্চল চিরন্তন অতীতের যাহাই হোক না কেন। কালিদাস বলিয়াছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ, মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তির চিত্তেও আনমনা ভাব উপস্থিত হয়। **দিবা-অভিসার**—প্রিয়জনের সহিত সংকেতস্থানে মিলনের উদ্দেশ্যে গোপন অভিযানকেই অলংকার শাস্ত্রে বলা হয় অভিসার। পদাবলীতে এই অভিসারের আবার নানা কালগত পর্যায় কল্পনা করা হইয়াছে, যথা বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার ইত্যাদি। মিলনের অসহ্য ব্যাকুলতা নায়িকাকে উদ্দিষ্ট প্রিয়জনের দিকে ধাবিত করিতেছে, তখন লোকলজ্জা কালজ্ঞান পথকষ্ট সবই দূরীভূত হইয়া গেছে, ইহাই অভিসারের সাংকেতিক তাৎপর্য। পদাবলীতে যে দিবা-অভিসারের বর্ণনা আছে, তাহা মুখ্যত রৌদ্রতপ্ত দিবসের মধ্যাহ্নে।

**ব্যাখ্যা—সেই দিবা-অভিসার…দূর বৃন্দাবনে**—কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া ব্রজবধূ রাধা প্রেমিকের আকর্ষণে ও বংশীধ্বনির আহ্বানে উন্মত্ত হইয়া, প্রখর দিবালোকেই, লোকভয় লজ্জাত্রাস পারিবারিক গ্লানি উপেক্ষা করিয়া, কৃষ্ণের

সহিত মিলিত হইবার জন্য সংকেত-স্থানে ছুটিয়া গিয়াছিল। অভিসারিকা রাধার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী বলিয়াই কবি পাগলিনী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা আছে, তাহা কোনো ঐতিহাসিক কালপর্বে চিহ্নিত নয়। বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেন, কৃষ্ণের লীলা শাশ্বত ব্যাপার, তাই তাঁহারা 'নিত্যবৃন্দাবন' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ভক্তের মানস-পটে এই মিলন-বিরহের লীলার চিরন্তন অভিনয় চলিয়াছে, তাহারই মনন স্মরণ কীর্তনই হইল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ঠিক বৈষ্ণব ভক্তের চোখ দিয়া দেখেন নাই, দেখিয়াছেন রোমান্টিক কবির চোখ দিয়া। রোমান্টিকের দৃষ্টি ইতিহাস-চেতনার সহিত সম্পৃক্ত নয়, তাহা কালান্তরকে বর্তমানে আনিয়া উপনীত করে, বর্তমানকে সুদূর অতীতে স্থাপন করে। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার সহিত রোমান্টিক মানস-সান্নিধ্য অনুভব করে। প্রেমের সর্বাত্মক আকর্ষণে আত্মবিস্মৃত রাধা যে দয়িতের নিকট সকল পরিবেশ লোকভয় সময় জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এই দৃশ্যটি মেঘমেদুর শ্যামল বর্ষাদিনে বৃন্দাবন হইতে কবির মানস-লোকে স্থানান্তরিত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত বিরহবেদনায়, চিরমিলনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের প্রেমলীলা এবং কৈলাসের যক্ষনারীর বিরহবেদনা দুইই অত্যন্ত কাছের বলিয়া মনে হয়। তুলনীয়—

"এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।" [ বিচিত্র প্রবন্ধ—নববর্ষা ]

[ তৃতীয় স্তবক ]

**সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া**—বর্ষণভারাক্রান্ত মেঘাগমের সহিত তীব্র বেগে বায়ু বহিতেছে। এই আকুল বাতাসের বেগ কবিকে মনে করাইয়া দিতেছে বর্ষামুখর একটি বৃন্দাবন-দিবসের স্মৃতি; সেদিন রাধিকা তাহার সংকীর্ণ গৃহাবরোধ উপেক্ষা করিয়া মধ্যাহ্ন দিবসেই কৃষ্ণের

দুর্বার আকর্ষণে সংকেতকুঞ্জে মিলনের জন্য উন্মাদিনীর মত ধাবিত হইয়াছিলেন। সেদিন এমনি করিয়াই উত্তাল বেগে বায়ু বহিতেছিল। এই পংক্তির তাৎপর্যটি বড়ই সূক্ষ্ম। আজ যেমন করিয়া মত্ত ঝড়ো বাতাস বহিতেছে এমনি উন্মাদ পবনে যেদিন যমুনা তর্জিত হইতেছিল, মেঘ থরথর গর্জিত হইতেছিল, সেদিন বাহিরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ রাধার অভ্যস্ত স্নেহনীড়টিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাই বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া রাধিকা কৃষ্ণকুঞ্জে পাগলিনীর মত অভিসারে ছুটিয়া ছিলেন। তখন যে দিবসকাল, চতুর্দিকে সজাগ সতর্ক প্রহরা ও কুৎসিত লোকনিন্দা তাহা তাঁহার খেয়ালে ছিল না। তেমনিতর বাতাসই এখন বহিতেছে। সুতরাং কবিমনও রাধার মতই ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে অন্তরাত্মার চির গম্যস্থানে যাইবার জন্য। তাহার অন্তরের কোনো প্রিয়জন কোথায় কোন দূরান্ত কুঞ্জে অপেক্ষমান, তাহারই কাছে যাইবার মত্ত আহ্বান এই বাদলবাতাস। **এমনি অশান্ত……রমণীয় হিয়া**—সেদিন বৃন্দাবনে কেবল উন্মত্ত বাতাসই বহিতেছিল না, তাহার সহিত ছিল প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত, তীব্র বিদ্যুতের চকিৎ উদ্‌ভাস। এই ঘনদুরন্ত দুর্যোগে গৃহাবরুদ্ধ রমণীর মন দুর্গম মিলনকুঞ্জে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানসলোকের প্রিয়তমের সান্নিধ্য পাইবার জন্য চিত্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়। সংসারের অভ্যস্ত কর্মে বন্দিনী নারীর হৃদয় বহির্জীবনের জন্য অভিসারের উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উঠে। এইরূপ একটি ঘনবর্ষণমুখর দিবসের চিত্র আঁকিয়া বিলাপচ্ছলে রাধিকা বলিয়াছেন—

এ সখী হামারি দুখের নাহি ওর।<br>
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর<br>
শূন্য মন্দির মোর।

[ চতুর্থ স্তবক ]

**বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে**—নববর্ষার মেঘ যখন গুরু গুরু ডাকিয়া উঠে তখন বিরহিণীর হৃদয় আর্তনাদ করিয়া উঠে। ঐ মেঘের গম্ভীর গর্জন বর্ষার মর্মলোকটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় বলিয়া প্রিয়বঞ্চিত নারীর চিত্ত আর থাকিতে পারে না। অন্য সময় গৃহকর্মে ও প্রাত্যহিকতায় আত্মবিস্মৃত থাকিলেও মেঘের আহ্বান তাহার সকল ঔদাসীন্য ভাঙিয়া

দেয়। তখন তাহার আতুর নিঃসঙ্গতা আর কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। এই জন্য মেঘের জলদগম্ভীর ধ্বনিতে বিরহিণী যেন মরমে মরিয়া যায়।

**ব্যাখ্যা—নয়নে নিমেষ…জলদের স্বরে**—আকাশে যেদিন পুঞ্জীভূত আষাঢ়ের শ্যামায়মান মেঘ স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিত সেদিন অভ্যস্ত গৃহকর্ম ভুলিয়া বিরহিণী তাহাকে নিবিড় দুঃখে ও গভীর প্রত্যাশায় দৃষ্টির দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইত। মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তির চিত্তে আনমনা ভাব জাগে, দুঃখী বিরহীর তো কথাই নাই। বেদনার কারণ, প্রিয়জন নিকটে নাই। আনন্দের কারণ, আষাঢ় আসিয়াছে—এখন দূরদেশে কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়জন যদি এবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। তুলনীয়—

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।

[ মেঘদূত,পূর্বমেঘ ৮ নং ]

অর্থাৎ বনপথে আরূঢ় তোমাকে দেখিয়া পথিকবনিতাগণ ( যাহাদের স্বামী বিদেশে ভ্রাম্যমাণ ) বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া ( কারণ এইবার বর্ষার ছুটিতে স্বামী আসিতে পারেন এই বিশ্বাসে ) অলকদাম তুলিয়া তোমাকে দেখিবে। কালিদাস অন্যত্রও বলিয়াছেন যে মেঘ সন্তপ্তদের শরণ—সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং, কারণ সে প্রিয়বার্তা বহন করিয়া লইয়া যায়। যক্ষ মেঘকেই দূত করিয়া যক্ষপ্রিয়ার কাছে পাঠাইয়াছিল। নবজাত কুটজকুসুমের অর্ঘ্য দিয়া প্রীতিসহকারে মেঘকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়াছিল। এই চিত্রগুলি স্মরণ করিয়াই কবি বলিতেছেন যে, সেকালে মেঘদর্শনে বিরহিণীরা অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। সেই ঘনায়মান পুঞ্জীভূত মেঘে যেন তাহাদের বহুকালের ব্যাকুল কামনা, বহু আতুর বিরহের দীর্ঘশ্বাস, বহু দিবসের মিলনের ব্যাকুলতা অঙ্কিত থাকিত। রবীন্দ্রনাথের 'এসো শ্যামলসুন্দর' গানেও আছে—

আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে।
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমাল কুঞ্জপথে সজল ছায়াতে
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী॥

[ পঞ্চম স্তবক ]

**চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথ পানে**—যে নারীর প্রিয়জন কর্মোপলক্ষে বিদেশে অবস্থান করে তাহাকে বলা হয় প্রোষিতভর্তৃকা বা পথিকবধূ, কালিদাস বলিয়াছেন পথিক-বনিতা ( পূর্ববর্তী স্তবকে কালিদাসের শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, মেঘদূত, পূর্বমেঘ ৮নং শ্লোক )। মেঘদর্শনে পথিকবধূগণ বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া আকাশে চাহিয়া থাকিত। এই বিশ্বাসই বিরহীচিত্তে মেঘের দান। **মল্লার গাহিত কারা**—ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে মল্লার বর্ষার রাগ বিশেষ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্ষাবরণের জন্য সংগীতকারগণ মল্লার রাগে গান গাহিত। তুলনীয়,

ভূর্জপাতায় নবগীত কর রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী। [ বর্ষামঙ্গল—রবীন্দ্রনাথ ]

**মল্লার গাহিত……ধারা**—লৌকিক বিশ্বাস এই যে মল্লার গানে বৃষ্টিপাত সংঘটন করানো যায়। প্রাচীন ভারতের একটি বর্ষাচিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। **নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে**—প্রাচীন ভারতের একটি বর্ষাদিবসের চিত্র রচনা করিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, নিবিড় বর্ষাকে আবাহন করিবার জন্য যখন গীতশিল্পী আবেগে মল্লার রাগে গান গাহিত এবং সেই সংগীতের সুরে জলধারা ঝরিয়া পড়িত, তখন তাহা বিরহিণীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিঃসঙ্গ হৃদয়কে অভ্রান্তভাবে স্পর্শ করিত। মল্লার রাগের মধ্য দিয়া বর্ষার মর্মলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাই মল্লারের সুর প্রিয়হীন মানুষের জীবনে আসিয়া তাহার ব্যথার কেন্দ্রকে সোজাসুজি আঘাত করিতে পারে।

[ ষষ্ঠ স্তবক ]

**যক্ষনারী**—মেঘদূতে উল্লিখিত যক্ষপত্নীকে উল্লেখ করা হইতেছে। মেঘদূত কাব্যের প্রথম শ্লোকে আছে যে, নিজকার্যে অমনোযোগের জন্য জনৈক যক্ষ শাপগ্রস্ত হইয়া তাহার পত্নীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রামগিরি পর্বতে এক বৎসরের জন্য নির্বাসিত হয়। এই স্থান হইতেই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সে তাহার উজ্জয়িনী-প্রাসাদস্থিত যক্ষপত্নীর নিকট মেঘকে দিয়া যে বার্তা পাঠায় তাহাই মেঘদূত। উত্তর মেঘ অংশে যক্ষের কল্পনায় তাহার প্রেয়সীর সম্ভাব্য অবস্থা ও কর্মের বহু বিবরণ দিয়াছেন

কালিদাস। **যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন**—মেঘের নিকট বিরহী যক্ষ তাহার দূরস্থিত বিরহিণী প্রিয়ার সম্ভাব্য মানসিক অবস্থা ও আচরণের ছবি আঁকিতেছিল। হয়ত মেঘ তাহাকে পূজায় বা যক্ষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে ব্যাপৃত দেখিবে অথবা

উৎসঙ্গে বা মলিন বসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী॥

অর্থাৎ মলিন বসনে ক্রোড়ে বীণা নিক্ষেপ করিয়া আমারই নামযুক্ত গান গাহিতে গাহিতে কখনও চোখের জলে সিক্ত বীণার তার কোনোমতে চালনা করিতেছে। কখনও বা স্বকৃত মূর্ছনাও ভুলিয়া যাইতেছে। এই আত্মবিস্মৃত যক্ষ নারীর চিত্রটি যেন বর্ষা দিবসের বিরহিণীর একটি সাধারণ চিত্র। তাই এই চিত্রটি কবির দৃষ্টিপটে ভাসিয়া উঠিল। **বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ**—দীর্ঘকাল বিরহে যক্ষ নারী আপনার যত্ন না লওয়ার জন্য তাহার কেশপাশ তৈলহীন ধূসর ও অবিন্যস্ত দেখা যাইতেছে। **অযত্ন-শিথিল বেশ**—যে সৃষ্টিমধ্যে আদ্যা সুন্দরী, বিরহ তাহাকে কত বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে তাহারই ইঙ্গিত প্রসঙ্গে কবি তাহাকে প্রসাধন ও যত্নহীন বেশে দেখিতেছেন। **সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দিন**—যক্ষনারীর যে বিবরণ কবি দিয়াছেন তাহা মেঘদূত কাব্যেই আছে। ইহা যক্ষের অনুমান মাত্র। কিন্তু কবি ইহাকে সত্য বলিয়াই জানেন। পরন্তু তাঁহার ধারণা দূর-নির্বাসিত স্বামীর চিন্তায় বীণা ক্রোড়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে যক্ষপ্রিয়া যেদিন আপন সংগীত ভুলিয়া যাইতেছিল, সেইদিনও এইরূপ মেঘমেদুর ছিল।

[ সপ্তম স্তবক ]

**সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর**—পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার স্মৃতিমুখরিত কদম্ব বৃক্ষের তলদেশ এবং যমুনা প্রান্তবর্তী কুঞ্জগৃহ। বৈষ্ণব কবিতায় কদম্ব কানন যমুনাতীর বহুবার ব্যবহৃত, কারণ এই স্থানগুলি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রিয় ও রাধাকৃষ্ণের লীলামুখরিত। বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করিয়া এই দুইটি স্থানের অনুষঙ্গ কবিমনেও সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহার সহিত কবি বর্ষাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ, কদম্ব বর্ষারই ফুল এবং যমুনার উপর বর্ষার সমারোহ সম্ভবত তাঁহার কবিকল্পনাকে উদ্বেজিত করিয়াছিল।

**সেই সে শিখার নৃত্য এখনও হরিছে চিত্ত**—ইহা বিশেষভাবে পদাবলী বা মেঘদূতের স্মৃতি নয়, বর্ষামেঘোদয়ে আনন্দে ময়ূর নৃত্য করে, এদৃশ্য প্রাচীন বর্ষা সাহিত্যে বিরল নয়। নাগরিক জীবনে এই চিত্রটি বিরলদৃশ্য হইলেও বর্ষা দিবসে ময়ূরের নাচের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। তুলনীয়—

উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।—[ রবীন্দ্রনাথ ]

**ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ তিমির**—বর্ষার সহিত নরনারীর মনের একটি আদিম বেদনার যোগ আছে। শ্রাবণের অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসে তখন সমগ্র পৃথিবীর গৃহবদ্ধ মানুষের জীবনে যেন একটি অজ্ঞাতপূর্ব বিরহের সঞ্চার হয়। সুখীলোকের চিত্তে আনমনা ভাবের কথা কালিদাসই স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহা রোমান্টিক বিরহ মাত্র। অন্তরের কোনো চিরপ্রিয়ের জন্য মানুষের মন তখন অকারণে উতলা হইয়া উঠে—'বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে'।

[ অষ্টম স্তবক ]

**ব্যাখ্যা—আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে**—বৈষ্ণব কবিতায় বৃন্দাবন অখিলব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি; এই বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জেই তিনি তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধার সঙ্গে মাধুর্যলীলায় মিলিত হন। ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট এই লীলার অবসান নাই, বৃন্দাবন নিত্যবৃন্দাবন। কারণ ভগবান প্রেমময়, জীবলীলা তাঁহার প্রেমলীলারই প্রকাশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটিকে ধর্মের দিক হইতে নয়, রোমান্টিকতার দিক হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৃন্দাবন কৃষ্ণের প্রেম-লীলার স্মারক নয়, ইহা রাধার বিরহ বেদনার নিত্যভূমি। ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবন হইতে, তাঁহার লীলালগ্নের রহঃসখী ও প্রেয়সীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই যে মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। নন্দপুর-চন্দ্রাবনা বৃন্দাবন চিরকাল আঁধার হইয়াই আছে। বিরহিণী রাধিকার আর্ত দীর্ঘশ্বাসে, ব্যথিত বেদনায়, প্রতীক্ষার নিশ্চল ক্রন্দনে বৃন্দাবনের তৃণবায়ু জল আকাশ উন্মথিত হইয়া রহিল। আষাঢ়ের শ্যামায়মান তমালতালীবনের অন্ধকার ও শ্রাবণের অবিরল ধারাবর্ষণ বিরহিণীর এই প্রতীক্ষাকাতর নিঃসঙ্গতাকে আরও সুদুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। যাহার সহিত আমরা মিলিত হইতে চাই, সে যে মানস-লোকের অগমপারে বাস করিতেছে, সে যে বিরহিণী রাধিকার মত হৃদয়ের

শূন্য বৃন্দাবনে প্রতীক্ষার ব্যর্থতায় ভূলুন্ঠিত হইতেছে, এমন নিবিড় বর্ষাদিবসে তাহা আমরা অনুভব করি। এইজন্য বিরহার্ত বৃন্দাবন যথার্থই মানুষের মনে। তাহার অন্য কোনো পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক অস্তিত্ব নাই। তাহা আমাদের হৃদয়ের চিরশূন্যতারই প্রতীক বলিয়া বৃন্দাবন-ব্যাপারকে কবি মানস-লোকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার সত্যতা নিঃসংশয়িত-ভাবে প্রমাণ করিতে চাহেন।

**ব্যাখ্যা—শরতের পূর্ণিমায়······বনে উপবনে**—কেবল অশ্রান্ত বর্ষাদিবসেই নয়, শরতের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে কিংবা শ্রাবণের জলপ্রপাতে মানুষের মনে সৃষ্টিছাড়া বিরহ উন্মাদ হইয়া উঠে। যেন আমরা কোনো এক সৌন্দর্যের জগতে মিলিত ছিলাম, যেখান হইতে এই কর্মময় পৃথিবীতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই কোনো সুন্দর মুহূর্তে, কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সেই জগতের কথা মনে পড়িয়া যায়। তখন আমাদের মনে পড়িয়া যায় সেই লুপ্ত জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষার কথা—স্মৃতির অন্তরে উত্তালতা জাগে। কালিদাসের একটি বহুখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তু
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি ॥

কোনও রম্যদৃশ্য দেখিয়া বা মধুর কোনো শব্দ শুনিয়া সুখী ব্যক্তির চিত্তে ব্যাকুলতা জাগে। মনে হয় যেন কোনো জন্মান্তরের সৌহৃদ্য অস্পষ্টভাবে তাহার চিত্তে ভাবরূপে স্থির হইয়াছিল, তাহাই ধীরে ধীরে স্মরণে আসিতেছে। যাহাকে কালিদাস জন্মান্তরের সৌহৃদ্য বলিয়াছেন তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের স্মৃতি বলিয়াছেন। এ স্মৃতি ও মানসলোকেরই।

[ নবম স্তবক ]

**এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে**—বৃন্দাবনে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইয়া রাধিকাকে আকর্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহা কোনো ইতিহাসের কথা নয়। কুলবধূ কর্মপাশবদ্ধ বন্দিনী নারী, যে তাহার চারিপাশের অবরোধ ভাঙিয়া বাহিরে ছুটিবে—তাহার জন্য আকর্ষণ চাই, তীব্র আহ্বান চাই। প্রিয়তমের বাঁশিই সেই আহ্বান। ইহার ভাষা নাই,

সুর আছে, আর সে সুর সর্বতাপবিস্মারক। আসলে ইহা প্রেমিকরূপ ঈশ্বরের আহ্বান। তিনি প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ডাক দিতেছেন—'যে শুনেছে তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে' ইহা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। এইজন্য যমুনাতীরের বংশীধ্বনি একটি নিত্য ব্যাপার।

**ব্যাখ্যা—এখনো সে বাঁশি……হৃদয়কুটীরে**—বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, বৃন্দাবনে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতরুর তলদেশে দাঁড়াইয়া রাধাকে বংশীধ্বনিতে আহ্বান করিতেছেন। সেই দূরাগত বাঁশি কুলাবরুদ্ধা রাধার সমাজ সংসার ভুলাইয়া দিতেছে, দুর্বার প্রেমের অন্ধ আকর্ষণে গৃহশাসনভীতা রমণী নিঃশঙ্কিণী হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে প্রেমিকের কাছে। এইজন্য কত কৃচ্ছ্র সাধনা কত পথশ্রম কত দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া চলে তাহার অভিসার। কিন্তু এখানেই মিলন ঘটে না; প্রেমের পথ যে কঠিন-বন্ধুর রক্তাক্ত। সেই কৃষ্ণ আবার কর্তব্যের আহ্বানে মথুরা চলিয়া গেলে নিঃসঙ্গ গৃহে রাধার বিরহিত মুহূর্তগুলি দীর্ঘশ্বাসে বিলাপে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দুঃসহ হইয়া উঠে। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা দেবায়ত হইলেও তাহা মানবজীবনের রূপকেই প্রতিষ্ঠিত। মানব-সংসারের নরনারীর প্রেমলীলা ও রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় কোনো পার্থক্য নাই। আসলে নিখিল মানব লোকের মিলন-বিরহ-প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতাই-যেন রাধার জীবনের মানচিত্র দিয়া রচিত। আমাদের সামাজিক চিত্তমাত্রই যেন এক একটি রাধাসত্তা। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কৃষ্ণ প্রেমিকরূপে আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন, তাহার মধুর বংশীধ্বনি আমাদের কাছে এক অদৃশ্যপূর্ব সৌন্দর্যজগতের আকর্ষণ লইয়া শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আমাদের অভ্যস্ত গৃহকর্ম, প্রাত্যহিক অভ্যাস তাই কোনো পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদরাত্রে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। কোনো ঘনবর্ষণ-মন্দ্রিত শ্রাবণ অন্ধকারে কোন্ দূরদেশের প্রিয়জনের জন্য মনের মধ্যে সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে। কে যেন কানের কাছে পদাবলীর সুর বাজাইয়া তোলে 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনু দিনরাতিয়া'।

বস্তুত ইহাই রোমান্টিক কবির স্বভাব। অপ্রাপণীয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অনির্বচনীয়কে বুঝাইবার ব্যাকুলতা, অধরাকে ধরার ব্যগ্রতা, অনির্দেশ্য সুদূরের জন্য পিপাসা তাঁহার অন্তরধর্মের প্রবণতা। মনে হয় তাঁহার চিত্তের নিভৃতে এক

চিরবিষাদ বাস করিতেছে ; ইহাকেই কবি কখনও বিরহিণী রাধা বলিয়াছেন, কখনও যক্ষনারী ( যেমন মেঘদূত কবিতায় ) বলিয়াছেন।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। 'একাল ও সেকাল' কবিতায় প্রাচীনকালের সহিত সাম্প্রতিক সংযোগ-সাধনের ভিত্তিটি কী? কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিধর্মের কী পরিচয় পাওয়া যায় আলোচনা কর।**

**উত্তর।** 'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী'—এই পংক্তিটির সাহায্যে 'একাল ও সেকাল' কবিতায় একটি বর্ষণব্যথিত মেঘান্ধকার মধ্য-দিবসের চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। এই বর্ষণমুখর দিনটি বর্তমান কালেরই। দেখিতে দেখিতে আকাশ স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। যেন কোনো ঋতুরমণী তাহার মেঘের বেণী আকাশে বিতত করিয়া দিল। মধ্যাহ্নে সূর্য মেঘাবৃত হইয়া গেল বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর উজ্জ্বলতা ধূসরবর্ণে পরিবর্তিত হইয়া গেল, চেনা পৃথিবীর উপর যেন একটি অচেনার ছায়া নিক্ষেপ করিল। দূরের বন-অরণ্য গাছপালা এমনিতেই শ্যামলসবুজ, কিন্তু রৌদ্রাভাবে এবং কালো মেঘের পটভূমিকায় সেইগুলি আরও কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় ঘনকান্তি ধারণ করিল।

এইরূপ একটি মেঘচ্ছায়ান্ধকার রৌদ্রবিরহিত আষাঢ়-মধ্যাহ্নে গৃহবদ্ধ কবিমন অপরিচিতবৎ এই শ্যামলধূসর পৃথিবীর দিকে চাহিয়া উদাসীন হইয়া পড়ে এবং তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া যায় সুদূর শূন্যলোকে, মেঘদূত বৈষ্ণব পদাবলীর জগতে। সাম্প্রতিক কাল হইতে সেই সুদূর অতীতে যাইবার পরিবেশ হইল এই বর্ষা এবং তাহার ভিত্তি হইল বিরহবেদনা।

বর্ষা ঋতুর সহিত মানব মনের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলিয়া রোমান্টিক কবিরা বিশ্বাস করেন। রোমান্টিকতা হইল এক প্রকার মনোভঙ্গী, যাহা কাছের বস্তুকে সুদূরে স্থাপন করিয়া তাহাকে দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত, সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। রোমান্টিক কবিতায় এক প্রকার নৈর্ব্যক্তিক বিষাদ লক্ষ্য করা যায়। একটি অব্যক্ত অনির্বচনীয় বিরহে কবি যেন ব্যাকুল, কিন্তু কিসের জন্য দুঃখ, কাহার জন্য বিষাদ তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যায় না। এই প্রতিদিনের বস্তুজীর্ণ কর্মবদ্ধ ব্যস্ত সংকীর্ণ জগৎ তাঁহার কাছে

অসুন্দর। তাই বিশুদ্ধ অপ্রায়োজনিক সৌন্দর্যের জন্য তাঁহার মনে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগে। জগতের বাহিরে বা ভিতরে, এই অনন্ত বিশ্বে কোথাও সেই পরম সুন্দর একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। সেই পৃথিবীর আভাস মাঝে মাঝে এই পৃথিবীর বুকে নিক্ষিপ্ত হয়। এমনি কোনো বর্ষা দিবসের কর্মহীন অবকাশে, মেঘান্ধকার নিশীথে, শারদীয় জ্যোৎস্নারজনীতে কিংবা ভৈরবী-করুণ প্রভাত বেলায় সেই জগতের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। মনে হয় সেই জগতে এমন কেহ আছেন, যাহার জন্য আমার সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া আছে। স্বপ্নে তাহাকে দেখা যায়, কর্মের বিরল অবকাশে তাহার বাঁশি শোনা যায় মাত্র। দূরস্থিত অন্তরাত্মার প্রিয়জনের নিকট যাইবার জন্য কবিচিত্ত বেদনায় মূর্ছিত হইতে চায়।

ইহাই 'একাল ও সেকাল' কবিতায় কবির মুখ্য বক্তব্য। এই বক্তব্যকে কবি বৈষ্ণব পদাবলী ও মেঘদূত কাব্যের অনুষঙ্গে একাল ও সেকালের মধ্যে সংযোগ টানিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ষা যখন তাহার মেঘময় বেণী এলাইয়া দিল, তখন রোমান্টিক কবিমন উধাও হইয়া গেল পদাবলীর দিবাভিসারের জগতে। যেখানে দিবসের অনাবৃত নির্লজ্জতায় দুঃসাহসিক রাধিকা লোকভয় ত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মত্ততায় যমুনাতীরে সংকেত কুঞ্জে ছুটিতেছেন দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য। আজিকার উত্তাল তুমুল বায়ুবেগ ও বাঁধনহারা জলধারা কবির অতীতাভিসারী চিত্তকে লইয়া যায় চিরবৃন্দাবনের একটি কালচিহ্নহীন সময়হারা পরিবেশে—যেখানে মেঘের ডাকে বিরহী চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, বিদ্যুতের চকিতকিরণে জগতের মর্মলোক কাঁপিয়া উঠে, মেঘের পুঞ্জীভূত সমাবেশ দেখিয়া প্রোষিতভর্তৃকারা প্রিয়সমাগমের মুহূর্ত গণনা করে। সে কোন কালিদাসের মেঘদূতের জগতে কবি অনায়াসে চলিয়া যান, যেখানে বর্ষা বরণের জন্য কবির কণ্ঠে উঠে মল্লার রাগের মূর্ছনা, অলিন্দে অরণ্যে ময়ূর উদ্দাম পাখা মেলিয়া নাচিতে থাকে। এমনি মেঘ-কজ্জল স্নিগ্ধসজল দিবসে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের প্রিয়া একাকিনী উজ্জয়িনীর ভবন-কোণে বীণা কোলে প্রিয়নামাঙ্কিত বিরহের গান গাহিতে গাহিতে অশ্রুজলে সুর ভুলিয়া উদাসিনী বসিয়া থাকিত।

এইভাবে প্রাচীন পদাবলীর বৃন্দাবন, মেঘদূতের পৃথিবী বর্ষার অন্ধকার সজল পথ বাহিয়া একালের রোমান্টিক কবি মনে বিরহের একটি বিষণ্ন ছায়া বিস্তার করে, একালের কবির গানে চিরকালের বিরহ ঘনাইয়া উঠে। এ

বিরহ কোনো সাহিত্যে কাব্যে সংগীতে নিবদ্ধ মাত্র নয়, এ বিরহ মানুষের অন্তরের নিত্যসত্য। প্রত্যেক মানুষই অবস্থার ক্রীতদাস, প্রত্যেকের অন্তরেই একটি পরম প্রিয়ের জন্য আকুতি আছে। তাহার ক্রন্দন ভাষা জানে না, মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় না বলিয়া অশ্রান্ত শ্রাবণবর্ষণের জলশব্দে মিশিয়া যায়। প্রেমই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, অথচ যথার্থ প্রেম কে পাইতে পারে। কোন মানুষ তৃপ্ত, আনন্দিত বা সুখী? তাই তাহার অতৃপ্ত প্রেমের আর্তনাদ জন্মজন্মান্তর বাহিয়া যুগে যুগে ছুটিতেছে। তাই কবি সেকালের যমুনাতীর হইতে ধ্বনিত প্রিয় বংশীধ্বনি একালে বসিয়া শুনিতে পান। তাই তাঁহার মনে হয়—

এখনো প্রেমের খেলা,<br>
সারাদিন, সারা-বেলা<br>
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

---

## সিন্ধুতরঙ্গ

### ভূমিকা

মানসীর কবিতাগুলিতে প্রকৃতির সহিত মানবমনের বিচিত্র সম্বন্ধের স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাতে এক অনিরুদ্ধ মাধুর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতির পটে মানবমনের সুখদুঃখের পাঁচালি এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতার ধর্ম। কিন্তু 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি যেন স্বতন্ত্র, মানসীর [illegible] কবিতার একটি পৃথক্ ধারা।

সিন্ধুতরঙ্গ স্বতন্ত্র জাতের কবিতা

কেবল 'সিন্ধুতরঙ্গ' নয়, মানসীতে আরও দু-একটি কবিতা আছে, যেখানে কবিমনের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকৃতির আর একটি রুদ্রভয়াল প্রলয়ংকর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' এবং 'প্রকৃতির প্রতি' এই দুই কবিতার কথা প্রথমেই মনে পড়িবে। কিন্তু 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'প্রকৃতির প্রতি' 'সিন্ধুতরঙ্গের'ও পরে লেখা। 'সিন্ধুতরঙ্গের' রচনাকাল আষাঢ় [ ১৮৮৭ ] এবং অন্য দুইটি এক বৎসর পরে বৈশাখ মাসে। 'সিন্ধুতরঙ্গে'র বিষয়বস্তু একটি সমকালীন ঘটনা বা দুর্ঘটনা, সুতরাং ইহার উদ্দীপনা বর্হির্জগতের। আর পরবর্তী কবিতা দুইটিতে বাহিরের কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা নাই, সুতরাং ইহাদের অনুপ্রাণনা অন্তর্জগতের, কিন্তু বিষয়ের দিক দিয়া একই মনোভঙ্গির স্মারক।

এই জাতের অন্য দু-একটি কবিতা

'সিন্ধুতরঙ্গে' কবি প্রকৃতির একটি জড় নিষ্ঠুর মমতাহীন অন্ধ শক্তির বীভৎস স্নেহগ্রাসী রূপ দেখিয়া সন্ত্রাস অনুভব করিয়াছেন এবং এই নির্মম জড় প্রকৃতির অট্টতরঙ্গের মাঝখানে মানব সংসারের নশ্বর স্নেহপ্রেমের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। এই কবিতার বিষয়বস্তুকেই যেন সাময়িক ঘটনার স্মৃতিবর্জিত করিয়া নির্বস্তুকভাবে দেখা হইয়াছে 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায়। 'সিন্ধুতরঙ্গে' প্রকৃতির প্রেমগ্রাসকারী লেলিহান রূপটি মূর্ত্যত সমুদ্রের মাধ্যমেই কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহাই আরও ব্যাপক করিয়া 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'তে পাইলেন। কেবল সমুদ্র নয়, সমগ্র সৃষ্টি এক নিয়মহীন বেদনাহীন অন্ধ নিষ্ঠুর জড় উদ্দামতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, যেখানে মানুষের অস্তিত্বের কোনো মূল্য নাই, স্নেহপ্রেমের কোনো ভূমিকা নাই। সৃষ্টি বিপুল নির্বোধ—সে কাহারও

স্নেহগ্রাসী জড় নিষ্ঠুর প্রকৃতি

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

বিলাপ-অনুনয়ে কর্ণপাত করে না। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় কবির দৃষ্টি কিন্তু বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সৃষ্টির নিষ্ঠুরতাকে কবি নির্জীব অন্ধ জড়শক্তি বলিয়া মনে করেন না। তাহার রহস্যময়তা তাহার নিষ্ঠুরতাকে যেন অতিক্রম করিয়াছে—তাই সে নিষ্ঠুর সৃষ্টি নয়, সে কৌতুকময়ী। হিংসা ও প্রেম, অগ্নি-অভিশাপ ও শিশু-সুলভ চপলতা উভয়কে লইয়া কবি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেছেন। সুখের কথা, সৃষ্টির নিষ্ঠুরতা কবিকে অধিককাল পীড়িত করিল না। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কয়েকশত প্রাণীকে গ্রাস করিয়াই প্রশমিত হইল—রুদ্রভীষণ প্রকৃতির বুকে মানুষের স্নেহপ্রেমই জয়যুক্ত হইল। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি হইয়া উঠিল মানুষের হাসিকান্না মিলনবিরহের নিত্য-সঙ্গী। সুখের কথা এইজন্য যে, আমরা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি। 'সিন্ধুতরঙ্গে'র প্রকৃতি প্রকৃতির চিরন্তন রূপ হইতে পারে না। ইহা দুর্ঘটনা মাত্র। অবশ্য পরবর্তীকালে এই জাতীয় কবিতা যে এক-আধটি নিষ্ক্রান্ত হয় নাই, তাহা নয়। কিন্তু সে সকল ব্যতিক্রম দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতির প্রতি

প্রকৃতি সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গির পুনঃপরিবর্তন

'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি ভারতীতে 'মগ্নতরী' নামে প্রকাশিত হয়, পরে 'সিন্ধুতরঙ্গ' এই নামে ইহা মানসীতে সংকলিত হইয়াছে। কবিতাটির অন্তর্নিহিত ঘটনাটি বিষাদকরুণ, যাহা পূর্ববর্তী 'মগ্নতরী' নামের স্মৃতিবাহী। তাহা উত্তরকালের পাঠকদের কাছে মুছিয়া যাইতে পারে সম্ভবত এই আশঙ্কায় কবি 'সিন্ধুতরঙ্গ' এই শিরোনামার নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন—"পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে"। ১৮৮৭ অর্থাৎ ১২৯৪ সালের আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে দুইখানি যাত্রীবাহী স্টিমার প্রায় আটশত যাত্রী লইয়া পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিবার সময় প্রবল ঝড়ে ডুবিয়া যায় এবং প্রায় সাড়ে সাতশত যাত্রী সলিলসমাধি লাভ করে। এই ধরণের ভয়াবহ মৃত্যু তৎকালে সংবাদজগতে যে ধরণের আন্দোলন-উত্তেজনা ঘটাইতে পারে, তাহা ঘটাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হইয়াছিলেন। যাত্রীবাহী স্টিমার তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কত যাত্রী তুলিয়াছিল, অথবা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা কী পরিমাণ নিষ্ঠুর উদাসীনতা দেখাইয়া মানবিকতা লঙ্ঘন করিয়াছিল, ইহা বিচার করা সামাজিক মানুষের কর্তব্য।

সাময়িক ঘটনা

কবিমনের বিচলিত অভিজ্ঞতা

কবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ঘটনা হইতে আকস্মিকভাবে এক গভীর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তাঁহার সমগ্র সত্তা, কবিচেতনা, মানবপ্রেমিক সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয় কম্পিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই কি প্রকৃতির রূপ? এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন প্রকৃতির প্রাণঘাতী দুর্ব্যবহারে তাঁহার কবিপ্রাণ যে অসহ আঘাত-বেদনা অনুভব করিয়াছিল তাহাই দুঃখার্ত ভাষায় আলোচ্য কবিতায় স্তবকাবনম্র হইয়াছে। যে শোকপ্রকাশের ভাষা নাই, সান্ত্বনা নাই, তাহাই যেন প্রকৃতির মমতাহীন বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিমানের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সাময়িক ঘটনাই এই কবিতার প্রেরণা—তথাপি সাময়িক তথ্য কবিতাটির অঙ্গে কঠিন বন্ধন হইয়া উঠে নাই। সমুদ্রের দিকে তাকাইলে মনে হয়, সমুদ্রের অশান্ত রহস্যের গভীরে কী প্রাণগ্রাসের ষড়যন্ত্র নিত্যই চলিয়াছে। সমুদ্রকে লইয়া পৃথিবীর অনেক কবি অনেক কবিতাই লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথও পরবর্তী জীবনে আরও লিখিয়াছেন। তাহারই মধ্যে সমুদ্রের ভয়ংকরতা সম্পর্কে তাঁহার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি কাব্যছন্দে গ্রথিত হইয়া রহিল। ইহাই ইহাই কবিতাটির যাহা কিছু মূল্য।

ইহা অভিমান মাত্র

সমুদ্রবিষয়ক একটি কবিতা মাত্র

**ভাবার্থ**

মহাসমুদ্রে ঝটিকা যেন এক তাণ্ডব মৃত্যু-উৎসব রচনা করিয়াছে। আকাশ-সমুদ্র একসঙ্গে প্রলয়-মিলনে মাতিয়াছে, বিশ্ব জগৎ অন্ধকার, প্রচণ্ড বাতাস গর্জমান, বিদ্যুৎ তীব্রসঞ্চালিত, ফেনপুঞ্জ অট্টহাসির মত, জড় প্রকৃতি উন্মত্তপ্রায়। সমুদ্রের বুকে এই ভয়ংকর ঝঞ্ঝাদৃশ্য দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন, অন্ধ ইন্দ্রিয়হীন নির্মম উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ত দৈত্যগণের বন্ধনহীন ও দিক্‌ভ্রান্ত এক আমৃত্যু অভিযান। ( প্রথম স্তবক )

নীলকান্ত জলধিও আজ দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া গর্জনে-ক্রন্দনে ক্রোধে-শঙ্কায় অট্টহাসে, মত্ত হুংকারে আপনার কূল উপকূল খুঁজিতে মাতামাতি করিতেছে। তাই নীরন্ধ্র অন্ধকারে তাহার এই আত্মঘাতী আর্তনাদ। কখনও কবির মনে হয়, ইহা সমুদ্রের ঝটিকা মাত্র নয়। পাতালনাগ বাসুকি ফণা হইতে ভূমণ্ডল আছাড় দিয়া ফেলিয়া তাহার সহস্র ফণা ও লাঙ্গুলের দ্বারা ভয়ংকর ক্রীড়ায় মত্ত। অন্ধকার যেন গলিত এক সরীসৃপ, নিদ্রার জাল ছিঁড়িয়া চতুর্দিকে নড়িয়া উঠিতেছে। ( দ্বিতীয় স্তবক )

এই সামুদ্রিক ঝড় কবির নিকট এক সংগীতহীন ছন্দোহীন জড় নর্তন মাত্র, সহস্র জীবন গ্রাস করিয়া মহামৃত্যুই যেন ঝড়রূপে আবির্ভূত। জল বাষ্প বজ্র বায়ুর এই প্রাণঘাতী প্রচণ্ড অনিঃশেষ শক্তি অকল্পনীয় ছিল। তাই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা নির্বাধ প্রলয়ের দিকে ধাবমান, আর তাহারই মাঝখানে আটশত নৌযাত্রী নরনারী জীবনের আকৃতি লইয়া তরঙ্গ-দোদুল! (তৃতীয় স্তবক)

ফেনায়িত মৃত্যুর এই উৎসবে রাক্ষসীরূপিণী ঝটিকা এবং সফেন ক্রুদ্ধ সমুদ্র সেই আটশত প্রাণ-সংবল তরণীটিকে গ্রাস করিবার জন্য লেলিহান রসনা প্রসারিত করিয়াছে। প্রাণগ্রাসের বিলম্বে ক্রুদ্ধ মৃত্যুর অধৈর্য আক্রোশ যেন তরঙ্গের শুভ্র ফেনায় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। সে দুঃসহ ক্রোধ ক্ষুদ্র তরীর লৌহবক্ষ যেন আর সহ্য করিতে পারিবে না। সমগ্র আকাশ-সমুদ্র এই যাত্রীবাহী নৌকাটিকে লইয়া সামান্য খেলেনার মত খেলিতেছে। তরণীর কাণ্ডারী অসহায়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া। (চতুর্থ স্তবক)

মজ্জমানতার আশঙ্কায় শিহরিত মানুষগুলি করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রাণভিক্ষার কাতর প্রার্থনা করিতেছে। এই কালিমালিপ্ত অন্ধকারে প্রত্যহ-দৃষ্ট বিশ্বজগতের গ্রহতারাশশী, প্রাচীন মৃন্ময়ী পৃথিবীর শ্যামল ক্রোড়ভূমি, আজন্মের স্নেহ পরিপূর্ণ আপন আপন আশ্রয়-কুটীরের জন্য তাহাদের অন্তর আতুর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের তরঙ্গিত দৃশ্য তাহাদের কাছে অপরিচিত মৃত্যুকরাল ও বীভৎস, যেন কোনো প্রতিহিংসা-পরায়ণা বিমাতার হিংস্র মূর্তি। (পঞ্চম স্তবক)

সহসা ক্ষুদ্র তরণীর তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া মহাতরঙ্গ ফুঁসিয়া উঠিল, সমুদ্র ভয়াল গ্রাস মেলিয়া দিল। ঈশ্বরের নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী এই ষড়যন্ত্রে আটশত মুমূর্ষুর আকাশ-বিদীর্ণ আর্তনাদ উঠিল, ভয়ার্ত শিশুগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঝঞ্ঝাবাতাসের এক ফুৎকারে শতশত দীপালোক নিভিয়া যাওয়ার মত, সহস্র গৃহ নিরানন্দ করিয়া আটশত নরনারী সমুদ্রগর্ভে মিলাইয়া গেল। (ষষ্ঠ স্তবক)

এই নিষ্ঠুর নিরাসক্ত প্রকৃতির জড়তাণ্ডবতার মধ্যে স্নেহ-প্রেম-পরিপূর্ণ মানব-সংসারের অস্তিত্ব বিস্ময়কর মনে হয়। ইহারই মধ্যে মাতা ও সন্তানের নিবিড় বাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, অসংখ্য প্রীতিপূর্ণ মানব-সম্পর্ক সূর্যালোকে উজ্জ্বল

হইয়া দেখা দেয়। সম্ভাব্য সর্বনাশের মুখেও আমাদের সামান্য সকাতর স্নেহপ্রেম ক্ষীণায়ু প্রদীপশিখার মত কাঁপিতে থাকে। মৃত্যু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ হরণ করিতে পারে না বলিয়াই আসন্ন বিপর্যয়ের পটভূমিকাতেও বিশ্বজগতের মানব-সম্বন্ধ যেন ভয়শূন্য হইয়া দুলিতেছে। নিমজ্জমান হইতে হইতেও মাতা সন্তানকে বক্ষে আলিঙ্গিত করিয়া ধরে, সমগ্র আকাশ-সমুদ্রের মৃত্যুপণকে উপেক্ষা করিয়া জননী তাহার দুর্বল বক্ষোরন্থটিকে আঁকড়াইয়া থাকে। ( সপ্তম ও অষ্টম স্তবক )

বিশ্বপ্রকৃতির এই নির্মম জড়-প্রবাহের মধ্যে মানব-প্রাণে প্রেমের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়জনক। এই প্রেমের আকর্ষণে সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়াও জননীর স্নেহ মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠে। নৈরাশ্যের উর্ধ্বে এই নবীন আশা, প্রলয়ের মুখে স্নেহের এই অনিঃশেষ উৎসারণ যেন জড়-প্রকৃতির উপর কোনও স্নেহঘন বিশ্বজননীর জয়সূচনা করিতেছে। ইহাই বিশ্বের বিচিত্র লীলা। দয়া ও নির্মমতা, আশঙ্কা এবং আশা, সত্য-মিথ্যা একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিতেছে। একদিকে হৃদয়হীন অন্ধ ভয়ংকর জড় প্রকৃতির সবেগ আকর্ষণ, অন্যদিকে নির্ভয় প্রেমের গভীরতম বন্ধন—মৃত্যু ও জীবনের এই টানাপোড়েনের মধ্যে কবি সংশয়াচ্ছন্ন। ইহা দুই সমশক্তিসম্পন্ন দেবতার অমীমাংসিত চিরন্তন জয়পরাজয়ের দ্বন্দ্ব কিনা কবি সে প্রশ্নের কোনো উত্তর পান নাই। ( নবম ও দশম স্তবক )

### আলোচনা

'সিন্ধুতরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের খুব একটি জনপ্রিয় কবিতা নয়। কারণ কবিতাটিতে যে ধরণের সংশয়বাদ আছে, তাহা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিরোধী। প্রকৃতির সহিত মানব মনের যে মধুর সম্পর্ক তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনে প্রচারিত ব্যাখ্যাত ও উপলব্ধ, এই কবিতাটি তাহার বিরল ব্যতিক্রম। সমুদ্রের উপর রচিত কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে আরও আছে, কিন্তু এই কবিতাটির সহিত তাহাদের পার্থক্য এক নজরেই ধরা পড়ে। বস্তুত সংশয়বাদই 'সিন্ধুতরঙ্গে'র বৈশিষ্ট্য। ইহার পটভূমিকায় সাময়িক ঘটনা একটি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়া যেন এক মুহূর্তেই কবির প্রকৃতি-সম্পর্কিত সংশয় অভিমান হতাশা উজাড় হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির যে হৃদয়হীনতা তাঁহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল,

সংশয়বাদী কবিতা

যেন সমুদ্রে তরণী নিমজ্জনের ঘটনায় তাহা আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল। ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহিতেছিলেন—এই তো প্রকৃতির নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা! এইরূপ একটি বিশ্বজনীন সত্যের, একটি সার্বভৌম প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করাই 'সিন্ধুতরঙ্গে'র কাব্যিক উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যে সামুদ্রিক ঝড়ে অসহায় আটশত যাত্রীর সলিল সমাধি হইয়াছিল, কবি তাহাতে ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস এতই ঘনীভূত, তাঁহার তিক্ততা এতই তীব্র যে, অভ্রান্ত মানস-চেতনার দ্বারা কবি সেই মজ্জমান দুর্ভাগাগুলির মৃত্যুপূর্ব অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃতি সম্পর্কে কবির অভিমান এতই চূড়ান্ত হইয়াছিল যে, কয়েকশত নরনারীর শেষ বিলাপধ্বনি, আসন্ন মৃত্যুর সীমান্তে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিরুপায় অভিশাপ ও কাতর ভাষাহীন আর্তনাদ তাঁহার কল্পনায় যথাযথ প্রতিফলিত হইয়াছে। নিছক বর্ণনা-সর্বস্ব সাময়িকতার কবির পক্ষে ইহা সম্ভব হইত না।

বর্ণনার কুশলতা

সমুদ্রে ঝড় ও দুর্ঘটনার এই চাক্ষুষপ্রায় বর্ণনাটি রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাকুশলতার সার্থক দৃষ্টান্ত। মহাসমুদ্রের অনির্বচনীয় প্রলয় কবির লেখনীতে কিরূপ আশ্চর্যভাবে মূর্তিমান হইয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি স্তবক যেন সেই বিশাল সমুদ্রের অগ্রসরমান স্ফীতকায় তরঙ্গ। তাহার গর্জন-নর্তন, সফেন উত্তালতা ও মত্ত হুংকার, ক্ষুদ্র তরণীটিকে লইয়া তাহাদের উন্মত্ত চপলতা, প্রাণহরণের লেলিহান লক্ষ রসনার ঊর্ধ্বায়িত উৎসব, অন্ধকারের ত্রস্ত সাম্রাজ্য-প্রসারণ—সব মিলিয়া ভয়ানক রসের একটি কুশলী আয়োজন। এই প্রসঙ্গে Joseph Conrad-এর The Mirror of the Sea-র অংশ বিশেষ মনে পড়িয়া যায়—

সমুদ্র সম্পর্কে আর একটি অভিমত

The ocean has the conscienceless temper of a savage autocrat spoiled by much adulation. He cannot brook the slightest appearance of defiance, and has remained the irreconcilable enemy of ships and men ever since ships and men had the unheard-of audacity to go afloat together in the face of his frown. From that day he has gone on

swallowing up fleets and men without his resentment being glutted by the number of victims.···If not always in the hot mood to smash, he is always stealthily ready for a drowning.

এখানেও সমুদ্রকে বিবেকহীন বর্বর স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে এবং সমুদ্রের প্রাণগ্রাসী ভয়ংকর স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সমুদ্রই, বস্তুদৃষ্টিতে সমুদ্রের বর্ণনা মাত্র। মানুষ ও তরণীর সদম্ভ উপেক্ষা সমুদ্র সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই প্রচণ্ড ক্রোধবশত সমুদ্র তাহার উপর স্পর্ধাভরে ভাসমান সব কিছুকে নিঃশব্দে গ্রাস করে। ইহা গভীর কল্পনাশক্তির পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু শব্দের ব্যবহার করিলেও, সমুদ্র তাঁহার কাছে এক বৃহত্তর বিশ্বব্যাপ্ত জড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রতীক মাত্র। সমগ্র কবিতায় সমুদ্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তথাপি সে সমুদ্র এক অন্ধ নির্মম নিসর্গমাত্র—'জড় প্রকৃতি' 'জড়ের নর্তন', 'জড়ের বিলাস' 'নিষ্ঠুর জড়-স্রোত' 'জড় দৈত্যশক্তি' প্রভৃতি শব্দগুলি তাহার প্রমাণ। সপ্তম স্তবকে সমুদ্রের কথাই নাই, তাহা নিখিল সংসার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সুতরাং সমুদ্রকে জড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়া কবি বৃহত্তর কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

'সিন্ধুতরঙ্গে'র সঙ্গে তুলনা

কিন্তু কেবল এই জড় প্রকৃতির সামুদ্রিক ভয়াবহতার সাংবাদিক বিবৃতি দিয়াই কবিতাটি সমাপ্ত হইলে ইহা উচ্চাঙ্গের কবিতা হইত না বলাই বাহুল্য। এই কবিতায় কবি শেষ পর্যন্ত তাঁহার কবিধর্ম সূক্ষ্মভাবে বজায় রাখিয়াছেন। সংশয়বাদেই কবিতা সমাপ্ত এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণগ্রাসী সমুদ্রের মৃত্যু-তাণ্ডবের কারুণ্যই এই কবিতার উদ্দেশ্য তাহাও সত্য। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটু অবকাশ থাকিয়া যায়। সত্যই প্রকৃতির এই জড়তা, এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, এই তাণ্ডব মৃত্যুযজ্ঞই চরম? তবে কি স্নেহপ্রেমের কোনো মূল্য নাই? ইহাই কবিতাটির সংশয়বাদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন সর্বাত্মক মৃত্যুর মুখে মানুষের স্নেহ প্রেমকেই কবি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ধ্বংসের মুখে, নিশ্চিত বিনষ্টির মুখে দাঁড়াইয়া নশ্বর প্রেম যে এক মুহূর্তেই দীপ্যমান হইয়া উঠে, আটশত নিমজ্জিত মানুষের শেষ মুহূর্তের বাঁচার সংগ্রামে কবি তাহা ধ্রুব বিশ্বাসে

মৃত্যুর তুলনায় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব

কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা না পারিলে রবীন্দ্রপ্রতিভা নিষ্ফল হইত। আর এইখানেই 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় 'যেতে নাহি দিব' কবিতার বীজ উপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের প্রলয়-মৃত্যুর মধ্যেও যেমন স্নেহপ্রেমকে কবি মৃত্যুজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, 'যেতে নাহি দিব' কবিতাতেও তেমনি নশ্বরতার পার্শ্বে প্রেমকেই চিরজীবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সেখানে অবশ্য মৃত্যু জীবজগতের অনিবার্য পরিণাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কোনো ক্রুদ্ধ প্রকৃতির নিষ্ঠুর অট্টহাস্য নয়। কিন্তু বক্তব্য একই—অপরিহার্য অপ্রতিরোধনীয় বিনাশের মুখে শিশুকন্যার 'যেতে নাহি দিব', সমুদ্রে মজ্জমান মাতার আপন সন্তানকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরার মতই। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতার এই পংক্তিগুলি লক্ষণীয়—

'যেতে নাহি দিব' কবিতার সহিত তুলনা

প্রাণহীণ এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন।......
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা।

ইহার সহিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতার এই অংশ তুলনীয়—

আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব নারে'।

আবার 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতা হইতে এই স্তবকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায় সেথাও দিবে না তায়
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!...

সমুদ্রের ঝড়ে তরণী নিমজ্জনের চিত্র অঙ্কন করিতে বসিয়া কবি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহার কবিচিত্তের সেই স্বাভাবিক প্রবণতায়, মৃত্যুর নিকট প্রেমও নতি স্বীকার করে না। ইহা তো কবি পূর্বেই বলিয়াছেন কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' 'নূতন' ইত্যাদি কবিতায়—মৃত্যু অপেক্ষা জীবন বড়, 'ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত'। আজ কল্পনাদৃষ্টিতে একটি ডুবন্ত তরীর আটশত যাত্রীর দিকে চাহিয়া কবি পৃথিবীর সেই আদিতম সত্যটি অনুভব করিলেন। দেখিলেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল মুখব্যাদানের সম্মুখেও মাতা সন্তানকে দৃঢ়বেষ্টনীতে বক্ষে আলিঙ্গিত করিয়া আছে। সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়া তো মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হওয়া—তথাপি স্নেহকে জননীর বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে কোন্ মহাশক্তি? কী আশ্চর্য এই মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহপ্রেমের স্বভাব—

এ বল কোথায় পেলে আপন কোলের ছেলে
এত করে টানে।
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে!···
এ প্রলয় মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী;
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী?

প্রেমের মৃত্যুবিজয়ের ঘোষণা সত্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত নয়, জিজ্ঞাসার আকারেই ব্যক্ত। কিন্তু উপলব্ধিতে কবি ইহার কাছাকাছি আসিয়াছেন। আর 'যেতে নাহি দিব'তে স্থির প্রত্যয়ের সহিত ঘোষণা শুনিতে পাইলাম—

ম্লান মুখ, অশ্রুআঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যতবার পরাজয়
ততবার কহে, 'আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে

সেই মরণপীড়িত অথচ চিরজীবী প্রেমই এই অনন্ত সংসার আচ্ছন্ন করিয়া আছে বিষণ্ন নয়নের উপর অশ্রুবাষ্পের মত, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে চিরকম্পমান।

এই জন্যই বলা যায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' 'যেতে নাহি দিব' কবিতার ভিত্তিস্থাপন, 'অহল্যার প্রতি' যেমন 'বসুন্ধরা'র। 'যেতে নাহি দিব' এবং 'বসুন্ধরা' উভয় কবিতাই সোনার তরীর এবং সোনার তরী মানসীরই পরবর্তী কাব্য।

'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটির সহিত অংশত আর একটি কবিতার সাদৃশ্য আছে, তাহা কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত 'দেবতার গ্রাস', 'সিন্ধুতরঙ্গের' বছর দশেক পরের লেখা। উক্ত কবিতাটিও কোনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত, সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচার লাভ না করিলেও কবিমনকে বিচলিত করিয়াছিল এবং তাহা একই প্রকার ঝঞ্চাক্ষুব্ধ তরণী হইতে একটি অসহায় বালকের সলিল সমাধির কাহিনী। পার্থক্য এই, উক্ত কবিতায় তরণী ডুবিয়া যায় নাই—কেবল প্রাণভীত, দেবতার অভিশাপ-ভীত কতকগুলি ধর্মভীরু যাত্রী সবলে একটি অসহায় বালককে মাতৃবক্ষ হইতে ছিনাইয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছে। এই হত্যার মূল্যে অন্য যাত্রীরা আপনাদের প্রাণরক্ষার কাতর চেষ্টা করিয়াছে। ঝড় সেখানে তীব্র নয়, এবং তাহা সমুদ্রবক্ষে নয়, জোয়ারক্ষুব্ধ নদীতে। কিন্তু উদ্দেশ্য উভয়ত্রই এক। একটি কবিতায় সমুদ্রের যাত্রীরা পুরী হইতে দেবদর্শন ও তীর্থযাত্রা করিয়া ফিরিতেছে, আর একটি কবিতায় সাগরসংগম হইতে তীর্থস্নান করিয়া ভক্তরা ফিরিতেছে। নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতি ও জড়দেবতা দুই কবিতায় একই হৃদয়হীনতায় সংকেতিত। আসন্ন সর্বনাশের মুখে মরণভীত নরনারীর ত্রাণপ্রার্থনা, দেবতার নিকট কৃপাভিক্ষার অনুনয় প্রায় একই প্রকার। ঝড় ও প্রমত্ত জলধারার বর্ণনার মধ্যেও সাদৃশ্য আছে—

'দেবতার গ্রাস' কবিতার সহিত তুলনা

> কোথা তীর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
> আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
> লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
> ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
> অতিদূর তীর প্রান্তে নীল বনরেখা,
> অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
> প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
> উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
> ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
> মূঢ়সম।

'সিন্ধুতরঙ্গে'র প্রথম চারটি স্তবক এই বর্ণনারই ফেনায়িত বিস্তৃতি মাত্র। এমন কি 'দেবতার গ্রাসে' যাহা 'ফেনিল আক্রোশ' তাহাও 'সিন্ধুতরঙ্গে'র প্রথম ও চতুর্থ স্তবকের দুইটি পংক্তিতে প্রাপ্তব্য—

বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি'          হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড় প্রকৃতির।

এবং আরও স্পষ্টভাবে—

বিলম্ব দেখিয়া রোষে          ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।

'সিন্ধুতরঙ্গে'র পঞ্চম স্তবকে কম্পমান মৃত্যুভীত দুর্বল তরণীর আটশত নরনারীর মানস-স্মৃতিতে মেদুর স্নিগ্ধ মৃন্ময়ী বসুন্ধরার স্বপ্নকল্পনাটি দ্রষ্টব্য—

কোথা সেই পুরাতন          রবিশশী তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার          কোথা সেই ঘরদ্বার,
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই          পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

ইহাই আরও অপরূপ ব্যঞ্জনায় 'গৃহগতপ্রাণ' রাখালের ক্রন্দমান কল্পনায় ভাষা পাইয়াছে 'দেবতার গ্রাস' কবিতায়—

জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছলভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক
অয়ি স্থির অয়ি ধ্রুব অয়ি পুরাতন
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন

শ্যামলা কোমলা, যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে,
দিগন্ত বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে।

পূর্ববর্তী 'ভূমিকা'য় বলা হইয়াছে, 'সিন্ধুতরঙ্গ' ছাড়াও 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতা দুইটিতেও প্রকৃতির স্নিগ্ধমধুর ও রুদ্রভীষণ স্বরূপের মধ্যে কবি এক প্রকার বৈপরীত্য অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব ও সংশয়বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কবি অচিরেই শান্তশ্রী স্নিগ্ধকান্তি প্রকৃতির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতাতেই এই প্রকৃতির নিকট কবি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ফলে সমুদ্রকেও শেষ পর্যন্ত কবি মাধুর্যময়ী জননীরূপে দেখিতে শিখিয়াছেন। 'সিন্ধুতরঙ্গে'র সহিত সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে কবিমনের কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য একেবারে শেষ বয়সে আসিয়া কোনো কোনো কবিতায় কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও হিংস্র, প্রসন্ন ও বন্ধুর দুই রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ( পত্রপুটের 'পৃথিবী' দ্রষ্টব্য ), কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

প্রকৃতি সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তন

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

( প্রথম স্তবক )

**দোলে রে···উৎসব ভীষণ**—ঝঞ্ঝামত্ত সমুদ্রের প্রমত্ত প্রকৃতিকে কবি একটি মৃত্যু-উৎসব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। **শত পক্ষ···দুর্দম পবন**—সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড বায়ুবেগ যেন একটি বিশাল ভয়ংকর নভোচারী পক্ষী, যে তাহার শত শত ডানার দ্বারা সমুদ্রে এক ভয়াবহ তরঙ্গ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে। **আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে**—অন্ধকারে দিক-চক্রবাল রেখা বিলুপ্ত হইয়া গেছে, আকাশ এবং সমুদ্র একই বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহাকে কবি দুই অসীমের মিলন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সমুদ্র এমনিতেই তাহার সীমাহীনতার দ্বারা ত্রাসের সৃষ্টি করে ; ইহার সহিত নীলাকাশ কৃষ্ণপাণ্ডুর হইয়া যখন সমুদ্রের সহিত মিশিয়া গেল, তখন চারিদিকেই অসীমের ভয়ংকরতা ঘনায়িত হইয়া উঠিল, ইহাই কবির বক্তব্য। **অখিলের**

**আঁখিপাতে আবরি তিমির**—চারিদিকের নিবিড় অন্ধকার যেন অনন্ত বিশ্বের দৃষ্টির উপর দিয়া আঁধারের কালিমা লিপ্ত করিয়া দিয়াছে। আকাশ ও সমুদ্র এই দুই অসীম শক্তির মহামিলন বিশ্বের কাছে গোপনে সংঘটিত করার জন্যই যেন তাহার চোখের উপর অন্ধকারের আবরণ বিছাইয়া দেওয়া! **হা হা করে ফেনরাশি**—সমুদ্রতরঙ্গ বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার শীর্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র ফেনা। বাতাসের শব্দে মনে হয় সেই ফেনাগুলি যেন অট্টহাস্য করিতেছে। **তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড় প্রকৃতির**—ফেনাগুলি কেবল তরঙ্গের হাসি নয়, উহারাই সমগ্র জড়-প্রকৃতির হৃদয়হীনতার অট্টহাসি। সমুদ্রের চারিদিকেই ফেনপুঞ্জ দেখা যাইতেছে, তরঙ্গদোদুল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শুভ্র ভয়ংকর ফেনা। অন্ধকারের মধ্যে সেই শ্বেতবর্ণের সফেন দৃশ্যগুলি অন্তরকে শিহরিত করিয়া তুলে, তাহাদের গর্জন বারংবার শুনিতে শুনিতে মনে হয়, ইহা ফেনামাত্র নয়। নিষ্ঠুর নির্মম যে জড়শক্তি সমুদ্রের রূপ ধরিয়া মৃত্যুর উৎসবে মুখরিত, তাহাদের কঠিন মর্মবিদারী ভয়ংকর অট্টহাস্যই এই সকল ফেনার রূপে প্রকাশিত। **চক্ষুহীন···ছিঁড়েছে বন্ধন**—ঝড়ের প্রমত্ততাকে কবি মহাশক্তিসম্পন্ন অসংখ্য দৈত্যের দুর্দান্ততার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই জড়রূপী দৈত্যগণ কিন্তু অন্ধ ও বধির, তাহাদের গৃহ নাই, স্নেহও নাই। বন্ধন-ছিন্ন করার ভয়ংকর ব্যাকুলতায় তাহারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে।

( দ্বিতীয় স্তবক )

**নীলাম্বুধি অন্ধকার**—সমুদ্র সাধারণত নীল, কিন্তু এখন যেন ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। **হারাইয়া চারিধার······আপনার কূল**—ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের তাণ্ডবতার বর্ণনাটি অনবদ্য। সমুদ্রের এই জান্তব উন্মত্ততার পশ্চাতে কী মনোভাব আছে, মানব বুদ্ধিতে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় একসঙ্গে বহু বিচিত্র অনুভূতি যেন এই সামুদ্রিক সত্তায় যুগপৎ সংক্রামিত হইয়াছে। যেন তাহার এই প্রমত্ত কল্লোল-উন্মত্ততা-গর্জনের অন্তরালে কিছু অব্যক্ত ভাব রহিয়াছে—কখনও সে কাঁদিতেছে, কখনও ক্রোধে গর্জন করিতেছে, কখনও শঙ্কায় শিহরিত হইতেছে, কখনও বা প্রচণ্ড-ভাবে অট্টহাস্য করিতেছে। তাহার এই মত্ত গর্জন-কল্লোলের মধ্য দিয়া সে যেন আপনাকেই জানিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা যেন আপনার কূল খুঁজিবার ব্যগ্র চেষ্টা। **বাসুকি**—মহর্ষি কশ্যপ ও দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র

নাগরাজ বাসুকি সমুদ্র-মন্থনকালে দেবতাদের মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। কদ্রুর সহিত মতান্তর হইবার ফলে কদ্রু পুত্রকে অভিশাপ দিলে বাসুকি নানা তীর্থে কঠোর তপস্যা করিতে সুরু করেন এবং তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে পাতালে গিয়া এই পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে আপন মস্তকে ধারণ করিতে বলেন। সেই অবধি বাসুকির ফণার উপর পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা, এইরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত।

**যেন রে পৃথিবী……আছাড়ি লাঙ্গুল**—পুরাণমতে নাগরাজ বাসুকির মস্তকের উপর পৃথিবীর নিশ্চল প্রতিষ্ঠা ; কিন্তু সমুদ্রের ভয়াবহ দুর্যোগ দেখিয়া কবি অনুমান করিতেছেন যে, নাগরাজ যেন পৃথিবীকে মস্তক হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার সহস্র ফণা এবং গর্জমান লাঙ্গুল লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার নিকট যাহা ক্রীড়া, তাহাই পৃথিবীতে ভয়ংকর দুর্যোগরূপে দেখা দিয়াছে। সমুদ্রের অস্থির উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গে নাগরাজের ফণা ও লাঙ্গুল-আস্ফালনের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

**ব্যাখ্যা—যেন রে তরল……ছিঁড়িয়া**—সমুদ্রের উপর দিগন্ত কালো করিয়া অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। একটি উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অন্ধকার যেন একটি ঘুমন্ত সরিসৃপ, সহসা নিদ্রাভঙ্গে সে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সেই বিশাল সরিসৃপের নড়াচড়ায় দিক্‌দিগন্ত টলমল করিয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রই এখানে সরিসৃপের সহিত উপমিত। তবে অলংকার স্পষ্ট নয়, কারণ পূর্বেই সমুদ্রকে তরল অন্ধকার বলা হইয়াছে। 'উঠিছে নড়িয়া' এবং 'নিদ্রার জাল ছিঁড়িয়া' ফেলার দ্বারা তাহার জীবন্ত কোনো জীবদেহকেই সংকেতিত করা হইয়াছে।

( তৃতীয় স্তবক )

**ব্যাখ্যা—নাই সুর……প্রকাণ্ড মরণ ?**—সমুদ্রবক্ষে অস্থির প্রমত্ত ঝঞ্ঝা-দুর্যোগের চিত্রাঙ্কন করিতে গিয়া সহসা কবির মনে হইল, সমুদ্র আসলে একটি অব্যক্ত বিশাল নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির প্রতীক মাত্র। প্রকৃতিকে চিরকাল কবিরা ছন্দ ও সংগীতের উৎস বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রকৃতি নির্বোধ বস্তুপিণ্ড—ইহার অস্থির ঘূর্ণাবর্তের পশ্চাতে একটি অন্ধ দৈত্যশক্তি রহিয়াছে। এই সামুদ্রিক দুর্যোগ সেই স্থূল জড়-প্রকৃতির ছন্দোহীন সুরহীন এক নৃত্য। নৃত্যছন্দ অপরকে মোহিত করে কিন্তু এই জড় প্রকৃতির নৃত্যে না আছে ছন্দ,

না আছে অর্থ বা আনন্দ। ইহা এক মৃত্যুলোলুপ দৈত্যের জান্তব আনন্দ মাত্র। মানুষের সুখসমৃদ্ধ জীবনকে নির্বিচারে গ্রাস করাই তাহার সুখ, সেই প্রাণ-হরণের দ্বারাই তাহার আয়ু স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

**ব্যাখ্যা—জল বাষ্প বজ্র……চাহিয়া সম্মুখে**—মহাসমুদ্রে অকস্মাৎ এক প্রলয়ংকর ভয়াবহ দুর্যোগের বর্ণনা করিতে বসিয়া প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এক জান্তব জড়-শক্তির স্বরূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তাহার প্রমত্ততার মধ্যে কোনো সুর নাই, ছন্দ নাই, জীবন হরণের উন্মত্ত আনন্দে মহামৃত্যুর মতই সে যেন নাচিয়া উঠিয়াছে। এই দুর্যোগের উপকরণ চারটি—সফেন তরঙ্গমালা, ঘন কুয়াশাময় মেঘপুঞ্জ, গর্জমান বজ্র এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগ। ইহাদের ক্রমবর্ধমান প্রভূত শক্তি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন জীবজগতের প্রাণবায়ু গ্রাস করিয়া করিয়া তাহারা ক্লান্ত ( 'হতাশ' শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয় )। এইভাবে মৃত্যুর আনন্দে এই নির্বোধ জড়-প্রকৃতি ভয়াবহ হইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার অন্ধ গতিবেগ যেন তাহার নিজের কাছেই শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্বাত্মক প্রলয়ের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র তরণীতে আটশত মানুষ আসন্ন মৃত্যুর কম্পমান ত্রাসে শেষ প্রহর গণিতেছে। সমুদ্রের এই ভয়ানক রুদ্রমূর্তি দেখিয়া অসহায় যাত্রীদল সর্বনাশের আর দেরি নাই, ইহা নিশ্চিত বুঝিলেও প্রাণের আশা কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। তাই পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া, পরস্পরের জীবনকে আকর্ষণ করিয়া তাহারা মৃত্যুর মুখে এক সংঘবদ্ধ প্রাণশক্তির প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে চাহে।

( চতুর্থ স্তবক )

**তরণী ধরিয়া……ঝাঁকে**—ইতিপূর্বে সমুদ্রের দুর্যোগকে অন্ধ ইন্দ্রিয়হীন প্রমত্ত দৈত্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল, এখন তাহাকে রূপকথা-বর্ণিত এক রাক্ষসীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আটশত যাত্রীর ক্ষুদ্র ভাসমান তরণীটির উপরই যেন রাক্ষসীর একমাত্র ক্রোধ। **ফেনোচ্ছলছলে**—সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস যেন তাহার লোলুপতারই ছদ্মবেশ, ইহাই কবি বলিতে চাহিতেছেন। **বিলম্ব দেখিয়া…শ্বেত হয়ে ওঠে**—সমুদ্রের এই প্রচণ্ড তাণ্ডব, ঝড়ের এই রুদ্র হুংকার, ঝটিকার এই উন্মত্ত গর্জন এ সবই মানবের জীবন হরণের জন্য জড়-প্রকৃতির লোলুপতা, ইহাই কবির বক্তব্য। তাই রাক্ষসী ঝটিকা আটশত যাত্রীবাহী তরণীটিকে যেন দুহাতে ঝাঁকাইতে

ঝাঁকাইতে তাহাদের প্রাণহরণের বীভৎস দাবী জানাইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ ফেনায়িত হইয়া এই আটশো মানুষকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। যেন আর বিলম্ব তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না, আটশো মানুষকে গ্রাস করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই সমুদ্র ক্রোধে ফুলিয়া গর্জিয়া উঠিতেছে। সমুদ্রের জল সাধারণতঃ নীল, কিন্তু এখন ঝড়ের প্রবেগে তাহাদের বর্ণ হইয়াছে কালো এবং তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে শুভ্র ফেনপুঞ্জ দেখা যাইতেছে। মনে হইতেছে যেন কতকগুলি অসহায় মানুষকে গ্রাস করিতে না পারার বিলম্ববশত অধৈর্যে ক্রোধে তাহারা এইরূপ সফেন হইয়া উঠিতেছে। **লৌহবক্ষ**—লৌহনির্মিত তরণীর অর্থাৎ জাহাজের তলদেশ; জাহাজের নিম্নতল লৌহনির্মিত হইলেও সমুদ্রের প্রাণহরণ-চক্রান্তে ও লোলুপতায় তাহা বিদীর্ণপ্রায়! **অধ ঊর্ধ্ব...খেলিবারে চায়**—আটশত যাত্রীবাহী ষ্টিমার আয়তনে ছোট নয়, কিন্তু বিপুল দিগন্তহীন তরঙ্গিত মহাসমুদ্রের কাছে তাহা কত ক্ষুদ্র, অসহায় ক্রীড়াসামগ্রী মাত্র। আকাশ-সমুদ্র একাকার হইয়া মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষুদ্র এই তরণীটিকে লইয়া শিশুর খেলনার মত মাতামাতি করিতেছে। অর্থাৎ তরণীটি যে কোনও মুহূর্তেই ডুবিয়া যাইতে পারে—কেবল সমুদ্রের ক্রীড়াসামগ্রী বলিয়াই যেন তাহা ভাসিয়া আছে। **দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়**—কর্ণধার বা কাণ্ডারী নৌকাকে অকূল সমুদ্রে চালাইয়া লইয়া যায়। ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া স্থিরদৃষ্টি ও ধৈর্যের দ্বারা সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে। কিন্তু এই অসহায় তরণীটির প্রতি লেলিহান সমুদ্রের নজর পড়িয়াছে। রাক্ষসী ঝটিকা ইহার আটশত নরনারীকে গ্রাস করিবার জন্য তরণীটিকে ঝাঁকুনি দিতেছে। সিন্ধু কোটি ঊর্ধ্ববাহু তুলিয়া 'দাও দাও' হাঁকিতেছে। এখন কর্ণধার কী করিবে? সমুদ্র-আকাশের সম্মিলিত প্রলয়কর্তার নিকট এই তরণীটি এখন ক্ষুদ্র ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। তাহাদের চপলতা ইচ্ছা ও লোলুপতার দ্বারাই এখন তরণীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, কর্ণধারের ইচ্ছায় নয়। তাই তরণীর এক প্রান্তে অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত তাহার অন্য কর্ম নাই।

( পঞ্চম স্তবক )

**নরনারী কম্পমান**—আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শঙ্কা-ভয়ে মুমূর্ষু মানুষগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এই স্তবকের দৃশ্য-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

**ব্যাখ্যা—নরনারী কম্পমান⋯রাখো রাখো প্রাণ**—সমুদ্রের প্রলয় তাণ্ডবের মুখে তরণীর অনিশ্চিত অবস্থায় আটশত নরনারী আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কম্পমান হইয়া প্রহর গুণিতেছে এবং শেষ অসহায় আর্তনাদ জানাইতেছে ত্রিশত্রাণ বিধাতার নিকট, যিনি সকল দুর্যোগ দূর করিয়া আর্ত এই মানুষগুলিকে কোনো অলৌকিক উপায়ে বাঁচাইয়া দিতে পারেন। বিপন্ন ত্রাসেই ঈশ্বরের করুণা মানুষের প্রার্থনার বিষয় হয়। এই মানুষগুলির অন্তিম প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকট প্রাণ-ভিক্ষার আবেদন বড়ই করুণ। আটশত মানুষের জীবনকে জীবন্ত অবস্থায় নিরুপায় মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া যেন বিধাতারই কোনো কঠিন নির্দেশে সংঘটিত হইতেছে। কঠোর দুঃখে মানুষের মনে পূর্বকৃত পাপাপরাধ সম্পর্কে চেতনা জাগে। তাই মুমূর্ষু মানুষগুলি এই সম্ভাব্য মৃত্যুকে তাহাদের অজ্ঞানকৃত দুর্বোধ কোনো তিল তিল অপরাধের ফল বলিয়া ভাবিতে পারে। বিধাতা যেন সেই অপরাধেরই কঠিন শাস্তি দিতেছেন। এইজন্যই এই বিপন্ন মৃত্যুভীত মানুষগুলি কাতর কণ্ঠে দেবতার দয়া, ক্ষমা, করুণা ও প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছে।

**ব্যাখ্যা—কোথা সেই⋯⋯সহস্র আকার**—সমুদ্রের বুকে আলোক-লুপ্ত তিমিরের আবরণ পড়িয়াছে বলিয়া আকাশ-পারাবার কালিমালিপ্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। অসহায় মৃত্যুভীত যাত্রীদল দোদুল্যমান তরণীতে বসিয়া আসন্ন সর্বনাশের প্রহর গণিতেছে আর মৃত্তিকার স্নেহনীড়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। মানুষ মাটির উপর বাস করে বলিয়া জল অপেক্ষা স্থলই তাহার কাছে প্রিয়। কঠিন মৃত্তিকা ও বসুন্ধরার ধূলিকণার সহিত তাহার নিবিড় সখ্যের সম্বন্ধ। ধরিত্রী জননী তাহার মৃন্ময় বন্ধনের দ্বারা আমাদের সহস্র স্নেহসম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মৃৎপৃথিবীর সহিত মানবের আকর্ষণ কত গভীর, এই অতল রহস্যময় মৃত্যুভয়ংকর তরঙ্গিত সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে মুমূর্ষু যাত্রীরা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। তাই সেই পুরাতন পৃথিবী যেন আপন জননীর স্নেহমধুর ক্রোড়ের মত মনে হইতেছে আর এই উন্মত্ত ক্রুদ্ধ সমুদ্রকে প্রতিহিংসা-পরায়ণা বিমাতার মত মনে হইতেছে। মৃত্যুর পূর্বে মানুষের স্মৃতিতে তাহার প্রিয়পরিচিতদের মুখ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। এই যাত্রীদের স্মৃতিতে আজ হিংস্র জলকল্লোলের তুলনায় কঠিন মৃত্তিকা, দুর্যোগহীন আকাশের নিত্যদৃষ্ট চন্দ্রসূর্য তারকামণ্ডলী, প্রতিদিনের গৃহসংসারের ছবি মনে পড়িতেছে। চতুর্দিকের এই গর্জমান

হিংস্র সমুদ্র ভয়াবহ মুখব্যাদান করিয়া আছে। ইহারা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া মৃৎপৃথিবীর পরিচিত দৃশ্যগুলি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

[ইহার সহিত 'দেবতার গ্রাস' কবিতার "হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক" প্রভৃতি অংশ তুলনীয়।]

(ষষ্ঠ স্তবক)

**সিন্ধু মেলে গ্রাস**—তরণীতল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সবেগে তরণীতে জল উঠিতে লাগিল, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ষ্টিমারটি ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা যেন আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র নয়, হিংস্র লোলুপ প্রাণহরণকারী সমুদ্র এতক্ষণ চেষ্টার পর তরণীতল ফাটাইয়া এই আটশত নরনারীকে গ্রাস করিতে আসিতেছে ইহাই কবির বক্তব্য।

**ব্যাখ্যা—নাই তুমি……জড়ের বিলাস**—মানুষের বিপন্ন অসহায়তাই দৈবপ্রার্থনার হেতু—এই মজ্জমান মানুষগুলিও সবনাশের সীমায় দাঁড়াইয়া দেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতা তাহাদের প্রাণভিক্ষায় কর্ণপাত করিলেন না—তরণীর লৌহবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া তাহা নিশ্চিতভাবে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তখন হতাশ্বাস নিরুপায় যাত্রীদের মনের অবস্থা এই পংক্তিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই মৃত্যুমুখ যাত্রীগুলির প্রাণভিক্ষার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাহারা যেন দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছে, দেবতার করুণাময় দয়াময় শব্দগুলি যেন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দেবতার মিথ্যা বিশেষণ। কে বলে এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এক পরম মঙ্গলময়ের শুভ বিধান বিরাজ করিতেছে? বরং বিশ্ব এক অন্ধ নির্বোধ হৃদয়ানুভূতিহীন জড় শক্তিমাত্র—ইহাই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া আটশত যাত্রীর সমবেত বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে।

**ভয় দেখে ভয় পায়**—একের মৃত্যুভয় অপরের কাছে আরও ত্রাসের সৃষ্টি করিতেছে এবং এইভাবে আটশত যাত্রীর মনেই প্রবল ভীতি সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। **উভরায়**—উচ্চৈঃস্বরে। **নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে**—একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অবর্ণনীয় করুণ নিষ্ঠুর শোচনীয় দুর্ঘটনার মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়াছেন। তরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইবার পর আটশত যাত্রীর মধ্যে মহাত্রাস, প্রাণভিক্ষার আর্তনাদ, পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন, উধর্বশ্বাস নিরুপায় কোলাহল

উঠিয়াছিল। ইহার সহিত শিশুদের নির্বোধ ক্রন্দন যুক্ত হইয়া একটি আর্ত চীৎকারের সৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু তাহাও কত ক্ষণিকের, কত সামান্য। মহাসমুদ্রের গর্জমান হিংস্র ব্যাপ্ত ভয়াবহতার কাছে এই আটশত জিজীবিষু প্রাণীর অন্তিম আর্তনাদ কত তুচ্ছ, তাহার প্রমাণ, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এই যাত্রীসহ তরণীটি অতল মৃত্যুর তরলগভীরে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এত কাতর আর্তনাদ, ব্যাকুল ক্রন্দন, আর্ত চীৎকার মুমূর্ষু রোদন—এত বিলাপ এত করাঘাত অনুনয়-বিনয় সব ব্যর্থ হইল।

**ব্যাখ্যা—নিমেষেই ফুরাইল……নারিল লখিতে**—এতগুলি যাত্রী এতক্ষণ ধরিয়া জীবনরক্ষার জন্য কত চেষ্টা করিতেছিল, কোনো অলৌকিক উপায়ে প্রাণ বাঁচিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য কত অসম্ভব কল্পনা চলিতেছিল। দেবতার করুণা ভিক্ষা করিয়া এতগুলি বিপন্ন মানুষ কণ্ঠস্বর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর সমুদ্র বা দয়াময় দেবতা কৃপা করিলেন না। সমুদ্রের তীব্র ক্রুদ্ধ আঘাতে আঘাতে, ক্ষুধাতুর হিংস্র জড়ের প্রমত্ত অভিযানে লৌহবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল—তারপর কয়েক মুহূর্তের ভিতরই আটশত মৃত্তিকার প্রাণীর তীব্র ক্রন্দন, ভয়াতুর আর্ত চীৎকার চিরতরে থামিয়া গেল। এই নিমজ্জন ব্যাপারটি এত দ্রুত নিষ্পন্ন হইল এবং এতগুলি মানুষ লইয়া এত বিরাট একটি তরণী ডুবিয়া যাইবার পর তাহার কোনো চিহ্নই সমুদ্রের উপরিতলে না থাকায় মনে হইতে লাগিল, সমুদ্র যেমন ছিল তেমনি আছে। এখানে ক্ষণপূর্বে যে এতবড় ট্রাজেডি সংঘটিত হইয়া গেল, তাহার লেশমাত্র প্রমাণ নাই। **নারিল লখিতে**—কেহই দেখিতে পাইল না।

**ব্যাখ্যা—যেন রে একই……আনন্দ ফুরালো**—মানব-সমাজে একটি মানুষের মৃত্যু কী গভীর শোকবেদনার সৃষ্টি করে। একটি মানুষ কত মানুষের সহিত স্নেহ-প্রীতি-সখ্য-বাৎসল্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই একজনের বিদায়ে সেই বন্ধনে টান পড়ে বলিয়া সমগ্র সমাজে একটি শূন্যতার বেদনা বাজিয়া উঠে। আর এই দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আটশত যাত্রীসহ একটি তরণী অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়ার মত মর্মান্তিক শোচনীয় দুর্ঘটনা সমাজের ইতিহাসে দৃষ্টান্তরহিত। এইরূপ ঘটনা আমাদের স্তম্ভিত ও বেদনা-বিদীর্ণ করিয়া দেয়। অথচ একটি মাত্র দুর্ঘটনাই এত বড় অপমৃত্যুর কারণ ইহা চিন্তা করিতে কবি ভাষাহীন নিঃসীম শোক অনুভব করিয়াছেন। এই

ভয়ংকর ঘটনার নৈদারুণ্য বুঝাইতে তিনি একটি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিয়াছেন। এক একটি জীবন এক একটি প্রদীপের মত—তাহা এক একটি সংসারকে আলোকিত করিয়া রাখে, অনেকগুলি নিকটবর্তী প্রিয়জন সেই দীপের দ্বারা স্নেহপ্রেম বন্ধুত্বের জ্যোতিতে আলোকিত হয়। একটি প্রদীপ যদি দুর্ঘটনা-মৃত্যু-আকস্মিকতা-রূপ ঝড়ে নিভিয়া যায় তবে মুহূর্তে অনেকগুলি স্বজন-পরিজনভরা স্নেহগৃহখানি অন্ধকার হইয়া পড়ে। আর এই আটশত যাত্রীর আকস্মিক করুণ মৃত্যু যেন একটি বিপুল পরাক্রান্ত ঝঞ্ঝাঘাতে আটশত দীপের চকিত প্রয়াণ। সেই আটশত দীপ শত শত মানুষের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল। সুতরাং ইহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কত সহস্র গৃহ যে আনন্দহীন, শোকচ্ছায়ামণ্ডিত, বিষাদগ্রস্ত ও সর্বনাশপীড়িত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। **একত্তরে**—এক সঙ্গে।

( সপ্তম স্তবক )

**প্রাণহীন এ মত্ততা**—শব্দটি আপাতবিরোধী, এখানে প্রাণহীন অর্থে হৃদয়হীন। **না জানে পরের ব্যথা**—প্রকৃতি মানুষের সান্ত্বনা ও সমবেদনা স্থল, অন্তত রোমান্টিক কবির কাছে; কিন্তু সমুদ্রের জড়প্রকৃতি হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর, মানুষের হৃদয়বেদনার প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্মম। **না জানে আপন**—এমন কি এই নিষ্ঠুর জড়শক্তি আপন অন্তরের সহিতও নিঃসম্পর্কিত। **এর মাঝে······মানবের স্থান**—কেবল সমুদ্র নয়, কবি সমগ্র প্রকৃতিকেই একটি দুর্বোধ অন্ধ হৃদয়হীন জড়শক্তি রূপে কল্পনা করিয়াছেন। একদিকে এই বিশ্বব্যাপ্ত জড় সৃষ্টি অন্যদিকে স্নেহপ্রীতিবদ্ধ দুর্বল মানব সমাজ। প্রকৃতি নির্মম নিরাসক্ত উদাসীন—আর তাহার সেই নির্দয়তার ভিতরই বিধাতা দুর্বল প্রীতিভরা স্নেহান্ধ কোমল ব্যথাপ্রবণ মানবমনকে স্থাপন করিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের কথা ভাবিয়া কবি বিস্মিত হইতেছেন।

**ব্যাখ্যা—মা কেন রে······কত সুখে দুখে**—নিষ্ঠুর হৃদয়হীন এই জড় প্রকৃতি সমগ্র মানব সংসারকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার দয়ামায়া নাই, সৃজনের অন্ধ দুর্নিবার ধারায় সে প্রমত্ত বেগে ধাইয়া চলিয়াছে। তাহার হিংস্র গতির কাছে মানুষের কোনো স্নেহ-প্রেম-করুণার লেশমাত্র স্থান নাই—মহাসমুদ্রের তাণ্ডব দুর্যোগে আটশত জিজীবিষু যাত্রীর আকস্মিক সলিল সমাধিতে তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জড় প্রকৃতির তুলনায়

ক্ষুদ্র মানবের বুকে কত যে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই নিরাসক্ত বিমাতৃসুলভ প্রকৃতির কোলেই মানব-জননীর ক্ষুদ্র বক্ষে অসীম বাৎসল্য ঘনাইয়া উঠে—মাতার সেই অসীম স্নেহের তরুটিকে বেষ্টন করিয়া একটি শিশু লতাইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু এই মাতা-সন্তানের গভীর অচ্ছেদ্য বন্ধনের কী মূল্য আছে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে? তথাপি এই জড় প্রকৃতির বুকের উপরই ভ্রান্তা গভীর প্রণয়ে ভ্রাতাকে বক্ষে আলিঙ্গিত করিয়া ধরে। এই মৃৎপৃথিবীর মধুর প্রসন্ন কিরণ মানব-সম্বন্ধগুলিকে আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছে। সেই স্নিগ্ধ রবিকরে পৃথিবীর মানুষ গভীর সখ্যে মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছে—ইহাই বিস্ময়কর।

**ব্যাখ্যা—কেন করে টলমল……ভীত ভালোবাসা**—জগৎব্যাপ্ত সর্বাত্মক নিশ্চিত বিনষ্টির পটভূমিকায় মানব-জীবনের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা কত নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল। দুর্বল ও কম্পিত বলিয়াই তাহার সৌন্দর্য, নশ্বর বলিয়াই তাহা মধুর, অস্থায়ী বলিয়াই তাহা এমন স্নিগ্ধ লাবণ্যে মাখানো। মৃত্যু অনিবার্য জানিয়াও মাতা তাহার সন্তানকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরে, চলিয়া যাইবার অনিবার্য দুঃখের মুখে ধরিয়া রাখিবার ব্যর্থতা দুই ফোঁটা অশ্রুজল হইয়া ঝরিয়া পড়ে। আঁধারের গ্রাস হইতে প্রাণপণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রদীপ-শিখা থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ইহাই জীবনমৃত্যুর শাশ্বত দ্বন্দ্ব। মৃত্যু অনিবার্য নিশ্চিত, জীবন ক্ষীণায়ু—ইহা জানি বলিয়াই সেই ক্ষণস্থায়ী সামান্য জীবনখানি কী অপরূপ মমতায়, মধুর ক্রন্দনের অশ্রুজল ধৌত বিমলসুন্দর হইয়া উঠে। মৃত্যুর মূল্যেই জীবন প্রিয় হইয়া উঠে।

( অষ্টম স্তবক )

**এমন জড়ের……নিখিল মানব**—নিষ্প্রাণ নির্মম সমুদ্রের তরঙ্গদোলায় প্রাণভয়ে আটশত যাত্রীবাহী তরণীখানি দুলিতেছে। কেবল সমুদ্র কেন, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই তো এই প্রকার নিষ্ঠুর জড়সৃষ্টি মাত্র—অন্ধ নিয়মানুগত্যে, হৃদয়-ভাববিহীন মৃত্যুগ্রাসিতায় সে সমগ্র প্রাণধারাকে গ্রাস করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। কিন্তু সৃষ্টির এই জড় দুর্বার দৈত্যশক্তির সহিত পরিচিত হইলেও মানবজীবন নৈরাশ্যে ক্রন্দমান হইয়া পড়ে নাই। বরং নিষ্ঠুর অন্ধ জড়-প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনধারা আরও মধুর ও আনন্দিত, ভালোবাসাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। **সব সুখ……মরণ দানব**—প্রকৃতি নিষ্ঠুর

মৃত্যুর প্রতীক। মৃত্যু মানুষকে হরণ করে, কিন্তু মানুষের সুখদুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসাকে হরণ করিতে পারে না, ইহাই কবির বিশ্বাস। তাই শোচনীয় বিনাশের বুকেও মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহা 'যেতে নাহি দিব' কবিতারও বক্তব্য।

**ব্যাখ্যা—ওই যে জন্মের·········কে লইবে কাড়ি—**জীবন-মৃত্যুর হরণ-পূরণের ট্রাজেডি চলিয়াছে সমগ্র বিশ্বে। একদিকে নিশ্চিত বিনাশের করাল গ্রাস সমগ্র সৃষ্টিকে বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে মুমূর্ষু মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা ঘনীভূত মৃত্যু-অন্ধকারের বুকে কম্পিত দীপশিখার মত জ্বলিতেছে। মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু মানব-প্রাণের আতুর স্নেহ, কম্পমান ভালোবাসা, মর্মরিত আশা-আকাজ্ক্ষাকে কখনই নিঃশেষে মুছিতে পারে না। তাই জীবন মৃত্যু অপেক্ষা বড়, ভালোবাসা জড়-প্রকৃতির সর্বাত্মক ধ্বংসাভিযানকে সদম্ভে উপেক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকে। মহাসমুদ্রে আটশত প্রাণগ্রাসী বীভৎস ঝঞ্ঝাতাণ্ডবের মধ্যেও কবি এই চিরজীবী মানবপ্রেমের পরিচয় পাইয়াছেন। সমুদ্র যখন তাহার লেলিহান করাল গ্রাস মেলিয়া দিয়া আটশত যাত্রীকে হত্যা করিতে উদ্যত, তখন মৃত্যুযাত্রিণী জননী শেষ মুহূর্ত অনিবার্য জানিয়াও তাহার আপন সন্তানকে বক্ষে প্রাণপণে বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরক্ষণেই সন্তানসহ জননীর অনিবার্য সলিল সমাধি ঘটিবে জানিয়াও জননী এক মুহূর্তের জন্যও সন্তানের প্রতি আপন স্নেহলুব্ধ দুই বাহুর বন্ধনকে তো সামান্য শিথিল করে নাই! এই তুচ্ছ দৃশ্যটির মধ্যে কবি যেন মৃত্যুর মুখে-জীবনের বলিষ্ঠ জয়াভিযানকেই প্রত্যক্ষ করিলেন। মাতা যে অন্ধ স্নেহে মৃত্যুর মুখে ভাসিয়াও আপন হৃদয়রত্নটিকে বুক হইতে ছিন্ন করে না, ইহাই মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা। সমগ্র আকাশ-সমুদ্র এক হইয়া জড় অন্ধ মৃত্যু তাণ্ডবের সূচনা করিলেও এই জড় প্রকৃতির এমন শক্তি নাই যে, ঐ ভয়াতুর দুর্বল জননীর বক্ষ-বন্ধন হইতে অসহায় শিশুটিকে কাড়িয়া লইতে পারে। বিশ্বের কঠিনতম ও প্রচণ্ডতম জড় শক্তির তুলনায় জননীর বাৎসল্য যে অনেক বড়, অনেক প্রবল, তাহাই এই ছত্রগুলির ভিতর দিয়া অকম্পিত বিশ্বাসে ধ্বনিত।

( নবম স্তবক )

**এ বল কোথায় পেলে—**প্রকৃতির নিকট হইতেই মানুষ তাহার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে; কিন্তু প্রাণশক্তি ছাড়াও মানুষের হৃদয়ে স্নেহ-প্রেমের

যে প্রচণ্ড আবেগ-শক্তি উৎসারিত, তাহা কোন্ উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা কবির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। **আপন কোলের ছেলে এত করে টানে**—দুর্বল নশ্বর মানুষ, কিন্তু তাহার স্নেহ-প্রেম কী আশ্চর্য শক্তিশালী। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলিত জড়শক্তির বিরুদ্ধে জননী আপন বক্ষের দুর্বল সন্তানটিকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে কোন্ অকল্পনীয় শক্তির সাহায্যে, কবি তাহা ভাবিয়া পান না।

**ব্যাখ্যা—এ নিষ্ঠুর……মানবের প্রাণে**—'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় ইহাই সবচেয়ে গভীর অর্থবহ ছত্র! নিষ্ঠুর অন্ধ জড়-শক্তি-প্রবাহে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অন্ধ নিয়মানুগত্য, নিশ্চিত মৃত্যুর অনিবার্য আহ্বান, মহাবিনাশের নির্মম আকস্মিকতা, নিশ্চিন্ত সুখসম্ভোগের উপর ভয়ংকর সর্বনাশের আততায়ী আক্রমণ কঠিন সত্যের মত একটি কথাই জানাইয়া দিয়া যায়, সৃষ্টি জড় দৈত্যশক্তিমাত্র। সুতরাং সেই জড়সৃষ্টির অন্তর্গত ধারায় যে মানব নামক প্রাণীর জন্ম হইয়াছে, তাহার আচরণ ও স্বভাবেও এই জড়শক্তির নিয়মানুগত্য এবং যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতা প্রাধান্য লাভ করা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো দুর্জ্ঞেয় বৈপরীত্যে তাহা হয় নাই—বরং মানুষের প্রাণসত্তায় স্নেহ-প্রেম দুর্বলতা-ভালোবাসার এক মহাশক্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

**ব্যাখ্যা—নৈরাশ্য কভু না……কোন্ স্নেহময়ী?**—এক জড় নিষ্ঠুর অন্ধ সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে নশ্বর মানবচিত্তে স্নেহ-ভালোবাসার আবির্ভাব বস্তুতই বিস্ময়কর। মানব নিষ্ঠুর সৃষ্টিরই অংশ, অথচ সেই মানুষ সৃষ্টির ধ্বংসাত্মকতার বিপরীত দিকে প্রাণের এক অক্ষয় বিজয় পতাকা তুলিয়া ধরিতেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর আততায়ী অভিযানকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ তাহার ক্ষীণায়ু বক্ষের দুর্বল প্রেমকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়া ধরে। তথাপি মৃত্যুকে সে রোধ করিতে পারে না, নিশ্চিত বিনাশকে কেহ বাধা দিতে পারে না। আঁধারের গ্রাস হইতে প্রদীপশিখাকে চিরকাল প্রজ্বলিত করিয়া রাখা যায় না। এই সর্বাত্মক বিনষ্টির অনিবার্যতা বারবার প্রমাণিত হইলেও মানুষ তো চিরবিষণ্ণ হৃদয়ে ভাঙিয়া পড়িতেছে না। কোনো বাধা আশঙ্কাই তো মানববক্ষ হইতে স্নেহ-প্রেমকে উৎপাটিত করিতে পারে নাই! বরং প্রেমের বলে ভালোবাসার মৃত্যুঞ্জয় শক্তিতে সে আরও নবীন মৃত্যুহীন হইয়া উঠিতেছে। মাতৃস্নেহের মত এমন দুর্মর শক্তি বিশ্বে আর কিছুই নাই। সৃষ্টির দুর্বার জড় মৃত্যুর বিরুদ্ধে মাতা তাহার সন্তানবাৎসল্যকে মৃত্যুর চেয়ে বড় করিয়া ধরিতে সমর্থ

হয়। নশ্বর জননীর এই গরীয়সী ভালোবাসা দেখিয়া মনে হয় সমগ্র বিশ্ব এই মাতৃস্নেহগৌরবে ধন্য হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রলয়ের মাঝখানে অসহায় জননী তাহার বক্ষোস্নেহকে যে এমন করিয়া চিরজীবী মহাশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়া ধরে, তাহা কি কেবল মাতৃহৃদয়ের অবোধ শক্তিতেই, না এই জড় সৃষ্টিরও উর্ধ্বে কোনো স্নেহময়ী বিশ্বজননী আছেন, যাহার অদৃশ্য সংকেতে মাতার বক্ষে এইরূপ দুর্মর স্নেহপীযূষ ক্ষরিত হয়—কবি তাহা বুঝিয়া পাইতেছেন না। জড়শক্তিই যে সৃষ্টির একমাত্র মূল নয়, তাহার উৎসে আর একটি প্রেমময় বিধাতার মঙ্গলশক্তি আছে, এই বিশ্বাসই যেন ধীরে ধীরে কবির মনে সংক্রামিত হইয়াছে। মাতৃস্নেহ তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

( দশম স্তবক )

**এক ঠাঁই**—একত্র। **পাশাপাশি……বিষম সংশয়**—'সিন্ধু-তরঙ্গ' কবিতায় শেষ পর্যন্ত কবি এই সংশয়বাদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রেমকে জড়শক্তিপ্রবাহের উর্ধ্বে স্থাপন করিতে না পারিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর জড়শক্তির সহিত সহাবস্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত জড় সৃষ্টি যে সত্য নয়, এই বিশ্বাস পরবর্তী কালে তাঁহার চিত্তে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া গিয়াছিল। **মহা শঙ্কা… এক সাথে রয়**—এই বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া কবি উপলব্ধি করিয়াছেন দুই সমশক্তিসম্পন্ন পরস্পর-বিপরীত ধারা, একটি মৃত্যু আর একটি জীবন, একটি বিনষ্টি আর একটি প্রেম, একটি জিঘাংসা আর একটি জিজীবিষা। পৃথিবীর সকল প্রাণী সকল মানব সকল দেহীর নিকটই মৃত্যু অনিবার্য নিশ্চিত পরিণাম, তথাপি মানুষ তাহার প্রেমের বন্ধন শিথিল করিল না। বুকের ধনটিকে মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও ক্ষণেকের জন্য মুক্ত করিল না। একদিকে মৃত্যুর, বিনাশের, বিলোপের, বিদায়ের আশঙ্কা, ভীতি, সন্ত্রাস। অন্যদিকে বাঁচিবার আগ্রহ, ভালোবাসিবার ধনটিকে চিরকাল বুকের কাছে পাইবার আগ্রহ, পরিচিত ধূলিকে আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রাণপণ ব্যাকুলতা! ইহারই নামান্তর 'যেতে দিতে হয়' এবং 'যেতে নাহি দিব'।

**ব্যাখ্যা—কেবা সত্য কেবা……দূর করে ভয়**—জীবন ও মৃত্যুর, বিনাশ ও অমরতার দ্বন্দ্বে এই বিশ্বচরাচর প্রতি মুহূর্তেই ক্ষতবিক্ষত হইতেছে বলিয়া কবির মনে হইল। বিশ্ব এক জড়সৃষ্টিপ্রবাহ, অন্ধ নিয়মানুগত্যে বন্দী, প্রাণহীন মমতাহীন দৈত্যবলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ইহার নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াও কবি যেন তাহাকেই চরম সত্য বলিয়া মানিতে পারিতেছেন না। নিষ্ঠুর

জড়শক্তির মুখে প্রেমের দুর্ধর্ষ অপরাজেয় দৃপ্ত শক্তিও তাঁহাকে বিস্মিত করিল। মহামৃত্যুর শতকোটি গর্জমান ক্ষুধাতুর করাল গ্রাসের মুখেও মাতার স্নেহ-বাৎসল্যের বিদ্যুচ্চমক মহামৃত্যুজয়ী জ্যোতির্ময় রেখা হইয়া কবিকে মুগ্ধ করিল। অনন্ত জগৎ-চরাচরে সর্বত্রই কবি এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির বিজয়াভিযান দেখিতে পাইতেছেন। একদিকে আততায়ী মৃত্যুর নিশ্চিত ঘোষণা, অন্যদিকে অবোধ ভালবাসার অক্ষয় জয়পতাকা—কোন্‌টিকে কবি মিথ্যা বলিবেন? কোন্‌টিকেই বা সত্য বলিবেন? একদিকে অনিবার্য মৃত্যু আমাদের গভীর সমুদ্রের অতলান্ত রহস্যগর্ভে টানিতেছে, অন্যদিকে অমর প্রেম স্বর্গীয় জ্যোতির মত নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করিতেছে—উভয়কেই কবি সত্য বলিয়া জানিলেন। জড়প্রকৃতি মৃত্যুর আহ্বান আনে। অন্ধ দৈত্য নিষ্ঠুরের মত আয়ু হরণ করিতে আসে। প্রাণরক্ষার সকাতর আর্তনাদ, পরিজনের করুণ ক্রন্দন, আত্মীয়ের নিবিড় মিনতি জড়-মৃত্যুকে একবিন্দুও বিচলিত করিতে পারে না। কারণ সে যে প্রাণহীণ পাষাণমাত্র। কিন্তু সকল মিনতিকাতরতা যে মুহূর্তেই উপেক্ষিত হয় সেই মুহূর্তেই প্রেম-ভালোবাসা আসিয়া নিশ্চিত নিষ্ঠুর মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া বসে। মাতা তাহার সন্তানকে বক্ষে আঁকড়াইয়া থাকে, প্রিয়জন তাহার প্রেয়সীকে ক্রোড়ে বাঁধিয়া রাখে। সেই স্নেহ-প্রেমকে মুছিতে পারে, মহামৃত্যুর এমন শক্তি নাই।

**একি দুই দেবতার……জয়পরাজয়**—মৃত্যু ও প্রেমের এই যৌথক্রিয়ায় কবির মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, যেন মৃত্যু ও প্রেমের দুই অধিদেবতা আছেন, তাঁহারা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের জন্য মানুষের ভাগ্য লইয়া পাশাখেলায় নিযুক্ত আছেন। আজও তাহাদের জয়পরাজয় নিষ্পন্ন হয় নাই।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। তোমার নিজের ভাষায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় বর্ণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন কর।**

**উত্তর।** 'সিন্ধুতরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্বাদের পরিচয় দান করে। এই কবিতায় কবি সামুদ্রিক ঝড়ের একটি ভয়াবহ বিবরণ দিয়াছেন। বস্তুচিত্রণে, ঝড়ের নিখুঁত বর্ণনায়, সমুদ্রের উন্মত্ত প্রকৃতির যথাযথ ভাষা-চিত্রাঙ্কনে কবিতাটি আমাদের বিস্মিত করে। কবিতাটির অন্তরালে একটি সমকালীন ঘটনার অভিজ্ঞতা নিহিত আছে।

কবিতাটির 'সিন্ধুতরঙ্গ' এই শিরোনামার নিম্নে লিখিত আছে, "পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে"। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১২৯৪ সালের গোড়ার দিকে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখিত আছে—"Retriever ও Sir John Lawrence নামে দুইখানি ষ্টিমার বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যায় ( ৮৮৭ মে ২৫ ); প্রায় সাড়ে সাতশত লোকের প্রাণনাশ হয়।" এই ঘটনায় দেশবাসী অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। কবিও ইহার মর্মান্তিকতায় আহত হইয়াছিলেন এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া 'মগ্নতরী' নামে একটি কবিতা লেখেন। উহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত কবিতাই 'সিন্ধুতরঙ্গ' নামে মানসীতে সংকলিত হইয়াছে।

সমুদ্রে তীর্থযাত্রী এতগুলি লোকের প্রাণহানির ঘটনায় কবি গভীর আঘাত পাইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তিনি মনুষ্যবিশেষের কোনো কর্তব্যচ্যুতিকে দায়ী করেন নাই, তাঁহার কবিচিত্ত প্রকৃতির নির্মম হৃদয়হীনতায় স্তম্ভিত হইয়াছে। সহসা তাঁহার মনে হইয়াছে, এই সৃষ্টির মূলে একটি নিষ্ঠুর জড়-শক্তি আছে, যাহার নিকট দয়া-মায়ার কোনো স্থান নাই, অসহায় মুমূর্ষু মানুষের মিনতিতে যে কর্ণপাত করে না। সমুদ্রের তাণ্ডব ঝটিকার মধ্যে কবি সেই জড় প্রকৃতির প্রাণঘাতী উন্মত্ত লালসারই পরিচয় পাইলেন এবং অবাধ কল্পনা ও নিবিড় মানব-প্রেমের সাহায্যে সেই আটশত তীর্থযাত্রীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়ার শোচনীয় দৃশ্যটিকে বস্তুযাথাযথ্যে পুনর্নির্মিত করিলেন। মৃত্যুর করাল বিভীষিকা, ঝটিকার প্রমত্ত ধ্বংসাভিযান, আর্ত মানুষের অসহায় বাঁচিবার আকূতি, ক্ষুদ্র তরণীর মহাসমুদ্রে বিলীন হইবার করুণ বিবরণ কবিতাটিতে যুগপৎ ভয়ানক ও করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র কবিতার দশটি স্তবকের মধ্যে ছয়টি স্তবকে এই ঝটিকা-রাক্ষসীর একটি নিপুণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দ্রংষ্ট্রাকরাল মৃত্যুর বীভৎস মুখব্যাদান-চিত্রণে, ঝড়ের গর্জন ও রূপদানে, শব্দে-ধ্বনিতে, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় এই স্তবকগুলি আমাদের স্তম্ভিত করে।

সমুদ্রের বুকে ঝড় একটি আবহঘটিত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য; হইলেও কবির কাছে ইহা অসহায় মানুষের জীবন গ্রাস করিবার জন্য জড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির একটি প্রমত্ত মৃত্যু-অভিযান। এইজন্য এই জড়ের বর্ণনাসূচনায় কবি ইহাকে সমুদ্রের একটি প্রত্যাশাপুলকিত প্রলয়-উৎসব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের কাছে যাহা আতঙ্কের, জড়প্রকৃতির কাছে তাহাই

উল্লাসের। সেই অবোধ উল্লাসেই ঝঞ্ঝারূপ একটি মহাবিহঙ্গ যেন সমুদ্রের বুকে তাহার শতপক্ষ আছড়াইয়া তুলিতেছে যাহা উত্তাল ঢেউরূপে দৃশ্যগোচর হইতেছে। অন্ধকার কালিমায় দিক্‌চক্রবাল মুছিয়া গিয়াছে—ইহা যেন মৃত্যু-উল্লাসে মত্ত আকাশ ও সমুদ্রের এক গোপন মিলনবিহার—যে বিহারের পরিণাম হইবে এক ভয়ংকর সর্বনাশ। সেই বীভৎস মিলনের আনন্দে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। ফেনপুঞ্জ যেন সমুদ্রের তীক্ষ্ণ ভয়ংকর শ্বেতবর্ণ অট্টহাসি যাহা শরীর শীতল ও মর্মরিত করিয়া তোলে। সব মিলিয়া মনে হয়, যেন দৃষ্টিহীন বধির স্নেহবঞ্চিত গৃহচ্যুত কতকগুলি মত্ত দৈত্য এক বন্ধনচ্ছিন্ন মৃত্যু অভিযানে দুর্দম বেগে ধাবিত হইয়াছে।

সমুদ্র কবির নিকট একটি জড়শক্তি যাহার কোনো মমতা নাই, হৃদয় নাই, মানবিক বোধশক্তি নাই, কল্যাণইচ্ছা নাই। কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে এই 'জড়ের নর্তন'টি ভাষারূপ পাইয়াছে। নীলকান্ত জলধি আজ আত্মবিস্মৃত প্রমত্ততায় দিগ্‌ভ্রান্ত। তাহার সামুদ্রিক ক্ষুব্ধতার মধ্যে কোনো বিশেষ মনোভাবের পরিচয় নাই। একটি দুর্জ্ঞেয় অস্থিরতাই তাহার স্বভাব—কোনো মঙ্গলচিন্তা বা শ্রীশোভার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই সে কবির ভাষায়—

কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জনে,
ফুটিয়া ফুটিয়া উঠে চূর্ণ হয়ে যায় টুটে.
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল,

এই অর্থহীন অসংবৃত প্রমত্তবেগের তাই কোনো ছন্দ নাই, সুর নাই—ইহা 'জড়ের নর্তন' মাত্র। কখনো মনে হয়, ইহা যেন ফণা হইতে ভূমণ্ডল ফেলিয়া-দেওয়া পাতাল-নাগ বাসুকির ক্রুদ্ধমত্ত হুংকার, কখনো এক মহাঅন্ধকাররূপ সরিসৃপের নিদ্রাভঙ্গের চাঞ্চল্য, কখনো এক বহুজীবনগ্রাসী মহামৃত্যুর জাগরণ! জল বাষ্প বজ্র বায়ু ঝড়ের এই চতুরঙ্গ উপকরণই প্রলয়ের মুখে অসম্ভব গতি-সম্পন্ন হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর তাহারই মধ্যে আটশত নরনারী মত্তদোদুল তরণীতে অসহায়ের মত পরস্পরকে আঁকড়াইয়া মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছে।

কবিতার পরবর্তী তিন স্তবকে কবি মজ্জমান তরণী ও তাহার আর্ত. মুমূর্ষ.

প্রাণ-রক্ষার ব্যর্থপ্রয়াসে ক্রন্দমান, মৃত্যুভীত যাত্রীগুলির চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। রাক্ষসী ঝটিকা এবং গর্জমান সিন্ধু এই আটশত যাত্রীকে গ্রাস করিবার জন্য তরণীটিকে "দাও দাও দাও" বলিয়া ঝাঁকাইতেছে, আর বিলম্ব-হেতু 'নীলমৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত' হইয়া উঠিতেছে। আকাশ সমুদ্রের এই বিপুল তাণ্ডবতার নিকট একটি সামান্য ক্রীড়াসামগ্রীর মত ক্ষুদ্র তরণীটি ক্রমশই অন্তঃদুর্বল হইয়া পড়িতেছে বুঝিয়া তরণীর কাণ্ডারী অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া। বিপন্ন যাত্রীগুলি আর্তকণ্ঠে রোরুদ্যমান নৈরাশ্যে করুণাময় ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতেছে আর তাহাদের কল্পনায় পুরাতন স্নেহময় মৃৎপৃথিবীর গৃহদ্বার ধূলিকণার স্মৃতি উদ্‌ভাসিত হইতেছে। নক্ষত্রশশীলুপ্ত নীরন্ধ্র অন্ধকারে কোথাও কোনো পরিচিত মুখ বা দৃশ্য নাই—চতুর্দিকে কেবলই যেন এক বীভৎস পিশাচীর দ্রংষ্ট্রাকরাল মুখব্যাদান! হঠাৎ তরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল—আর্তকাতর সমবেত চীৎকারে যাত্রীদের মধ্যে করুণ ত্রাসের চঞ্চলতা জাগিল। বাঁচিবার অন্তিম আকুতি জাগিতে জাগিতেই আটশত আর্ত ক্রন্দমান অভিশপ্ত যাত্রীর সলিল সমাধি ঘটিল। সহসা একটি বাতাসে যেন আটশত প্রদীপ নিভিয়া গেল, সেই সঙ্গে নিভিল আরও শত শত গৃহের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশার আনন্দ। অতগুলি মানুষের তরুণ সুন্দর সুকুমার জীবন নির্মমভাবে গ্রাস করিয়া জড় সমুদ্রের কোনোই বিকার বা ভাবান্তর দেখা গেল না। ইহাই 'সিন্ধুতরঙ্গে' বর্ণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা।

**প্রশ্ন ২। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় কবি সমুদ্রকে 'জড়ের বিলাস' বলিয়াছেন কেন? কবিতাটি অবলম্বন করিয়া এই জড়ের বিলাসের যে বস্তুময় বিবরণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।**

**উত্তর।** পূর্বপ্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ৩। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় বর্ণিত নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতির একটি বিবরণ দাও। এই জড় প্রকৃতিকেই কি শেষ পর্যন্ত সত্য বলিয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন?**

**উত্তর।** প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সহিত আলোচনার অংশ যোগ কর।

**প্রশ্ন ৪। 'এ নিষ্ঠুর জড় স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে**
**মানবের প্রাণে—'**
**'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতা অবলম্বনে এই ভাবটির ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

# সুরদাসের প্রার্থনা

## ভূমিকা

'সুরদাসের প্রার্থনা' মানসীর বিশিষ্ট প্রেম কবিতা। মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় তাঁহার ব্যক্তিগত কবিচিত্তের প্রেমভাবনার যে স্বরূপ রক্ষা করিয়াছেন, এই কবিতায় তাহারই ভাষ্য পাওয়া যায়। নারীকে ব্যক্তিকামনার সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া 'সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রানী' করিয়া তোলার কবিবাসনাই আলোচ্য কবিতায় সুরদাস নামক জনৈক প্রাচীন কবির জবানিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই কবিতার সুরদাস রবীন্দ্রনাথই ; সুরদাসের নাম ও জীবন-সংক্রান্ত ক্ষীণ ঘটনার সংকেত গ্রহণ করিয়া কবি আপন অন্তরের সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব, real-ideal-এর সংঘাতটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তথাপি কবি সুরদাসকেই কেন গ্রহণ করিলেন, এবং সুরদাসের ঐতিহাসিক পরিচয় কী এই সম্পর্কে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়।

সুরদাসের জবানীতে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তের কথা

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জনৈক ভক্তকবি, সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত সুরদাস সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কোন কোন লোক-প্রসিদ্ধিমতে তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তাঁহার সম্পর্কে হিন্দী নবরত্নে প্রাপ্ত সংবাদ হইল, তিনি যৌবনে এক যুবতীর প্রতি মোহান্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দুষ্ট নেত্রদ্বয়কে শলাকাবিদ্ধ করেন এবং ঐভাবে অন্ধ ভক্তকবিতে পরিণত হন। ভক্তমাল গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত ভক্তকবি বিল্বমঙ্গল সম্পর্কেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনিও জনৈক বণিকপত্নীর প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়া আপন নয়নদুটিকে কণ্টকবিদ্ধ করেন এবং শেষে কৃষ্ণকৃপা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সুরদাসের কাহিনী কোথা হইতে পাইয়াছিলেন জানিনা, তবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত বিল্বমঙ্গল নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা' লিখিবার চারমাস পরেই রচিত ও অভিনীত হয়। সুরদাস ও বিল্বমঙ্গল দুই সাধকের জীবনে একই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এইরূপ সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। অথচ

সুরদাসের লোক-প্রসিদ্ধিগত কাহিনী

দুই কাহিনীই কিংবদন্তী আকারে প্রচলিত। এমন কি, সুরদাস বলিতে এখনও অন্ধকেই বুঝাইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার পর কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, ভক্তমাল হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে, সুরদাসের উক্ত কাহিনীর সহিত ইঁহার কী বিস্ময়কর একরূপতা—

বিল্বমঙ্গলের জীবনের অনুরূপ কাহিনী

আরে মূঢ় চক্ষু কী দেখিয়া ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কী ধন পাইয়াছ॥
রক্তমাংস-ক্লেদ বিষ্ঠা-মূত্রাময় দেহ।
ত্বক আচ্ছাদন-মাত্র দরশ-সুবহ॥
নির্ঘৃণ্য তোমার মতি এহেন কদর্য।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুজ্য॥
ধিক ধিক আরে দুষ্ট অসত ইন্দ্রিয়।
মম বিড়ম্বন মোরে না কর অস্থিয়॥
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ॥
এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা॥
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে॥

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাতেও সুরদাসের স্বকৃত অনুতাপ আঁখির রূপমোহের জন্যই, কবিতার পূর্বনামও ছিল 'আঁখির অপরাধ'। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সুরদাস দেবীকেই অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করিয়া দিবার জন্য—

বিল্বমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথের সুরদাস

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাত-রশ্মিসম ;
লও বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম !

বিল্বমঙ্গল কাহিনীতে অন্ধ বিল্বমঙ্গল বহির্জগতের দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হইলেও নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তের গভীর ভক্তিপ্রীতির গুণে তিনি যে নূতন অন্তরিন্দ্রিয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা বৃন্দাবনের লীলাময় শ্রীহরি নবীন নটশেখররূপে তাঁহার কাছে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—

অন্তর্দৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যা

কৃষ্ণ ভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত।
যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ়ব্রত ॥
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগ চক্ষু যার কী করে নয়ানে ॥

তারপর বৃন্দাবনে অন্ধ বিল্বমঙ্গল কিশোর গোপালকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন—

তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সুধাময় করাম্বুজ
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই দিব্যময় হইল তেঁই
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা ॥
সম্মুখে রূপের রাশি নিন্দিয়া অসংখ্য শশী
হেরি অচেতন পড়ে ভূমে!
পুলকাশ্রু আদি করি অষ্ট অনুভাব ভরি
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে ॥···

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাতেও রূপব্যাকুল মোহান্ধ সুরদাসের কাতর ক্রন্দনে হরিগানহীনতার বেদনা ছিল। শেষ পর্যন্ত দেবীর জ্যোতির্ময় স্বরূপ অন্তর্লোকে দর্শন করিয়া সুরদাস বলিয়াছেন, "তোমাতে হেরিব আমার দেবতা হেরিব আমার হরি!"

বিল্বমঙ্গল বা সুরদাস যে কাহিনী অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ 'সুরদাসের প্রার্থনা' রচনা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত এ কাহিনী ও আবেদন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিচেতনার সহিত একীভূত হইয়া গেছে। এই কবিতা যেন 'নিষ্ফল কামনা'র পরবর্তী অনুচ্ছেদ। যে নারীদেহের দিকে তাকাইয়া কবি একদা সকাতর নৈষ্ফল্যে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা', যাহার নয়নের নিবিড় তিমিরতলে আত্মার রহস্য-শিখা খুঁজিতে চাহিয়াছিলেন, সেই নারীই সুরদাসের দেবী। অনলভরা দুরন্ত বাসনার দ্বারা সেই নারীর সহিত প্রেমের

নিষ্ফল কামনার পরবর্তী অংশ

সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, ইহা অনুভব করার পর কবি আপনার রূপাসক্ত বহিরিন্দ্রিয়কে ভৎর্সিত করিয়াছেন এবং দৃষ্টির বাহির-দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ভিতর দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন বাহিরের দৃষ্টিবাতায়ন বন্ধ করিলে নারীসৌন্দর্যের সহিত বিশ্বসৌন্দর্যও অপগত হইবে। কিন্তু কিছুই হারাইল না। ধীরে ধীরে অন্তরের বিশুদ্ধ নিষ্কাম দৃষ্টি দিয়া বস্তুর সৌন্দর্যরূপ তাঁহার কাছে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বহির্বিশ্বে যে নারী ছিল প্রেমের পাত্রী অন্তরে সেই পরিণত ছিল দেবীতে; যাহা ছিল স্থানিক তাহা শাশ্বত হইয়া গেল। এইভাবে প্রেম সৌন্দর্য নারী প্রকৃতি সবই ঊর্ধ্বায়িত হইল, বস্তুর সীমা হইতে অলৌকিক অসীম চিরন্তনত্বে অধিষ্ঠিত হইল। নারীর বস্তুরূপ দর্শনে বাসনা ছিল, অতৃপ্তি ছিল, অনুতাপ ছিল। এখন—

বাসনামলিন আঁখি-কলঙ্ক,
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।

## ভাবার্থ

ভক্তকবি সুরদাসের জবানিতে কবি তাহার প্রেমাস্পদা রমণীর প্রতি কামগন্ধময় দৃষ্টিদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। নিষ্কলুষ দৈবীমহিমায় উদ্ভাসিতা পবিত্র সতীর প্রতি মোহাতুর দৃষ্টিদানের জন্য অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া কবি তাহার নিকট বেদনা-বিক্ষত চিত্তে এক ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। লক্ষ্মী ও শক্তিস্বরূপিণী দেবীর মানবিক করুণা কবিকে পাপমুক্ত করুক, দেবীর পূত চরিত্রমাহাত্ম্য কবির কামবাষ্প দূর করিয়া দিক, ইহাই কবির প্রার্থনা।

( প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক )

আজ আনন্দময়ী স্বর্গমূরতি দেবীর নিকট সুরদাস অসংকুচিত চিত্তে তাঁহার গহন হৃদয়ের লজ্জাতুর অপরাধের স্বীকৃতি জানাইতে চাহেন। দেবীর নয়ন-সম্পাত আজ তাঁহাকে নিষিদ্ধ বাসনায় রোমাঞ্চিত করিবে না, বরং বজ্রতুল্য নিষেধে সতর্ক করিয়া দিবে। পাপদৃষ্টি দিয়া এই দেবীকেই তিনি কামনা-সামগ্রীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই কলুষিত বাসনা না জানি দেবীর দর্পণস্বচ্ছ হৃদয়ে কত বিষাক্ত নিশ্বাসের আবিলতা আঁকিয়া দিয়াছিল। না জানি কবির মোহগ্রস্ত লালসা দেবীকেই লজ্জিতা করিয়া তুলিয়াছিল।

এখন কবির মোহ বিদূরিত হইয়াছে, পূর্বতন লোভাতুর দৃষ্টির অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন। তাঁহার চিদ্‌গহনে যে কামনাদৃষ্টির উৎস, তাহাকে নির্মূল করিবার জন্য তীক্ষ্ণ ছুরিকা আনিয়া তুলিয়া দিলেন দেবীর করকমলে। দেহ হইতে রূপেন্দ্রিয়কে উৎপাটিত করিয়া দেবী তাঁহার ভক্তের রূপ-কামনাকে চিরনির্মূল করুন, ইহাই কবি সুরদাসের প্রার্থনা। ( তৃতীয় হইতে পঞ্চম স্তবক )

সুরদাস কেবল দেবীর দেহরূপের প্রতিই মোহান্ধ হন নাই, তাঁহার রূপদিদৃক্ষা দৃশ্যমান প্রকৃতিতেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। নীলিমাচ্ছন্ন শ্যামল বিশ্বনিসর্গ, কল্লোলিনী নদী, সায়াহ্নমেঘের বর্ণপরিবর্তন, নক্ষত্রখচিত রাত্রি, নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবী, রক্তসূর্যোদয়ে স্বর্ণাভ দিগন্তগিরি, বর্ষা-শরৎ-বসন্তের সমারোহ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে উদ্‌ভাসিত এই প্রাকৃত শোভাশ্রীর উপর আজ কবি কালিমা লিপ্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রাকৃত-সৌন্দর্যের মদির আকর্ষণে কবি বারবার দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার সারস্বত সৃষ্টি এই সৌন্দর্যমোহে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। পুষ্পসুরভিত বসন্ত বায়ু, নীলকান্ত আকাশ, প্রস্ফুটিত কুসুম, বিতত জ্যোৎস্নাপ্রবাহ কবিকে বিহ্বল করিয়া তোলে। সৌন্দর্যমায়া কল্পমূরতি ধারণ করিয়া কবিকে নেশাগ্রস্ত করিয়া রাখে, তাঁহার ভক্তিপ্রণত চিত্তকে তৃষ্ণাতুর করিয়া তোলে। সেই ভক্তিহীন রূপসৌন্দর্যের পিপাসাই প্রকৃতির পট হইতে স্থানান্তরিত হইয়া নারীসৌন্দর্যের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। আজ দৃষ্টির উৎস লোপ করিয়া সুরদাস তাঁহার সকল রূপতৃষ্ণাকে চিরউৎপাটিত করিতে চাহেন।

( ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবক )

সুরদাসের বাসনাকলুষ যে চিত্তে দেবতুল্যা নারীর রূপ প্রবেশ করিয়াছে, সেই চিত্ত হইতে দেবীমূর্তিকে অপসারিত করিলে ইন্দ্রিয়ের বিলোপ সাধন প্রয়োজন। আবার ইন্দ্রিয়ের বিলুপ্তি ঘটিলে বহির্জগতের সৌন্দর্যও চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন এক আলোকহীন অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে সুরদাস নির্বাসিত হইবেন। ( অষ্টম ও নবম স্তবক )

কিন্তু এই চিত্তগত আলোকহীনতা চিরন্তন হইবে না, ইহাই কবি সুরদাসের সান্ত্বনা। ক্রমে বহির্জগতের সৌন্দর্য ইন্দ্রিয় হইতে মুছিয়া গেলে হৃদয়ের তামস-পটে আর একটি সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে, যাহা বিশুদ্ধ, আদর্শায়িত ও অলৌকিক। আজ দেবীমূর্তিকে কবি যেরূপে দেখিতেছেন, অন্তরে তাহাকে সেইরূপেই দেখিবেন, কিন্তু তখন দেবী মূর্তিময়ী জ্যোতির্ময়তায়

পরিণত হইয়া যাইবেন, নিসর্গ-সৌন্দর্য বিশুদ্ধ হইয়া দেবীকে সম্পূর্ণ করিয়া নির্মাণ করিবে। অন্ধকারের অন্তরে উৎসারিত আলোকরশ্মির মত কবির হৃদয়াকাশে জাগিয়া থাকিবে সেই প্রতিমা, যাহার সহিত লৌকিক জগতের কোনো বাসনার বন্ধন নাই। বহির্জগতের অনুকরণে অন্তর্জগতে আর একটি নিসর্গশোভাও কল্পিত হইবে, অথচ যাহা লৌকিক কালচেতনার দ্বারা খণ্ডিত হইবে না। এইভাবেই কবি আপাতদৃষ্টিতে বাসনামুগ্ধ দৃষ্টি রুদ্ধ করিলেও তাঁহার প্রীতির পাত্রী নারী এবং সৌন্দর্যের অবলম্বন প্রকৃতিকে অন্তর্লোকে ঊর্ধ্বায়িত ও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে চাহিলেন। প্রেমকে অসীমে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে অনন্ত মহিমা দান করিতে, প্রেমিকাকে জীবন-দেবতায় পরিণত করিতে, প্রেমকে পূজায় রূপান্তরিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাই সুরদাসের প্রার্থনা। ( দশম ও একাদশ স্তবক )

**আলোচনা**

মানসীর বিশিষ্ট কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা' সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নাই। এখনও পর্যন্ত কবিতাটির রহস্য স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। এ কবিতায় সুরদাস রূপক মাত্র। সুরদাসের নামে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু বলিতে চাহিয়াছেন মনে হয়। অবশ্য তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সকলের কাছে স্পষ্ট হয় নাই। কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন,

বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য

"কবিতাটিতে প্রেম যে সমস্ত হরণ করিয়া একটি মূর্তির মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া গেছে সেই মূর্তির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

মন্তব্যটির মধ্যে বিশ্লেষণ নাই, অতি সংক্ষিপ্ত এই বাক্যে কবিতাটির বেদনা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত একটু বিস্তৃত। তিনি লিখিয়াছেন,

অজিতকুমার চক্রবর্তী

"কবি সৌন্দর্যের উপাসক। সকল সৌন্দর্যের সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়ে লিখিত ললামভূত সৌন্দর্য হইতেছে নারীর। কবির হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে প্রথম জাগ্রত করেন নারী। সৌন্দর্য-পূজার প্রথম হোমশিখা প্রদীপ্ত করেন নারী, মুকুলিত কবিত্ব প্রস্ফুটিত করেন নারী। কিন্তু কবিপ্রাণের অন্তরের তৃষ্ণা মূর্তির সীমায় কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না। তাঁহার চিত্ত মূর্ত ও অমূর্ত সৌন্দর্যসম্ভোগের দ্বন্দ্বে ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে থাকে। এখনও কবির

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানস-সুন্দরী উর্বশী তাঁহার হৃদয় সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত হন নাই; তাই কামনার কলুষ মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে এবং তাহাতে কবিচিত্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। কবি প্রার্থনা করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়াসক্তি খর্ব হউক এবং বড় হউক মন। প্রেম বিশ্ববস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটি মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পণ্ড হইতে চলিয়াছে, এই নিষ্ফলতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। মূর্ত সসীম সৌন্দর্য ছাড়িয়া তাহার অতীত absolute beauty and purity পাইবার জন্য কবির আকুল আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।"

মোহিতলাল

মোহিতলাল মজুমদার কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মগত দেহশুচিতা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। মোটামুটি দেখা যাইতেছে, দেহকামনার মধ্যে উপলব্ধ অস্থিরতা ও নৈরাশ্য দিয়া কবিতাটির সূচনা এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সান্ত্বনায় কবিতাটির সমাপ্তি।

প্রিয়নাথ সেন

রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ সমালোচক প্রিয়নাথ সেন লিখিয়াছিলেন,

"সুরদাসের প্রার্থনায় সৌন্দর্যবিধুর প্রেমবিহ্বল কবিহৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এমন হৃদয়-বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন ব্রাউনিং ও শেলি একত্র মিলিত হইয়াছে।"

শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সমালোচক ডক্টর শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়-কামনার ম্লানস্পর্শ থেকে মুক্তিলাভ করে, নিখিল-শোভার মায়াপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলোকমগন মূরতিভুবন পরিহার করে, অন্তরের বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে দেবী প্রতিমাকে অবলোকন করার সুগভীর আকুলতা স্তবকে স্তবকে পরিকীর্ণ হল 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়। অদূরে দেখব 'ধ্যান' কবিতায় যখন মানসীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন বিশ্ববিহীন বিজনে বসেই কবি তাকে বরণ করবেন, প্রকৃতির মূরতি-ভুবনের মাঝে নয়। পুনরুক্তি প্রয়োজন যে, মানসী কাব্য একটি স্তরে পৌঁছে বিরোধ আনল প্রকৃতিলোক ও সৌন্দর্য কল্পনার মধ্যে। সে বিরোধ সাময়িক, কিন্তু একান্ত সত্য। হয়ত শ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত মনকে শান্তি দেওয়ার জন্য, ছুঁয়ে যাওয়া মিলিয়ে-যাওয়া মানসী মূর্তিকে সমাহিত চিত্তে উপলব্ধি করার জন্য, ধ্যান-প্রতিমাকে অচঞ্চল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ক্ষণকালের বিরোধ

ও বিচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নিখিলের অন্তর্মাধুর্যের বিরাট প্রতীক হয়ে যে কল্পনা আবির্ভূত হবে উত্তর কাব্যে, চরাচরে ব্যাপ্ত হবে যে দিব্য প্রতিমা অদূর ভবিষ্যতে, সে কল্পনার এ সাময়িক বিরুদ্ধতাও অত্যন্ত কৌতুকাবহ বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য। মানসী কল্পনা হবে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় সত্তা। কিন্তু 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় মানসী-কল্পনা হল প্রকৃতি-বিমুখ—এ ঘটনা যেমন আকস্মিক তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন অভাবনীয় তেমনি অভিনব।"

মূল বক্তব্যসংক্ষেপ

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার সমালোচনার পূর্বে কবিতাটির মূল বক্তব্যবস্তুর সংক্ষিপ্ত সারটুকু গ্রহণ করা যাক—

১। সুরদাসের চিত্ত এক অসহ্য গ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে এবং এক পবিত্র, নির্মল, সতী নারীর প্রতি তাঁহার কলঙ্কিত কামনার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অশুচিতাবোধ করিতেছেন।

২। লক্ষ্মী ও শক্তিস্বরূপিণী সেই দেবী এখন তাঁহার দেবদুর্লভ করুণা ও পুণ্যপ্রভাবে ভক্তের মানস-পাপ বিদূরিত করুন, ইহাই কবির প্রার্থনা।

৩। সৌন্দর্যের সহিত ভয়মিশ্রিতা সেই দেবীর নিকট কবি তাঁহার পাপ-চেতনার ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিলেন।

৪। কবির আশঙ্কা, সুরদাসের দৃষ্টিতে যে কামকলুষতা ছিল তাহা দেবীর নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার নির্মল স্বচ্ছ নিষ্পাপ হৃদয়ে এই মোহ-আবিলতার বাষ্প প্রবেশ করিয়াছিল। না জানি দেবী কতই লজ্জিতা হইয়াছিলেন।

৫। এই কামনার উৎস নির্মূল করিতে কৃতসংকল্প কবি শাণিত ছুরিকা আনিয়া দেবীর হাতে দিতে চান। রূপতৃষ্ণার অপরাধে অভিযুক্ত কবির দৃষ্টি দুইটিকে দেবী যেন স্বয়ং উৎপাটিত করিয়া দেন।

৬। কবির রূপতৃষ্ণার ইতিহাস—এই সৌন্দর্যমেখলা প্রকৃতি চিরকালই কবিকে বিচিত্র রূপমাধুরীর দ্বারা মুগ্ধ ও বিহ্বল করিয়াছে, মায়াময়ী ছায়াময়ী কল্পমূরতি কবিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। অথচ তাহারা কবিকে উত্তরোত্তর রূপতৃষ্ণ করিয়াছে মাত্র, তৃপ্তি দিতে পারে নাই। সেই অতৃপ্ত রূপকাতরতা প্রশমিত করিতেই কবি আসিয়াছিলেন দেবীর দেহসৌন্দর্যের নিকট।

৭। কিন্তু দেবীর নিকট আসিয়া রূপতৃষ্ণা তো মিটিলই না, পরন্তু তাহা ইন্দ্রিয়কামনা হইয়া পড়িল।

৮। এখন কবি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান। যাবতীয় সৌন্দর্য, নারী কিংবা প্রকৃতি, দেবী অথবা বহির্ভুবন, সব কিছু হইতেই দৃষ্টিনির্বাসন প্রার্থনা করিতেছেন। মূর্তিহীন সীমাহীন অন্ধকারে কবি নিঃসঙ্গ অবস্থান করিবেন।

৯। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়দৃষ্টি অপসারণের ফল হইবে আশ্চর্যজনক। বাহিরের জগৎ কবির মনের মধ্যে আর একটি জগৎ হইয়া উঠিবে।

১০। এই মানসলোকে সেই দেবীমূর্তি আরও পবিত্র হইয়া উদ্‌ভাসিত হইবেন, ইহার সহিত প্রকৃতিও মধুর এবং চিরন্তন হইয়া বিরাজ করিবে। মানসলোকের মূর্তি ও প্রকৃতি বলিয়া এই অন্তর্দৃষ্টিতে কোনো বাসনা থাকিবে না। ইহাই হইবে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ নিষ্কাম সৌন্দর্যদর্শন।

১১। অন্তরে কামনাহীন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত এই দেবীর মধ্যেই কবি তাঁহার দেবতাকে পাইবেন।

এই বস্তু-সংক্ষেপের মধ্য দিয়া কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। যথা, (ক) সুরদাস বা কবি সৌন্দর্য-প্রেমিক; (খ) তিনি প্রেমাস্পদাকে নিষ্কামভাবে দেবীরূপে মানস-লোকে পাইতে চাহেন; (গ) প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যকে তিনি খণ্ডকাল হইতে অসীম কালে রূপান্তরিত করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন। এখন এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারে।

মূল ভাব তিনটি

একথা প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে, কবিতাটি সুরদাসের কণ্ঠে মানসীর কবি রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিচিত্তের অভিপ্রকাশ। সুরদাস নারী-রূপ-সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আপন দৃষ্টিদ্বয় আক্ষরিক অর্থে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর আভাসটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারও কবি-জীবনের উন্মেষপর্বে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কবিতাটি শেষ পর্যন্ত সুরদাসের আখ্যায়িকাতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। সুরদাস হরিভক্ত ছিলেন এবং হরিনামাবলী গান গাহিতেন, এইরূপ উল্লেখও কবিতাটির মধ্যে আছে। তথাপি ইহাকে সামগ্রিকভাবে সুরদাসের কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমত, 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কবি যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই কবিতা ছাড়া মানসীর অন্যান্য কবিতাতেও আছে বলিয়া সব মিলিয়াই কবিতাটির বিচার করিতে হইবে। দেহভোগের

সুরদাস কি রবীন্দ্রনাথ?

ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়জ কামনার অসারতা, তনুশোভা হইতে রূপকে নির্বাসিত করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা ইতিপূর্বে একাধিক কবিতায় দেখা গিয়াছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' তাহারই ভাষ্যমাত্র।

সুরদাসের দিক হইতে গ্রহণের সমস্যা

দ্বিতীয়ত, এই কবিতায় কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের প্রতি যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা আধুনিক রোমান্টিক কবিমনেরই বৈশিষ্ট্য—তাহা সুরদাসের জীবনের সহিত নিঃসম্পর্কিত। সপ্তম স্তবকে যে প্রাকৃত সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হইয়াছে, কবি তাহার প্রতি অনীহা প্রকাশ করিলেও সেই বর্ণনা মানসীর কবির পক্ষেই সম্ভব। তৃতীয়ত, অষ্টম স্তবকে কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যে আত্মমুগ্ধ হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যজীবনের কথাই মনে করাইয়া দেয়। চতুর্থত, বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধারে ধীরে ধীরে কবি যে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ধ্যানমূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগীয় ভক্ত কবির পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। সুরদাস নয়ন বিদ্ধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নারীদেহাসক্তি হইতে তাঁহার মোহকে শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থানান্তরিত করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় সুরদাস আরও স্পর্ধার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দেবীকে দৃষ্টি হইতে সরাইয়া অন্তরে দৃঢ়মূল করিয়াছেন। দেবী অপসারিত হয় নাই, কেবল কামনার দৃষ্টিভঙ্গি বদল হইয়াছে মাত্র। বাসনার দৃষ্টিতে না দেখিয়া কবি সৌন্দর্যের নিষ্কাম দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সীমার দৃষ্টি হইতে অসীমের দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে, দেবীকে কবি চিরকালের মত পাইয়াছেন—

> সে-নব জগতে কাল-স্রোত নাই
> পরিবর্তন নাহি,
> আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
> চিরদিন রবে চাহি।

এই দেবীর মধ্যে কবি তাঁহার দেবতাকে, তাঁহার হরিকে পাইয়াছেন।

সুরদাসের হরি

হরি শব্দটি সুরদাসের নামের সহিত অনুষঙ্গে জড়িত বলিয়াই ব্যবহৃত। আসল কথা হইল, দেবীই কবির দেবতা, কবির জীবনের দেবতা=জীবন-দেবতা। অর্থাৎ কবির প্রেম ঊর্ধ্বায়িত হইয়া হইল পূজা, 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। ইহা কি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য নয়?

এখন প্রশ্ন হইল, এই দেবী কে? কোন্ বিশেষ নারী সুরদাসের জীবনে আসিয়াছিল, তাঁহাকে মোহের কূপে ডুবাইয়া আবার মুক্তির তীর্থে উপনীত করিয়াছিল, তাহার নাম না জানা থাকিলেও সুরদাসের মোহমুক্তির কাহিনীর পবিত্রতা যেমন বিচলিত হয় না, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেই একই বক্তব্য। সুতরাং প্রশ্ন এই নয় যে, তাঁহার নাম কী? প্রশ্ন এই যে, তাঁহার স্বরূপ কী? মানসীর গোড়া হইতেই দেখা যাইতেছে, কবি দেহোপভোগে ক্লান্ত, রূপকামনার ইন্দ্রিয়ানুভবে বিষণ্ণ, রূপের গভীরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র, বস্তু হইতে ভাবটিকে, আকাশ হইতে নীলিমাকে, নয়ন হইতে আত্মার রহস্য শিখাটিকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। আবার কয়েকটি কবিতায় দেখিতে পাইতেছি, কবি একটি মানস-প্রণয়িণীর ধ্যান-মূর্তি রচনা করিতেছেন। 'নিভৃত আশ্রম' কবিতায় কবি লোকালয়ের মধ্যে থাকিয়াও আপনার চারিপাশে একটি তপোনিশ্চল নির্জনতা রচনা করিবেন—

এই দেবীর স্বরূপ

নিভৃত আশ্রম কবিতার সহিত তুলনা

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতি
স্থাপন করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।

শেষের চরণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রেমের প্রদীপ লইয়া কবি আরাধ্যের আরতি করিবেন। এই যে রতি হইতে আরতিতে উত্তরণ, ইহা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতিই সুরদাসের দেবী, তাই

প্রেমের পূজায় রূপান্তর

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি।

'সুরদাসের প্রার্থনা'য় 'বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার' যে চিরকাল থাকিবে না, তাহারই ভিতর দিয়া একটি পবিত্র প্রতিমার অভ্যুদয় ঘটিবে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কবি 'চিরনিশিদিন অন্ধহৃদয়ে' তাহাকে দেখিতে পাইবেন. তাহারই আলোকে 'অনন্ত বিভাবরী' জাগিয়া থাকিবেন। এই কথারই পুনরুক্তি ঘটিল 'ধ্যান' কবিতায়—

'ধ্যান' কবিতা

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ
হরণ করি।

ইহাও নিতান্ত সাধারণ প্রেম কবিতা নয়। কবি যেমন তাহার প্রেয়সার সীমা পান না, আপনার প্রেমেরও তুলনা পান না। কী করিয়া পাইবেন ? 'নিষ্ফল কামনা'র যুগে সংশয় ছিল—'আছে কি অনন্ত প্রেম' ? তখন ছিল না, কিন্তু এখন আছে। তাই কবির দৃষ্টি অসীম অগাধ অপার হইয়াছে। তাই কবি ও কবিপ্রিয়ার সম্পর্কে এখন একটি বিস্ময়কর বিশ্বভৌম ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।

সুরদাসের দেবী, কবির নিকট দেবতা হইয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সোনার তরী' 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের আপন প্রেম কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাহা হইল সেই বিখ্যাত উক্তি, দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা। চৈতালির একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন, 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা' (পুণ্যের হিসাব)। পঞ্চভূতের একটি প্রবন্ধে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কবি বলিয়াছেন, আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা। সুতরাং ইহাই কবির বিশ্বাস, নারীকে অসীমে স্থাপন করিয়া অনন্ত প্রেমের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে। সেই দেখায় সংকীর্ণ কামনা দগ্ধ হইবে, ইন্দ্রিয়জ মোহ ও উপভুক্ত গ্লানি অপসারিত হইবে, পার্থিব নশ্বর ক্ষুধার যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে। তখন প্রেমিকাকে ইন্দ্রিয় হইতে অন্তরে, দেহ হইতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে, মৃন্ময় অস্তিত্ব হইতে দেবতায় রূপান্তরিত করিয়া

সোনার তরীর 'বৈষ্ণব কবিতা'

লওয়া হইবে। ইহাই 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার বক্তব্য। সুতরাং 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রেমের কবিতা মাত্র, সুরদাসের জবানিতে কবি তাঁহার পবিত্র নিষ্কলুষ, অনন্ত প্রেমের স্বরূপ রচনা করিয়াছেন। এই দেবী সুরদাসের মানস-সুন্দরী, সুরদাসের ভক্তি ও প্রীতির আশ্রয়স্থল।

প্রেমের কবিতা

তবে কবিতাটির মধ্যে একটি দ্বিধাও আছে। সুরদাসের জবানিতে কবিতা রচনা করাই এই দ্বিধার কারণ। সুরদাসের ভূমিকায় ইহা মিলিতে পারে নাই। সুরদাস নামের সহিত সংগতি রক্ষা করিতে গিয়া কবি সর্বত্র সার্থক হন নাই, ব্যক্তিচিত্তের বিলাপ-আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পাইয়া গিয়াছে। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্য-মুগ্ধ, তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। কিন্তু প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও প্রেয়সীর মধ্যে যেন একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে। অপার ভুবন, উদার গগন, স্বচ্ছ মুরতি বসন্ত, বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র, গ্রহতারাময়ী নিশি—ইহারা কবিকে ভুলাইয়া দিয়াছে। যেন ইহাদের মদির রূপের অন্ধ অতৃপ্ত আকর্ষণেই কবি নারীকে কামনা দিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ মন্তব্যের হেতু নাই। নারীরূপ কামনা হইতে নির্বাসিত হইলে যে নিখিলের শোভা আঁধারে মিশাইবে, এই বেদনা কবিকে বিচলিত করিয়াছে। নিখিলের নিসর্গ শোভার প্রতি তন্ময় হইয়া বাঁশরিতে সুর বাজাইয়া তোলা এমন কিছু অপরাধজনক নয়। ইহারা যে লক্ষ্মীরই ছায়া—তাই মানসলোকে প্রকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। অন্তরে যখন অনলরেখায় নূতনভাবে দেবীমূর্তির স্থাপনা ঘটিল, তখন প্রকৃতিও রূপান্তরিত হইয়া সেখানে দেখা দিল। কিন্তু সত্যই কি খুব বেশি রূপান্তরিত হইল? কেবল বাস্তব নিসর্গে কালচিহ্ন ছিল, এখন সেখানে কালখণ্ডের পরিচয় লুপ্ত হইল। কিন্তু রহিল তো সবই—এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযূর রেখা, কিছুই হারাইতে হইল না। এইভাবেই কী প্রেমের ক্ষেত্রে, কী প্রকৃতির ক্ষেত্রে কবি যে ক্রমশ সীমা হইতে অসীমে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহারই সংশয়ক্লিষ্ট যন্ত্রণাক্ত বিবর্তনের ইতিহাসটি 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় লিপিবদ্ধ রহিল। রবীন্দ্রনাথের প্লেটোনিক সৌন্দর্যচেতনার বিবর্তনের ইতিহাসে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটির ভূমিকা অসামান্য।

কবিতাটির দ্বিধা

প্লেটোনিক সৌন্দর্য-চেতনার বিবর্তন

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

( প্রথম স্তবক )

**ঢাকো ঢাকো……কবি সুরদাস**—কবিতার প্রথম ছত্রেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার মূল প্রসঙ্গ বক্তা ও উদ্দিষ্টের পরিচয় ও সম্পর্ক বুঝাইয়া দিয়াছেন। কবিতাটি সুরদাসের স্বগতকণ্ঠে অত্মসমালোচনা—মানসিক প্রায়চিত্তের বিধান। কবি সুরদাসের প্রাচীন কিংবদন্তীর কথা ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। সুরদাস কামকলুষ দৃষ্টিতে যে দেবীর দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন, সেই দেবীর কাছে আসিয়া তিনি আত্মউদ্‌ঘাটন করিতেছেন। তাঁহার অকপট আত্মস্বীকৃতির সহিত গ্লানি মিশ্রিত, দেবীর দৃষ্টিসম্মুখে তিনি আসিতে পারিতেছেন না। আপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আপন দৃষ্টিকে তিনি উৎপাটিত করিবেন কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ দেবী যেন সুরদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তাই তাঁহাকে বসনে মুখ আবৃত করার অনুরোধ। **দেবী আসিয়াছি……হইবে আশ**—সুরদাসের এই ভিক্ষা দেবীকে দিয়া আপন দৃষ্টি উন্মূলনের, ইহা পরবর্তী স্তবকে কথিত হইয়াছে। **অতি অসহন……করিছে গ্রাস**—সুরদাস ইন্দ্রিয়জ কামমোহে দগ্ধ হইতেছিলেন। পবিত্র নারীর প্রতি তিনি অসৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাই সেই আত্মগ্লানি দুঃসহ অগ্নির মত তাঁহার অন্তর প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করিতেছে। রাহু যেমন করিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করে, তেমনি করিয়া কামনার কলঙ্ক তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে, সেই বেদনায় তিনি ক্ষতবিক্ষত হইতেছেন। **পবিত্র তুমি… আমি অতি**—যে দেবীর প্রতি সুরদাস ইন্দ্রিয়াতুর মোহদৃষ্টি ফেলিয়াছিলেন, সেই দেবী লৌকিক কামকলুষতার উর্ধ্বে, তিনি পুণ্যবতী, সাধ্বী রমণী। সুতরাং তাঁহাকে বাসনার লোভাতুর নয়নে দেখা কবি সুরদাসের এক অনপনেয় কলঙ্ক বলিয়া সুরদাস আপনাকে অধম পামর পঙ্কিল ইত্যাদি বলিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন।

( দ্বিতীয় স্তবক )

**তুমিই লক্ষ্মী তুমিই শক্তি**—সুরদাস যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন তিনি লৌকিক নারী হইলেও সুরদাসের উর্ধ্বায়িত প্রেমে তিনি আজ দেবীতে পরিণত। ভারতীয় প্রেমসাধনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, প্রেমিকার মধ্যে দৈবশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা। চণ্ডীদাস

তাঁহার প্রণয়িণীকে বেদমাতা গায়ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সুরদাসও তাঁহার আরাধ্যা নারীকে লক্ষ্মীরূপিণী ও শক্তিরূপিণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। লক্ষ্মী সৌন্দর্য শ্রী ও সম্পদের প্রতীক আর শক্তি বীর্যের প্রতীক। **হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি**—যাহাকে আমরা ভালোবাসি তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের সন্ধান পাই, এই পরিচিত তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার বিশিষ্টতা। তাই নারীর নিকট তিনি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। **পাপের তিমির······পুণ্য-জ্যোতি**—নারীর মধ্যে আছে সেই মহান্ চারিত্র্যবল ও পুণ্যজ্যোতি যাহার প্রভাবে পুরুষের হীনতা, ইন্দ্রিয়জ মোহ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে বলিয়া কবি বিশ্বাস করিতেন। পরিণত বয়সে ·পত্রপুটের একটি কবিতায় ( ১৫ নং ; কবি তাঁহার প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভালোবাসার একটি ধারা 'মহাসমুদ্রের বিরাট-ইঙ্গিত-বাহিনী'। তাঁহার প্রেয়সী যেন মহীয়সী নারী, তাহারই অতল হইতে উঠিয়াছে। সেই প্রেয়সীর পরিচয়—

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে ;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

**দেবের করুণা······পাপীর কাজে**—কবি জানেন, তাঁহার·আরাধ্যা দেবীর হৃদয়ে আছে করুণাধারা, যাহা ঈশ্বরের দান। তাই সেই মূর্তিময়ী করুণারূপিণী এই তাপিত বিশ্বপৃথিবীকে শান্তি দান করিবে, যেমন পাপীর পাপক্ষলন করিবার জন্য মর্ত্য পৃথিবীতে স্বর্গনদী গঙ্গার অবতরণ ঘটিয়াছে।

( তৃতীয় স্তবক )

**ব্যাখ্যা—তোমারে কহিব······পলকে মিলায়ে যায়**—দেবীর নিকট সুরদাস এইবার অকপটে তাঁহার মোহমলিন বাসনা কালিমার ইতিহাস বিবৃত করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কবিতায় উদ্দিষ্ট নারীর সহিত সুরদাসের সম্পর্ক স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই, তবে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত এবং

সুরদাস সামান্য ভক্তমাত্র। হয়ত সেই দেবী ছিলেন কবি সুরদাসের গুণমুগ্ধ। আর তাহার অকৃপণ প্রশংসাকেই প্রেম মনে করিয়া সুরদাস ধীরে ধীরে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, রূপমুগ্ধ ভক্ত ধীরে ধীরে কামমুগ্ধ পুরুষে পরিণত হইয়াছেন। পবিত্রচরিত্র সাধ্বী রমণীর অজ্ঞাতসারে সুরদাস তাঁহার দেহমনে দুর্বহ ক্ষুধা জমাইয়া দিনগুলি রাতগুলিকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছেন। এইভাবে আপনার কর্কশ হীনমোহ সুরদাসকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, আপনাকে তিনি সংযত করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত এই মোহের বিবরণ অকপটে দেবীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই মোহের উৎস যে ইন্দ্রিয় তাহাকে নির্মূল করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন এবং তাই আজ দেবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজ তাঁহার মনে হইতেছে যথার্থ জ্যোতির্ময়ী যে দেবী, তাঁহার চরিত্রপ্রভায় সুরদাসের লজ্জাসংকোচ ঘুচিয়া যাইতেছে।

**ব্যাখ্যা—যেমন রয়েছ···নাহি কাজ**—দেবীর কাছে আত্মসমীক্ষা করিতে আসিয়া কবি সুরদাস প্রথমে লজ্জাসংকোচ অনুভব করিয়াছিলেন। অন্তরের পাপকথা দেবীর দৃষ্টিসম্মুখে ব্যক্ত করিবেন কিরূপে, ইহা ভাবিয়া দেবীকে নয়ন আবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন পাপকাহিনী কিছুটা আভাসে ব্যক্ত করিয়া কবি শান্তি পাইতেছেন। দেবীর চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁহাকে মোহ হইতে মুক্ত করিতেছে ও প্রেরণা দিতেছে বলিয়া দেবীর এখন আর মুখ আবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নতনেত্র কিরণসম্পাতে সুরদাস পরম তৃপ্তি ও পবিত্রতা অনুভব করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুরদাসের মনে হইতেছে যে কোনো স্বর্গীয় আনন্দ নারীরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত—তাঁহাকে কোনো মানবমোহ কামকলুষতাই স্পর্শ করিতে পারে না।

**ব্যাখ্যা—নিরখি তোমারে······যেন বাজ**—এক পরমারাধ্যা রমণীর প্রতি কবি সুরদাস চিত্তের দুর্বল মুহূর্তে আসক্ত হইয়াছিলেন। সেই দেবীর অগোচরে আপনার অন্তরে পাপবাসনা লালন করিয়াছিলেন। দেবীর পুণ্য চরিত্র সাধ্বী মহিমা ও নিষ্কলুষ সৌন্দর্যকে আপনার ইন্দ্রিয়জ কামনার দ্বারা আয়ত্ত করিবার অসম্ভব কল্পনা কিছুকালের জন্য তাঁহার কবিজীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুরদাসের বাস্তব সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে দেবীর নিকট প্রণতি নিবেদন করিয়া কবি অসংকুচিত চিত্তে তাঁহার পাপকাহিনী ও কলঙ্ক কথা বিবৃত করিতেছেন।

সুরদাস আজ দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে নির্দ্বন্দ্ব সংশয়লেশহীন ও মোহমুক্ত। নারী বাসনার সামগ্রী নয়, ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নয়, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। এই যে দেবীপ্রতিমা তাঁহার নতনেত্র কিরণসম্পাতে সুরদাসকে স্পর্শ করিতেছেন, তিনি নিষ্কলুষ সৌন্দর্য অকলঙ্ক চরিত্র ও পবিত্রতার প্রতীক। আজ তাহাব দৃষ্টিতে কবি দেখিলেন যুগপৎ মাধুর্য ও অগ্নি, সৌন্দর্য ও ভীষণতাকে। দেবতার করুণাই আনন্দরূপিণী এই নারীকে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা মনে করিলে এই নারীকে কখনই পার্থিব কামনার ক্রীতদাসী করার কথা কল্পনা করা যায় না। তাই সুরদাস তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্যের মধ্যে দেখিলেন একটি কঠিন পবিত্রতা। যথার্থ সৌন্দর্য কখনই ব্যক্তিগত ভোগবাসনার সম্পদ নয়, তাহাকে অশুচি হাতে স্পর্শ করিলেই দেবতার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিবে। সেই ক্রোধ সেই বজ্রতুল্য নিষেধ যেন দেবীর পরম রমণীয় সৌন্দর্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সুরদাস ইহা উপলব্ধি করিলেন। তাই আজ দেবীর সহিত তাহার নৈকট্য সত্ত্বেও মনে হইল দেবী কত দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব মানসিক অর্থাৎ বাসনা ও বাসনাহীনতার। (পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতা হইতে উদ্ধৃতাংশটি এখানে যোগ কর)।

( চতুর্থ স্তবক )

**জান নাকি আমি……মুখপানে চেয়ে**—সুরদাস ধীরে ধীরে দেবীর কাছে তাঁহার চরিত্রভ্রষ্টতার বিবরণ দিতেছেন। এই বিবরণের বিশিষ্টতা হইল ইহা কাব্যিক, সাধারণ জীবনের লাম্পট্যের সহিত ইহার তুলনা করা উচিত নয়। যে সুরদাসের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ এখানে আঁকিয়াছেন তিনি কবিপ্রেমিক ও ভক্ত। তাঁহার অপরাধ পবিত্রচরিতা নারীকে কামমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাধ ঐটুকুই—ইহার বেশি কিছুও তাঁহার পরিকল্পনা ছিল না, থাকিলে তাহা কবিতার বিষয় হইত না। দৃষ্টিতে কেন রূপতৃষ্ণা থাকিবে, ইহাই সুরদাসের অনুতপ্ত জিজ্ঞাসা। আতুর মুগ্ধচোখে কেন সে সৌন্দর্যসম্ভোগ করিবে? সৌন্দর্য গভীর উপলব্ধির বস্তু, তাহাকে লোলুপের মত দেখিতে নাই। তাই সুরদাস তাঁহার কামনার জন্য তাঁহার ইন্দ্রিয়জ মোহের জন্য তো আত্মজীবনকে ধিক্কার দেন নাই, দিয়াছেন কেবল আঁখিকে, রূপমোহের উৎস দুইটি দর্শনেন্দ্রিয়কে। এই জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইয়াছে দৃষ্টি-উৎপাটনের দ্বারা। সুরদাস

দেবীর মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই অপরাধ বড়ই সূক্ষ্ম, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার সহিত সম্যক পরিচয় না থাকিলে ইহার তাৎপর্য সাধারণের কাছে বোধগম্য হইবে না।

**বিমল হৃদয়····· রেখা-ছায়া ?**—দেবীর অজ্ঞাতসারেই সুরদাস তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সুরদাসের আশঙ্কা তাঁহার এই পাপদৃষ্টি দেবীর কাছে গোপন ছিল না। নিঃশ্বাসবাষ্পে যেমন দর্পণের উপর অস্পষ্টতার আচ্ছাদন পড়ে সুরদাসের বাসনার কলুষ-নিশ্বাসও তেমনি নির্মল স্বচ্ছ দর্পণতুল্য দেবীর হৃদয়ে কলুষ দাগ ফেলিয়াছিল। **ধরার কুয়াশা······উষার কায়া**—প্রভাতের বিমল অভ্যুদয় যেমন পৃথিবীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। **লজ্জা আসিয়া······লুব্ধ নয়ন হতে**—অর্থাৎ ভক্ত সুরদাসের দৃষ্টিতে ইতর লোভের পরিচয় পাইয়া দেবী কি কখনও লজ্জিত হইয়াছিলেন? সেই লজ্জা কি দেবীকে রাঙা বসনের মত আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? **মোহচঞ্চল······তোমার দৃষ্টিপথে ?**—সুরদাসের আশঙ্কা ও বিশ্বাস তাহার গোপন চিত্তের লুব্ধ কামনা দেবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না, সেই লালসাদৃষ্টি কালো ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিয়া দেবীর দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই আশঙ্কাকেই কবি প্রশ্নের আকারে রাখিয়াছেন।

( পঞ্চম স্তবক )

**আনিয়াছি ছুরি······রশ্মিসম**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথ লোপ করাই রূপলালসা উন্মূল করার একমাত্র উপায় বলিয়া সুরদাসের মনে হইয়াছে, তাই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়া সেই নয়ন উৎপাটন করিবার জন্য দেবীকে সেই শাণিত অস্ত্র দান করিলেন। ছুরিকার উল্লেখ সুরদাসের মূল কাহিনীতেই আছে, কিন্তু কবি এখানে সুকৌশলে এই ছুরিকার দ্বারা দৃষ্টি-উৎপাটনের দায়িত্ব দেবীর উপর অর্পণ করিয়াছেন। ছুরিকার তীক্ষ্ণতা প্রভাতের তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ মোহের কালিমা দূর করিবার জন্য চেতনার আলোক-রশ্মিরই প্রয়োজন। **বাসনাসঘন**—বাসনায় পরিপূর্ণ। **কালো নয়ন**—কালিমাময় মোহকাতর সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

**ব্যাখ্যা—এ আঁখি আমার······শুধু জলে**—রূপতৃষ্ণ সুরদাস তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্রীর দিকে বাসনাময় ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া অনুতপ্ত

হইয়াছেন এবং সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শাণিত ছুরিকার দ্বারা বহিরিন্দ্রিয় উৎপাটিত করিবার জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

রূপতৃষ্ণা একটি মানসিক প্রবৃত্তি হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। রূপমোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, তাই সুরদাস তাঁহার কামনাকলুষ 'বাসনাসঘন কালো নয়ন' ছুরিকা বিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মোহের উৎস সুরদাসেরই গভীর অন্তরে, তাই চিত্তের গভীর দাহই দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। কবি সুরদাস অন্তরে অন্তরে রূপমোহে তৃষ্ণাতুর, প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়জ লোলুপতা অগ্নির মত তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে, কোনোমতেই কবি সেই অনির্বাপ্য অগ্নিকে প্রশমিত করিতে পারেন নাই। দেহাভ্যন্তরস্থ সেই প্রচণ্ড দাহই তাঁহার বহির্নয়নের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়া কবি বহিরিন্দ্রিয়ের বাতায়ন রুদ্ধ করিয়াই সেই অন্তরদাহকে প্রমশিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। **তোমার লাগিয়া……তোমারই হোক**—সুরদাসের নয়ন যে দেবীর প্রতি কামমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধাবিত হইয়াছিল, সেই নয়ন উৎপাটিত করিয়া কবি দেবীর করেই সমর্পণ করিতে চাহেন। যাহার জন্য এই দৃষ্টির উৎকেন্দ্রিকতা, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দেবীর দ্বারাই সমাধা হোক, ইহাই কবির বক্তব্য। সুরদাস তাঁহার রূপদৃষ্টিকে দেবীর নিকট সমর্পিত করিতে চাহিতেছেন কেন? কারণ এই রূপমোহের জন্য কবি বা তাঁহার কোনো জন্মগত প্রকৃতি দায়ী নয়, দায়ী দেবীর রূপসৌন্দর্য। সুতরাং এই নবোপজাত রূপচেতনা রূপের পাত্রীর দ্বারাই সমাহিত হোক।

( ষষ্ঠ স্তবক )

**অপার ভুবন……নদীর জল**—আলোচ্য পংক্তিগুলিতে সুরদাসের প্রকৃতিপ্রিয়তা, নিসর্গসৌন্দর্য-মমতা ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সীমাহীন বিশ্বপৃথিবী, সুনীল অবাধ আকাশ, শ্যামকান্তি অরণ্য-কুঞ্জ, মধুর স্নিগ্ধ বসন্ত, প্রসন্নসলিলা নদী সুরদাসের কবিদৃষ্টিতে এই চিত্রগুলি এক এক করিয়া উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। **সন্ধ্যানীরদ**—সন্ধ্যাসূর্যের রশ্মিপাতে বর্ণোজ্জ্বল মেঘমালা। **গ্রহতারাময়ী নিশি**—অসংখ্য তারকাখচিত রাত্রি। **চকিত তড়িৎ……শুভ্রতনু**—বর্ষা ও বসন্ত আকাশের দুইটি মনোরম বর্ণনা। মাত্র একটি চিত্রে, সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে একটি ঋতুর মর্মরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রগুচ্ছেই

প্রকাশ পাইয়াছে। অবিরাম বর্ষাব্যাকুল অন্ধকারে চকিত বিদ্যুম্মালার রজতোদ্‌ভাস, বৃষ্টিবারিতে প্রদীপ্ত সূর্যালোকের ইন্দ্রধনুতে উল্লসিত হওয়া, শারদীয় জ্যোৎস্নারাত্রিতে শুভ্র কিরণের বিশ্বব্যাপ্ত বিকাশ—ইহাদের সৌন্দর্য কবির দৃষ্টিকে কতখানি আকুল বিহ্বল করিয়া দিয়াছে, কবি তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। **লও সব……চিত্রপটে**—যে দৃষ্টির দ্বারা সুরদাস দেবীর প্রতি কামনা-আবিল হইয়াছিলেন, সেই দৃষ্টিই তাঁহাকে বহির্জগতের পরিবর্তন রূপ গন্ধময় নিসর্গশোভা নিরীক্ষণ করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়জ মোহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কবি এই দৃষ্টিকে উৎপাটিত করিতে চাহেন। ইহার ফলে ভুবন-সৌন্দর্যও কবির নেত্র হইতে চিরতরে মুছিয়া যাইবে। অপার ভুবন, উদার গগন, সন্ধ্যায় মেঘমালার রঙবদল, গ্রহতারাময়ী নিশি, ঋতুরঙ্গ, কাননের শ্যামকান্তি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বিপুল সমারোহ সবই নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে। ইহা বেদনাদায়ক, কিন্তু রূপমোহ ততোধিক দুঃখকর। তাই শেষ পর্যন্ত নিসর্গ সৌন্দর্যলুপ্তির মূল্যেও সুরদাস তাঁহার কামান্ধ দৃষ্টিকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহেন।

( সপ্তম স্তবক )

**ইহারা আমাকে……পথ নাহি চেনে**—প্রকৃতিসৌন্দর্যই সুরদাসের রূপতৃষ্ণার মূলীভূত হেতু, ইহাই আলোচ্য পংক্তিগুলির বক্তব্য। বহির্জগতের সৌন্দর্য রমণীয়, কিন্তু তাহার পরিণাম অনির্দেশ্য। ইহাদের মাধুর্য অপরিসীম, কিন্তু সে মাধুর্য সুরার মত কবিকে নেশাগ্রস্ত করে, ফলে কবি শেষ পর্যন্ত দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহার তাৎপর্য হইল, সৌন্দর্য যদি পরিণামসুন্দর না হয়, তাহা যদি উদ্দেশ্যহীন ও মঙ্গলহীন হয় তবে তাহা মানবচিত্তকে কেবল বিভ্রান্তই করিবে। **সবে মিলে যেন……তান ছাড়ি**—বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য সুলভ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিদায়ক, তাহার কোনো পরিণাম নাই। সে সৌন্দর্য সুরদাসের সৌন্দর্যরসিক কবিচিত্তকে বিহ্বল করে, তাহার সারস্বত প্রেরণাকে অভিভূত করে এবং কবি সৌন্দর্যের বন্দনা গান গাহিতে থাকেন। এইভাবেই ভক্তকবি শেষ পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত আবেগে কেবল সৌন্দর্যের কবি হইয়া পড়েন। **আপন ললিত……সমীরণ**—সৌন্দর্যের আবিষ্ট কবি যে মধুর সংগীতে সৌন্দর্যের বন্দনা রচনা করেন তাহা কবিকে মুগ্ধ করে, তাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলিয়া তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া যান এবং বসন্তের পুষ্পসৌগন্ধ্য

তাঁহাকে ব্যাকুল করে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ রূপসৌন্দর্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলেই কলাকৈবল্যের ( art for art's sake ) সৃষ্টি হয়, সম্ভবত ইহাই কবির বক্তব্য। **আকাশ আমারে……শরীরে পশে**—নিসর্গসৌন্দর্য সুরদাসকে কী গভীর নিবিড় অনুরাগে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহার আশ্চর্য ভাষারূপ। আকাশের নীলিমা যেন বন্ধুর মত কবিকে আলিঙ্গিত করিতে চায়, পুষ্পসৌন্দর্য কবিকে ব্যগ্র বন্ধনে বাঁধে, জোৎস্নার বিমল সুধা ধারা কবির স্নায়ুতন্ত্রীতে পরমাণুর মত প্রবেশ করে। প্রকৃতির প্রতি এই ব্যগ্র সকাম আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম সম্পদ, সুরদাসের জবানিতে তাহার প্রতি তিরস্কার সত্ত্বেও। তুলনীয়,

ওগো বাতাসে কী কথা ভেসে আসে,
আকাশে কী মুখ জাগে,
ওগো বনমর্মরে নদী নির্ঝরে কী মাধুরীস্বর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গায়ে
আমি একথা এব্যথা সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি॥—রবীন্দ্রনাথ

**ব্যাখ্যা—ভুবন হইতে…বেষ্টন করে কায়া**—বহির্বিশ্বের রূপসৌন্দর্যের তুলনা নাই। এই অসীম-বিতত বিশ্বপ্রকৃতি, তাহার লগ্নবদলের শ্যামকান্তি, ঋতুরঙ্গের সমারোহ, তাহার অরণ্য প্রান্তরের শোভা, নক্ষত্রখচিত নীলিমার উদারসখ্য ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্নার শিহরণ রূপতৃষ্ণ কবিকে প্রতি মুহূর্তেই বিহ্বল করিতেছে। এই আকর্ষণ কেবল চোখে দেখা বস্তুর যাথার্থ্যের জন্যই নয়—রোমান্টিক কবি শূন্য দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেন নাই। এই প্রকৃতির পরিবর্তমান রূপরসগন্ধস্পর্শের অন্তরালে তিনি দেখিয়াছেন কোনো লীলাময়ীর চঞ্চল চরণের চকিত ঝংকার, কোনো মায়াময়ী সত্তা যেন কবিকে অলৌকিক জগৎ হইতে হাতছানি দিয়া গেছে। যেন ইহা এই বিশ্বপৃথিবীর মায়া দিয়া সৃষ্ট কোনো কল্পমুরতি। জগতের সৌন্দর্যের নির্যাস দিয়া তাহা নির্মিত এবং নারীমূর্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সেই মায়ামূর্তি কবিকে সৌন্দর্যে যৌবনে রূপে রসে প্রলুব্ধ করিতেছে।

**কল্পমুরতি কত**—ইহা পূর্ববর্তী চরণেই সম্প্রসারণ মাত্র। ভুবন হইতে যে ভুবন-মোহিনী মায়া বা সৌন্দর্যের নির্যাস নির্গত হয় তাহাই অবাস্তব কল্পনারীমূর্তি গ্রহণ করিয়া কবিকে বিভ্রান্ত করিতে থাকে।

**ব্যাখ্যা—শ্লথ হয়ে···বরষ বরষ ধরি**—এই দুই পংক্তিতে আবার কবিতার মূল বক্তব্য সুরদাসের জবানিতেই ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি বহির্জগতের রূপসৌন্দর্যে মাতাল হইয়া সৌন্দর্যের বন্দনা রচনা করিতে থাকেন। কিন্তু সেই বাহ্যিক সৌন্দর্য ভক্ত কবির অভিপ্রেত নয়। কেবল তপ্তসুন্দরের গান গাহিতে হৃদয়বীণা শিথিল হইয়া যায়, সেখানে ভগবদ্‌গীতি আর তেমন করিয়া বাজে না। ইহা সাধকের পক্ষে কঠোর ত্রুটি মাত্র। কবির দিক হইতেও বলা যায়, উদ্দেশ্য ও পরিণামহীন সৌন্দর্যের দাসত্ব করিলে কবিহৃদয় তৃপ্ত হইতে পারে না। সৌন্দর্যের অন্তে যদি কোনো শুচিসুন্দর আদর্শ না থাকে, সুন্দরের পাদপীঠতলে যদি কল্যাণদীপ না জ্বলে তবে তাহা অসার্থক ও ব্যর্থ—সে সাধনায় নৈরাশ্য আসিবেই। কবি-সুরদাসেরও তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিল।

**ব্যাখ্যা—হরিহীন সেই···লবণনীরে**—সুরদাস বহির্বিশ্বের পরিবর্তমান নিসর্গ সৌন্দর্যের দ্বারা ক্রমশ বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। এই নিসর্গসৌন্দর্য নানা প্রকার রূপরসময়ী কল্পমূর্তি হইয়া কবিকে বিভ্রান্ত করিতেছিল এবং কবি তাহাদের মধ্যে কোনো একটি স্থির ধ্রুব সৌন্দর্যের অপরিবর্তনীয় আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এইভাবে নানা মূর্তির মধ্যে কবির বিভ্রান্তি ঘটিতেছিল এবং মঙ্গলপরিণামহীন সৌন্দর্যের স্তাবকতার ফলে ভক্তকবি কেবলই আদর্শচ্যুত হইতেছিলেন। কল্পমূরতিকে ধরা যায় না, তাহারা প্রতারিত করে, স্নিগ্ধ শান্তি ও নিশ্চল প্রত্যয় দান করিতে পারে না। তাই ভক্ত সুরদাসের তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিল। লবণ সমুদ্রের বারিতে পিপাসা যেমন বিন্দুমাত্র নিবারিত হয় না, তেমনি উগ্র অস্থির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যে কবির রূপতৃষ্ণা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হইল না। **গিয়েছিল দেবী······রূপের ধারে**—নিসর্গের রূপসৌন্দর্য কবিকে এতদূর প্রলুব্ধ ও অতৃপ্ত করিয়াছিল যে, নিসর্গের মধ্য হইতে উদ্‌ভাসিত বিভিন্ন অশরীরী কল্পমূর্তির সহিত মানস-মিলন না ঘটাতে কবি একটি স্থির রূপের আশ্রয় খুঁজিয়া সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহিলেন। তখনই দেবীর রূপ-সৌন্দর্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তিনি দেবীর দেহরূপকেই একান্ত করিয়া পাইতে চাহিলেন।

( অষ্টম স্তবক )

**ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয় দিয়ে······লও তুলে**—কবি রূপসৌন্দর্যপিপাসাতুর হইয়া একটি শরীরী নারীর রূপকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছেন এবং

সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তাই দেবীর রূপকে পান করিয়াছেন। তাঁহার হান্দ্রয়কাতর হৃদয়ে দেবীর রূপ দৃঢ়মূল হইয়া গেছে। এখন তিনি দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সৌন্দর্যতৃষ্ণা চিরনিবারিত করিতে চান। দেবীর নিকট তাঁহার অনুরোধ, কেবল আক্ষরিক অর্থে চক্ষু উৎপাটিত করা নয়, কবির ইন্দ্রিয়জ লালসাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিতে হইবে। দৃষ্টি বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয়, তাহার অপসারণ চিত্তের দুর্বলতা মোচনের নিশ্চিত প্রমাণ নয়। দেবী যেন কবির হৃদয়-দুর্বলতাকেই চিরতরে দূরীভূত করেন। কবির অতৃপ্ত অশান্ত চিত্তে যে দেবীর মূর্তিখানি প্রবেশ করিয়াছে, দেবী সেই মূর্তিখানিকেই হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ অপসারিত করিয়া দিন।

**তারই সাথে হায়..........ছায়ার মত**—এই পংক্তিগুলিতে প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কিত দুর্বলতার আকস্মিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। সুরদাসের জবানিতে কবি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিবার শপথ লইয়াছেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়রোধ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনা কি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব? দৃষ্টি নির্মূল করিলে বাসনা না হয় নিবারিত হইবে, কিন্তু এই অনুপম সুন্দর পৃথিবীর রূপরঙ যে চিরকালের মত হারাইয়া যাইবে? এই জগতের কেন্দ্রে বসিয়া আছেন জগৎলক্ষ্মী, এই চঞ্চল সৌন্দর্য তো তাঁহারই স্থির-প্রতিমার ছায়া মাত্র। সুতরাং লক্ষ্মীপ্রতিমাকে অপসারিত করা মানে তাহার ছায়াকেও নির্বাসিত করা। সেই কঠিন ব্রত কি রূপমুগ্ধ কবির পক্ষে সম্ভব? সুরদাসের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। নয়ন-সম্মুখে যদি সে না থাকে তবে নয়নের মাঝখানে ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই। পরবর্তী স্তবকে সেই পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পালা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা কবিরচিত এক অভিনব হরণ-পূরণের লীলানাট্য।

( নবম স্তবক )

**পারিনা ভাসিতে কেবলই মুরতিস্রোতে**—একদিকে বিশ্বসৌন্দর্যের নানা কল্পমূরতি, অন্যদিকে দেবীর রূপসৌন্দর্যোজ্জ্বল দেহমূর্তি—কবি এই বিবিধ মূর্তির মধ্যে বারবার বিভ্রান্ত হইতেছেন। কল্পমূরতি মায়ারচিত, তাহারা কবিকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু কোনো ক্ষণেই তাহাদের সহিত নিবিড় সৌন্দর্যে মিলিত হওয়া যায় না। আবার দেবীর সহিত কবির যে ভক্তির সম্পর্ক, তাহা বাসনাকলুষ হইয়া যাইতেছে। দেবীর দেহরূপ কবিকে

বিহ্বল করিতেছে। তাই মূর্তিময় ভুবন হইতে কবি বিমূর্ত সৌন্দর্যের দেশে যাইতে চান।

**আঁখি গেলে মোর......বারো মাস**—রূপসৌন্দর্যকাতর কবির নিকট দৃষ্টিহীন হওয়ার অপেক্ষা বেদনাদায়ক আর কিছুই নাই, কারণ কবির দিদৃক্ষা ও সিসৃক্ষা ঐ চোখের মধ্যে নেই। ইহাই কবির নিকট সীমা। আঁখিহীন হওয়া মানে অসীম শূন্যতা ও নিরুদ্দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া-যাওয়া। তখন বহির্বিশ্বের কোনো চিহ্নই থাকিবে না, অন্তরে এক মহানিঃসঙ্গতা লইয়া কবি বাস করিবেন। ইহাকে সুরদাস প্রলয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

( দশম স্তবক )

**বিশ্ববিলোপ......রবে সে কি!**—এইবার সুরদাসের চিন্তার সহিত আধুনিক রোমান্টিক কবির চিন্তা যুক্ত হইয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয় বিশ্বপরিচয়ের বাতায়ন, সুতরাং দৃষ্টিহীনের নিকট সমগ্র পৃথিবীই অবলুপ্ত। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সুরদাসরূপ কবি বহিরিন্দ্রিয় লুপ্ত করিতে চান তাহা বাসনামুক্ত হওয়া। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বের সকল সৌন্দর্য হইতে কবি চিরকাল নির্বাসিত হইবেন, ইহা ভাবাও কষ্টকর। তখন কবির কাছে এক নূতন ভাবনা চকিতবিদ্যুতের মতই উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। বহির্দৃষ্টি রুদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে একটি অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হইবে। তখন সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ রূপ তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিবিশ্বাস—'অন্ধকারের অন্তরেতে উৎসারিত আলো'। ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউলের উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে—"এতদিন আমার দৃষ্ট ছিল। যখন অন্ধ হলুম, ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালীর দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো।" বহিরিন্দ্রিয় দিয়া যাহা দেখা যায় তাহা সকাম সৌন্দর্য। অন্তর্দৃষ্টিতে সৌন্দর্য নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ হইয়া দেখা যাইবে। ইহাই প্লেটোর ভাষায়, absolute beauty in its essence pure and unalloyed.

**পবিত্র মুখ......আনত আঁখি**—দেবীর বর্ণনা। দেবীর নিকট সুরদাস যখন তাঁহার পাপচেতনার বিবরণ দিতেছিলেন তখনও দেবী নতনয়নে কবির দিকে তাকাইয়া ছিলেন—

যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা পানে চাও,

সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী' কবিতাতেও এই নয়নের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মত—

আনন্দ-আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়
রাখো মোর মুখ-পানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে।

**বাতায়ন হতে……অনন্ত-নিশি মাঝে**—ইতিপূর্বে দেবী ছিলেন বহির্জগতের নারী, এখন মানস-লোকে স্থানান্তরিত হইয়া দেবী হইয়াছেন মানস-প্রতিমা। এ নারী অর্ধেক বাস্তব, অর্ধেক কল্পনা; কবির আপন মনের মাধুরীর দ্বারা সৃষ্ট। এই জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য তাহাকে ভূষিত করিয়াছে। ললাটে বাতায়ন হইতে সন্ধ্যাকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, মেঘের আলোক নিবিড় কালো কেশে মিশিয়াছে। মানসীর 'বিচ্ছেদ' কবিতায় এই রূপের আর এক পরিচয় লক্ষণীয়—

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,…
দিবসের শেষ দৃষ্টি অন্তিম মহিমা
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে—
বিষণ্ণকিরণপটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

এই মোহিনী প্রতিমা, বা 'নিভৃত আশ্রম' কবিতার ভাষায় 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী মূরতি'কে কবি চিরকালের মত অন্তরে লাভ করিবেন, ইহাই সুরদাসরূপী রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা। বহির্জগতে দেবীর প্রতি কবি বাসনাদৃষ্টি দিয়াছিলেন, অন্তর্জগতে আর বাসনা নাই, তাই দেবী শান্তিরূপিণী।

**চৌদিকে তব……জেগে রবে**—মানস-লোকে স্থানান্তরিত হইলে দেবীর চারিপার্শ্বে কবি আপনার কল্পনানুযায়ী এক নূতন জগৎ রচনা করিবেন। এ জগৎ বহির্জগতের অনুরূপ, কিন্তু মানসসৃষ্ট। তাহা অনন্ত তাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। তুলনীয়, 'মানসসুন্দরী' কবিতা—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে

রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন ।

**সে নবজগতে……রবে চাহি**—অন্তর্লোকে কবি যে নূতন জগৎ নূতন প্রকৃতি নূতন সৌন্দর্যপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা ঘটাইলেন, তাহা কালচিহ্নবিহীন, তাহা অনন্ত। এইজন্যই তাহার ক্ষয় নাই। ( একাদশ স্তবক )

**তোমাতে হেরিব……অনন্ত বিভাবরী**—এইভাবেই সুরদাস বাসনা-মলিন আঁখিকে বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ ও নিষ্কামভাবে দেবীকে অন্তরে গ্রহণ করিলেন, প্রেমকে পূজায় রূপান্তরিত করিলেন। তাই প্রেমিকা তাঁহার নিকট দেবতায় পরিণত হইল অর্থাৎ প্রিয়কে তিনি দেবতায় পরিণত করিলেন। ভক্তকবি সুরদাস ছিলেন হরি-আরাধক। কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ সুরদাসের মতই দেবীর মধ্যে তাঁহার হরিকে লাভ করিলেন। এই বিশুদ্ধ প্রেম জীবনের সর্বকর্মের প্রেরণা হইয়া দেখা দিবে ইহাই শেষ পংক্তির মর্মকথা।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। " 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সুরদাসের কণ্ঠে কবি যে প্রার্থনা সংযোজিত করিয়াছেন তাহা প্রাচীন কবি সুরদাসের সহিত নিঃসম্পর্কিত, ইহা কবি রবীন্দ্রনাথেরই প্রার্থনা।"** এই মন্তব্যের বিচার কর।

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ২। 'হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি'
ইহা যাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে আলোচ্য কবিতা অবলম্বনে**

**কবিজীবনে তাঁহার ভূমিকা নিরূপণ কর। 'দেহহীন জ্যোতি' বলিতে কবি কী বুঝাইয়াছেন ?**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ৩। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতা অবলম্বনে সুরদাসের অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের অন্তরালে বাসনাবিহীন সৌন্দর্যের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, নিজের ভাষায় তাহার আলোচনা কর।**

আলোচনা দ্রষ্টব্য।

# গুরু গোবিন্দ

## ভূমিকা

'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটি মানসীর অন্যান্য গীতিকবিতা হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়। ইহা শিখ ধর্মগুরু গোবিন্দসিংহের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত একটি দেশপ্রেমমূলক ব্যালাড বা গাথা কবিতা। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রাচীন ইতিহাসের বহু মহত্ত্ব আত্মত্যাগ বিসর্জন ও গৌরবের ক্ষীণসূত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন যাহা তাঁহার কথা ও কাহিনী নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং অসাধারণ জনপ্রিয়। 'বন্দী বীর' এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই সাদৃশ্যহেতু 'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটিকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র কাব্যরচনাবলীর অন্তর্গত মানসীতে না রাখিয়া কথা ও কাহিনীর মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ব্যালাড বা গাথা জাতীয় কবিতা

কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত

'গুরু গোবিন্দ' কবিতাটির পটভূমিকা বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। শ্রীকিরণচন্দ্র চৌধুরীর 'স্বদেশকথা' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল—

গুরুগোবিন্দের ইতিহাস

"ঔরংজেবের ধর্মনীতি ও উহার ফলাফল—সম্রাট আকবর অনুসৃত উদার ও সর্বধর্মসহিষ্ণু শাসননীতি তাঁহার পরবর্তীকালে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত অন্তত আংশিকভাবেও চালু ছিল। কিন্তু ঔরংজেবের রাজত্বকালে সেই নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইয়া এক সংকীর্ণ পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ঔরংজেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি একথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কেবলমাত্র মুসলমানদের নেতা সাজিলেই ভারত-সম্রাটের চলিবে না। তিনি অমুসলমানদের দেশকে ইসলামের দেশ অর্থাৎ দার-উল ইস্‌লামে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এইজন্য তিনি অমুসলমানদের

ঔরংজেবের ধর্মনীতির পরিণাম

উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। অমুসলমানগণ জিম্মি নামে অভিহিত হইত। দার-উল-ইসলামে তাহাদের বসবাসের কোনো অধিকার নাই, সেই কারণে জিজিয়া কর দিয়া সেই অধিকার ক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। এইরূপ উগ্র ধর্মান্ধনীতির বশবর্তী হইয়া ঔরংজেব শুধু জিজিয়া কর পুনঃস্থাপনই নয়, হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর দ্বিগুণ শুল্ক ধার্য, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংসকরণ প্রভৃতি অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের সরকারী পদে নিয়োগ বন্ধ করা হইল। তাহাদের সামাজিক মর্যাদাও নানাভাবে হ্রাস করা হইল। এই অদূরদর্শী ধর্মান্ধনীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জাঠ বুন্দেলা, সৎনামী সম্প্রদায়, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতি—সকলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।......

শিখ বিদ্রোহ—ঔরংজেবের অদূরদর্শী ধর্মান্ধতা পাঞ্জাবের শিখ জাতিকেও বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। জাহাংগীরের আমল হইতেই শিখ-মোগল সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণ দণ্ডিত করিয়া ভুল করিয়াছিলেন...অর্জুনের প্রতি এই নির্মম ব্যবহার শিখ জাতি ভুলে নাই। শিখগুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখ জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলেন। পরবর্তী শিখগুরু (নবমগুরু) তেগবাহাদুর ঔরংজেবের সংকীর্ণ ধর্মনীতির বিরোধিতা করিলে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া মোগল দরবারে উপস্থিত করা হইল। ঔরংজেব শিখগুরু তেগবাহাদুরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তেগবাহাদুর মস্তক দিলেন কিন্তু ধর্মত্যাগ করিলেন না। পরবর্তী শিখগুরু গোবিন্দসিংহ পিতার এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া শিখদিগকে 'খালসা' নামে এক সামরিক বাহিনী হিসাবে গড়িয়া তুলিলেন। খালসা কথাটির অর্থ হইল পবিত্র। গুরু গোবিন্দসিংহ পঞ্চ 'ক'-এর অর্থাৎ কংগা (চিরুণী), কেশ, কচ্ছ (পরিধানের পোষাক), কড়া (লোহার চুড়ি) ও কৃপাণ এই পাঁচটি জিনিস শিখ মাত্রকেই ধারণ করিবার রীতি প্রবর্তন করেন। গুরু গোবিন্দসিংহের নেতৃত্বে শিখ জাতি ঔরংজেবের এক অতিশয় শক্তিশালী শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়। ঔরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শিখজাতিকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই।"

শিখ অভ্যুদয়

ঔরংজেবের শিখ দমন নীতি

শিখদের এই স্বধর্মনিষ্ঠ আত্মত্যাগ ও দুর্ধর্ষ ঐক্য রবীন্দ্রনাথের নিকট শ্রদ্ধেয় হইয়া দেখা দিয়াছিল এবং তিনি একাধিক কবিতায় শিখজাতির সহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম ধর্মপ্রতিরোধ ও মহান আত্মবিসর্জনকে প্রণতি জানাইয়াছিলেন। এই ধরণের কবিতার একটি তালিকা এখানে উল্লেখযোগ্য—

শিখ-অভ্যুদয় ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে অন্যান্য কবিতা

| | | |
|---|---|---|
| গুরু গোবিন্দ— | রচনাকাল | ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ |
| নিষ্ফল উপহার— | | ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ |
| প্রার্থনাতীত দান— | | ২ কার্তিক ১৩০৬ |
| শেষ শিক্ষা— | | ৬ কার্তিক ১৩০৬ |
| বন্দী বীর— | | ৩০ কার্তিক ১৩০৬ |

'গুরু গোবিন্দ' কবিতায় গোবিন্দসিংহের জীবনের কোনো বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ নাই, কিন্তু গুরুজীর সাধনা ও নেতৃত্বের গভীরে যে কী নিরলস কঠিন পরীক্ষা ও একব্রত অনুশীলন নিহিত ছিল, কবির কাছে তাহাই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। গুরু গোবিন্দ তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য শিখজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সৈনিক করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাহ্বান করেন। আনন্দপুর নামক স্থানে তিনি একটি পার্বত্য দুর্গ স্থাপন করেন এবং সেখানে যুদ্ধশিক্ষার্থী শিখদের সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাশ্মীর ও গাড়োয়াল সামন্ত নৃপতিদের দুর্গগুলি এই কারণে তিনি বলপূর্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ যে আদর্শ সংগঠক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার দেশপ্রেমিক স্বজাতিনিষ্ঠ চরিত্রের এই সাংগঠনিক মনোবলই 'গুরু গোবিন্দ' কবিতার বিষয়বস্তু। সহসা হঠকারিতার দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করা যায় না, ধীরে ধীরে সাধনার দ্বারা আপনাকে নেতৃত্বে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাই সমবেত ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট গুরু গোবিন্দের উপদেশ। এইজন্য ইহার নাম গুরুজীর নামেই চিহ্নিত।

কবিতার সংক্ষিপ্ত বিষয়

## ভাবার্থ

সুবিপুল মানব সমাজ, বিশাল কর্মসমুদ্রের তরঙ্গকল্লোল, জীবনরঙ্গ ভূমি সব পরিত্যাগ করিয়া শিখগুরু গোবিন্দসিংহ নির্জনে আপন সাধনায় আত্মমগ্ন

আছেন। যমুনাতীরবর্তী সুগম্ভীর পর্বত বেষ্টিত অরণ্যে গোবিন্দসিংহকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহার অনুচরবৃন্দ, কিন্তু এখনও সংগ্রামের অংশগ্রহণের সময় আসে নাই বলিয়া গোবিন্দসিংহ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের ফিরিয়া যাইতে এবং অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। ( প্রথম হইতে তৃতীয় স্তবক )

মহামানবজীবন শিখগুরুকে সর্বদাই আহ্বান জানায়, ইহাও গুরুজী অস্বীকার করিলেন না। তাঁহার সুপ্তোত্থিত রাত্রি জনজীবনের কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠে, সঙ্গীসাথীদের সাহচর্যে গুরুদেবের শোণিতপ্রবাহ দ্রুততর হয় এবং অস্ত্রোন্মাদনা জাগিয়া উঠে। দুর্ধর্ষ পরাক্রমে শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আনন্দ স্মৃতি, ভাগ্যবিধান অস্বীকার করিয়া বিপদ বরণের দুর্বার অভিযান, বিপুল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া অপ্রতিহত বিজয়ে প্রলয় মত্ততায় আগাইয়া যাওয়ার স্বপ্ন গুরু গোবিন্দকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। ( চতুর্থ হইতে অষ্টম স্তবক )

গুরুজী স্বপ্ন দেখেন, দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে মৃত্যু লঙ্ঘন করিয়া জীবনের অক্ষয় প্রেরণায় একটি জাতিকে শিখগুরু পথনির্দেশ দান করিতেছেন। কত বন্ধুর সংকটময় অধ্যায় কাটাইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অমাবস্যার আলোকহীন তিমির, ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতের সহিতই জাতির সেই সকল দুর্দিন তুলনীয় হইতে পারে। অবশেষে গুরুজী কঠিন নেতৃত্বের অধিকারী হইয়াছেন ; তাঁহার আহ্বানে এখন জাতি সংকীর্ণ গৃহপাশবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিবে। গুরুজী কান পাতিয়া শুনিতে পান, সমুদ্র-বাহিনী নদীর মত সমগ্র পাঞ্জাবের জনসাধারণ গুরুজীর পশ্চাতে সমবেত হইতেছে। ( নবম হইতে দ্বাদশ স্তবক )

গুরুর আহ্বান দিকে দিগন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও নাই। সকল অভ্যস্ত কর্মভীরুতা নিশ্চেতনা দূর করিয়া জাতিকে আসিতেই হইবে গুরুসকাশে। জাত্যভিমান, প্রাণভীরুতা, মান-অপমান সকল বিসর্জন দিয়া ব্রাহ্মণ হইতে জাঠ সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন, এই স্বপ্ন গুরুগোবিন্দকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা স্বপ্নমাত্র, এখনও তাহার সাফল্য-সম্ভবনা অনাগত। এখনও কঠিন দীর্ঘ কৃচ্ছ্র সাধনায় বিনিদ্র মুহূর্ত উদযাপনে তাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ( ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ স্তবক )

সেই নির্জন সাধনা সফল করিবার জন্য গুরুজী তাই কখনও দুর্গম পর্বত-অরণ্যে যমুনাতীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন, নীরব ভাবনা ও কর্মহীন কল্পনার মধ্যেই আপনার ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছেন। প্রাকৃতির সঙ্গ সেই কল্পনাকে পরিপুষ্ট করিতেছে, গুরুজীকে তাঁহার কর্মের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। এইভাবে বিজন সাধনায় দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে এবং আরও কত কাটিবে বলা যায় না। এইভাবে ধীরে ধীরে অমর মহাজীবনের নিকট হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া গুরুগোবিন্দ আপনাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবেন এবং একদিন এই সাধনার অবসান ঘোষণা করিবেন। তখন সকল প্রতীক্ষমাণ দেশবাসীকে তিনি সমবেত করিবেন, জাগ্রত করিবেন, উদ্বুদ্ধ করিবেন। ( ষোড়শ হইতে উনবিংশ স্তবক )

সেই সাধনার অবসানে গুরু গোবিন্দ যে সত্যজ্ঞান লাভ করিবেন তাহারই মহাসম্পদে জীবন মরণ শঙ্কাত্রাস সংশয় দূর হইয়া যাইবে, তাহারই সম্মুখে জগৎ পথ রচনা করিয়া দিবে। সেই সত্য দৈববাণীর মত গুরুর অন্তরে নির্দেশ দান করিবে। সেই বাণীতে আছে, অন্তরাত্মাকে নির্বাণহীন প্রদীপের মত জাগিয়া থাকিবার নির্দেশ, বহু প্রান্ত হইতে ধাবিত জনতাকে নেতৃত্ব দানের অনুজ্ঞা। ( বিংশ হইতে দ্বাবিংশ স্তবক )

একথা বলিতে বলিতে দিগন্তে মহাদুর্যোগ মরণোন্মুখ ঝড় ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু গুরু গোবিন্দ বাহিরের প্রাকৃতিক দুর্বিপাক উপেক্ষা করিয়াই আপন অন্তরে জ্যোতির্ময় ধ্যানের আয়োজন করিয়াছেন। সাহু রামদাস প্রমুখ সমবেত সহচরদের তাই তিনি ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কেবল যাইবার পূর্বে তাঁহারা যেন ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গুরুর উপর আস্থা রাখে। সদ্যউত্থিত প্রাতঃ-সূর্যের কিরণে গুরুর মূর্তি দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। সভক্তি প্রণতি জানাইয়া ভক্তগণ বিদায় লইল। ( ত্রয়োবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ স্তবক )

## আলোচনা

কবিতাটি সংহত নয়, কিন্তু বক্তব্যে গভীর এবং মর্মস্পর্শী। জাতির ভাগ্য-বিধাতা হইতে হইলে কঠিন সংযমে, ধৈর্য ত্যাগ প্রতীক্ষা ও সাধনায় যে কত দীর্ঘ নীরন্ধ্র যুগ যাপন করিতে হয়, তাহাই পাঞ্জাব-দিশারী গুরু গোবিন্দের

জীবন অবলম্বনে কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। গুরু গোবিন্দের জীবন, বিশেষত এই জনগণমন-অধিনায়কের আদর্শপূত জীবন রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার পরিচয় অন্যান্য কবিতাতেও আমরা পাইয়াছি। মানসীর 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাতেও শিখগুরুর এই নির্জন সাধক জীবনের একটি চিত্র আছে, যেখানে রঘুনাথ প্রদত্ত হীরক-ভূষিত স্বর্ণবলয় গুরুজী অনায়াসে নির্লোভের মত নদীবক্ষে ফেলিয়া দিয়াছেন। কথা ও কাহিনীর 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় কেমন করিয়া গুরুগোবিন্দ একটি পাঠানকে হত্যা করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই পুত্রকে আপনপুত্রের মত স্নেহ যত্নে লালন করিয়া তারপর তাহার চিত্তে পিতৃহত্যার জন্য ক্রোধ জাগাইলেন এবং তাহারই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বক্ষে গ্রহণ করিয়া আপনার পাঠান-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহার করুণ মর্মন্তুদ বিবরণ আছে। এখানেও সেই শিখগুরুর মহান মানবিক কর্তব্যবোধ, আপনার জীবনের মূল্যে অপরকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে দীক্ষিত করার আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে। এই গুরুগোবিন্দই মানসীর আলোচ্য কবিতার নায়ক।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিখ জাতির চরিত্রাদর্শ

মানসীর অনেকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশজননীর জন্য কবির চিত্তে যে উষ্ণ আকর্ষণ ছিল, তাহার সহিত কপট দেশহিতৈষিতার প্রতি একটি ঘৃণাও ছিল। দেশকে স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া দেশবাসীকে মানবিকতার মূল্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে যে স্বদেশপ্রেম, তাহা দেশনায়কদের নিকট হইতে কবি সর্বদা লাভ করেন নাই। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' তাই কবির কী অসীম বিদ্রূপ ও বিরক্তির পাত্র হইয়াছে, 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মনে দেশপ্রেমের যে একটি নিজস্ব আদর্শ ছিল তাহা ইতিপূর্বেও বিভিন্ন গদ্য রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবি মনে করিতেন, মনুষ্যত্বের বিকাশের দ্বারাই যথার্থ স্বদেশভক্ত হওয়া যায়। ক্ষুদ্রতার সংকীর্ণতার কারাগার হইতে আপনাকে উদ্ধৃত করিয়া, স্বার্থলেশশূন্য হৃদয়ে দেশপ্রেমকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে, আপনাকে মহৎ করিয়া তুলিতে হইবে, আপনাকে সকলের অনুকরণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। কারণ,

কবির দেশপ্রেমের আদর্শ

সবাই বড় হইলে তবে
স্বদেশ বড় হবে,

যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে। (দেশের উন্নতি)

উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ কোনোদিনই কবিকে বিচলিত করে নাই, মানবজীবনের প্রতি কবিদৃষ্টি সজাগ ছিল বলিয়াই তিনি দেশপ্রেমকে মানবিক যুক্তির দ্বারা বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। স্বদেশকে দুঃখময় দুর্গম বন্ধুর পথে পরিচালনা করিবেন যে দেশনেতা তাহার আদর্শ হইবে নিরলস কর্মসাধনা, আত্মমগ্ন-অনুশীলন, আপনাকে সকলের নিকট আদর্শ চরিত্র করিয়া তোলা, ইহা রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই সাধনা, এই আদর্শ তথাকথিত দেশনেতাদের মধ্যে তিনি কখনই দেখিতে পান নাই। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা রচনার কয়েক বৎসর পরে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' নামক একটি প্রবন্ধে ইংরাজ শাসনের নানাবিধ সমালোচনা করিয়াও কবি শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। সেই সমালোচনা 'গুরু গোবিন্দ' কবিতার সহিত তুলনা করিতে হইবে। কবি বলেন,

জাতীয় চরিত্রের সমালোচনা

"অতএব সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজা প্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে, এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পাইব।...

ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধ

শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন, তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে; পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে

গুরু গোবিন্দের নির্জন সাধনা

হইবে ; সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক, সহসা চৈতন্য হইবে—এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম; সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই। তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না ; তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন ; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন, এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন। আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাসী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন, যেন এখানকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্য সাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।”

দেশনায়কের ব্রত

আশা করি এই আলোচনার পটভূমিতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে দেশনায়কত্বের কঠিন ব্রতই গুরু গোবিন্দসিংহের রূপকে কবি প্রচার করিয়াছেন। কর্মমুখর বাস্তবজীবনের আহ্বানে নায়ককে প্রস্তুত হইতে হইবে এই কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনে বারবার উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই উপলব্ধিরই বাঙ্ময় প্রকাশ ‘গুরু গোবিন্দ’ কবিতাটি।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

( স্তবক ১-১০ )

**নিশি-অবসান……সুগভীর**—যমুনাতীরবর্তী পর্বতসঙ্কুল অরণ্যে গুরু গোবিন্দ নির্জনবাস করিতেছিলেন। সেখানে একদিন রাত্রির শেষদিকে তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিয়া গোবিন্দসিংহকে আত্মপ্রকাশ করিতে এবং গণনেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। গুরু গোবিন্দের অবস্থান-পরিবেশের এই বর্ণনা অন্যত্রও দ্রষ্টব্য। যথা, 'নিষ্ফল উপহার' কবিতায়—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
উর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

**দেখায়ো না লোভ……জীবনরঙ্গভূমি**—নির্জন সাধনায় দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, নানা বহিদুর্যোগে শিখ জাতি বিপন্ন। অথচ তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি দৃঢ় হইয়াছে। ধর্মান্ধ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিহত শক্তিতে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা যখন প্রস্তুত তখন গোবিন্দ-সিংহ তাঁহাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছেন। কর্মমুখর জীবনের আহ্বানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, কারণ তাঁহার ধারণা তখনও প্রস্তুতিকাল শেষ হয় নাই। তাই নেতৃত্বের মোহ তিনি ত্যাগ করিতে চাহেন।

**ব্যাখ্যা—ফিরায়েছি মুখ……গোপন কাজে**—স্বজাতির উপর বিধর্মীর অত্যাচার, স্বদেশবাসীর আর্তনাদ গুরু গোবিন্দকে বিপন্ন ব্যাকুল করিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়া তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উত্তেজনা সংবরণ করিয়াছেন কেন, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। কর্মের প্রেরণায় মানব-জীবনের বিচিত্র তরঙ্গিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার আগ্রহ থাকিলেও গুরুজী আপনাকেই সেই কর্মের যোগ্য প্রতিনিধি মনে করেন নাই; মানব-জীবন সমুদ্রের মত। সমুদ্রের কল্লোল-গর্জনের মত মানব-জীবনের বহু বেদনা আর্তনাদ দূর হইতে শোনা যাইতেছে। কিন্তু এখনই সেই সমুদ্রে অবগাহনের ইচ্ছা তাঁহার নাই, তাই লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জন বন-পর্বতে গুরু গোবিন্দ একাকী আত্মমগ্ন সাধনায় নিরত রহিয়াছেন। এখানে নির্জনতার মধ্যে তাঁহার একক সাধনা উদ্‌যাপন করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার বক্তব্য।

**ব্যাখ্যা—মানবের প্রাণ……মানবস্রোতে**—'গুরু গোবিন্দ' কবিতায় গুরু গোবিন্দকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধন রচনা করেন নাই, মানব জীবনের আহ্বানকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। এই দিক দিয়া ইহা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা। কবি সংকীর্ণ স্বাজাত্য-বোধকে কোনোদিন স্বীকার করেন নাই, দেশ অপেক্ষা সমগ্র বিশ্ব, স্বদেশবাসী অপেক্ষা বৃহত্তর মানব জীবনই তাঁহার কবি কল্পনাকে বারবার উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাই স্বদেশের মুক্তির কথা চিন্তা করিতে বসিয়া সমগ্র মানব জীবনকেই তিনি উদ্বুদ্ধ করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে গুরু গোবিন্দের কণ্ঠে তাই 'কর্মসাগর' 'অগাধ মানব-সাগর' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকালয় হইতে শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ লইয়া যে অনুচরবৃন্দ ধর্মগুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত কথোপ-কথনকালে গুরুজী বারবার এই বৃহত্তর মানব জীবনের প্রতিই তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। লোকালয় তাঁহার কাছে মানব জীবনের প্রতিনিধি—লোকসমাজের সুখদুঃখ আকুলতা ক্রন্দন দূরস্থিত সমুদ্রতরঙ্গের মত তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই মানবজীবনের আহ্বানে তাঁহার নিশীথ-নিদ্রা ভাঙিয়া যায় এবং তখন তাঁহার মনে হয়, তাঁহার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়া এই মানব জীবনের সহিত মিশিয়া যাইতে। এই কর্মমুখর জীবনের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতাতেও আছে। কড়ি ও কোমলের 'আহ্বান গীত,' মানসীর 'দুরন্ত আশা', সোনার তরীর 'বসুন্ধরা', চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' একই জাতীয় কবিতা।

**রক্ত-অনল……করি উঠে কেলি**—গুরু গোবিন্দের নিস্তব্ধ চিত্ত সহসা যেন এক অভাবিতপূর্ব বিক্ষোভে প্রধূমিত হইয়া উঠে তখন মনে হয় এই মুহূর্তে সকল বাধা চূর্ণ করিয়া কর্মের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। দুরন্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা যেন শত শত সর্পের ফণার মত তাঁহার চারিদিকে নাচিতে থাকে। **গঞ্জনা দেয়……ঝনঝনা**—দীর্ঘকাল কোষে তরবারি নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে, আজ উত্তেজনায় তাহা কাঁপিতে থাকে। মনে হয়, যেন ঐ তরবারির শব্দ গুরুজীর নিস্তেজ নিশ্চলভাকে বিদ্রূপ করিতেছে, ভৎ্সনা করিতেছে।

**ব্যাখ্যা—হায় সে কি সুখ……তীক্ষ্ণ ছুরি**—আলোচ্য পংক্তিগুচ্ছে গুরু গোবিন্দ তাঁহার সংগ্রামী সৈনিক জীবনের সুখস্মৃতির বর্ণনা করিয়াছেন।

গুরুজী কেবল ধর্মগুরুই ছিলেন না, তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সমরকুশল যোদ্ধজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বহু দুর্গ দখল করিয়া তাহাদের নিপুণ সমরবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং সামরিক জীবনের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক আসক্তি ও দুর্বলতা ছিল, তাহাই এই নির্জন অজ্ঞাত সাধকজীবনকে যেন ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। সেই সমরজীবনে গুরুজী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছেন, প্রবল প্রচণ্ড বিজয়োল্লাসে হাতে জয়ভেরী বাজাইতে বাজাইতে শত্রু পক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়া কত রাজ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত রাজ্য পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছে। সেই সকল অধীন রাজ্যগুলি লইয়া শিখগুরু নূতন সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল সাম্রাজ্যবাদী রণলিপ্সু ছিলেন না। তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শিখদের উপর মোগল শাসকদের ধর্মান্ধ নির্দয়তা দূর করা। সেই অত্যাচারী শাসককে শায়েস্তা করার মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহাই এই নির্জনবাসী দেশনায়ককে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে।

**তুরঙ্গসম……প্রতিকূল ঘটনায়**—শিখগুরু গোবিন্দসিংহ কেমন করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া অদৃষ্টবন্ধনকে প্রতিহত করিবেন, তাহাই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অদৃষ্ট যেন একটি দুর্দমনীয় বন্য অশ্ব, তাহাকে বশীভূত করা কঠিন। কিন্তু ভাগ্যকে যে স্বীকার করে না, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকারের সাহায্যে যে প্রতিকূল অদৃষ্টকেও আপনার বশীভূত করিতে চায়, সে সেই বন্য অশ্বকে প্রবল শক্তির দ্বারা আয়ত্তে আনে এবং তাহাকে পোষ মানায়। তারপর সেই অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যায়। পর্বতসঙ্কুল পাঞ্জাবের মুখ্য বাহন অশ্ব, তাই বন্য অশ্বের প্রতীকে রবীন্দ্রনাথ গুরুজীর মুখে প্রতিকূল নিয়তির বশীভবনের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন।

**আকাশের আঁখি করিছে ছিন্ন প্রলয় বহ্নিধূমে**—চতুর্দিকে যেন এক মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ধূমরাশি আকাশকে আবৃত করিয়া দিয়াছে। **শতবার করে মৃত্যু ডিঙায়ে পড়ি জীবনের পারে**—মৃত্যু যেন চলার পথে এক একটি বাধার প্রাচীর রচনা করিয়া রাখিয়াছে। দ্রুতধাবমান অশ্বারোহী যেমন সেই সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া যায়, দেশনেতারূপে গুরু গোবিন্দও সেইরূপ মৃত্যুর বাধা অতিক্রম করিয়া জীবনের শ্যামল ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইবেন। **শোকের**

**প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে গরজিছে দুই ধারে**—'শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে' ইত্যাদি অংশে যদি সমুদ্রের চিত্র কল্পনা করা যায় তবে উহার অর্থ দাঁড়াইবে, মৃত্যুরূপ গর্জমান তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া জীবনের কূলে অবতরণ করা। তাহা হইলে 'লোকের প্রবাহ দুই ধারে' ইত্যাদি অংশে সমুদ্রের উৎপ্রেক্ষা সার্থক হয়। ইহার তাৎপর্য হইল, জলযান যখন তীব্র বেগে সমুদ্রের ঢেউ কাটিয়া অগ্রসর হয় তখন তাহার দুইধারে গর্জমান সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া উঠে। তেমনি করিয়া শিখজাতির ভাগ্যবিধাতা যখন বিজয়াভিযানে অগ্রসর হইবেন তখন জনসাধারণ তাহাকে দুই পাশে সরিয়া পথ করিয়া দিবে।

**কভু অমানিশা……পড়ে দয়াহীন**—যে বিচিত্র ভাগ্যপরিবর্তনের মধ্য দিয়া দেশনেতাকে সংগ্রামের পথে চলিতে হইবে তাহাই এখানে প্রকৃতির রূপবদলের রূপকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কখনও দুর্যোগে দৃষ্টিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার অমাবস্যার কালো রাত্রির মত ঘনাইয়া আসিবে। কখনও নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী দুশ্চর ব্রত পালন করিতে হইবে, তাহাই দিবসের রৌদ্রতীক্ষ্ণ মরুসদৃশ প্রাখর্যের সহিত তুলনীয়। সাধারণভাবে বিঘ্নবিপদ মৃত্যুভয় প্রতিকূলতা শত্রুর প্রতিরোধ ষড়যন্ত্র হতাশা এইগুলি ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রবৃষ্টি ইত্যাদির সহিত উপমিত হইয়াছে।

( স্তবক ১১—১৯ )

**সুখসম্পদ-মায়ামমতার বন্ধন যায় টুটে**—গুরু গোবিন্দ স্বপ্ন দেখিতেছেন, নিশ্চল প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া তিনি জাতির কর্ণধার হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে দুর্ভাগ্যপীড়িত শিখজাতি অবহেলার প্রাচীর চূর্ণ করিয়া আত্মমর্যাদা ও ধর্মগত স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। দেশনেতা যখনই আহ্বান জানাইলেন তৎক্ষণাৎ সমগ্র জাতি সেই আহ্বানে সাড়া দিল। নিরুদ্ধচিত্ত মানুষ নতুন উন্মাদনায় নাচিয়া উঠিল। সকলের বন্ধ গৃহদ্বার খুলিয়া গেল। আত্মীয়স্বজন-পরিবেষ্টিত সুখসংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কর্মযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল তরুণ দল—কোনো অভ্যস্ত সুখের স্নেহপাশই তাহাদের আর সংসারের কারাগারে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

**ব্যাখ্যা—সিন্ধু-মাঝারে……উন্মাদ কোলাহল**—যে জাতি বারবার ভাগ্যের হাতে মার খাইয়াছে, শাসকের অত্যাচারে যাহার ধমনীর রক্তস্রোত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধশক্তি এতকাল প্রাণ পায়

নাই কেবল উপযুক্ত নেতার অভাবে। তাই যেই মুহূর্তে গুরু গোবিন্দ—শিখজাতির অবিসংবাদী গণমনঅধিনায়ক দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন অমনি দেশের সর্বত্র চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। গুরু গোবিন্দও দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার এইরূপ স্বপ্নই দেখিতেছিলেন। সেই স্বপ্নের কথাই এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে। গুরুজী কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার আহ্বানে জাতির অন্তরাত্মা জাগিয়াছে, দেশের তরুণ সমাজ একাগ্র হইয়া সকল প্রতিকূলতা অস্বীকার করিয়া নেতৃসন্নিধানে ছুটিয়া আসিতেছে। এই বাধাবন্ধহীন আগমনকে গুরুজী একটি উপমার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব পঞ্চনদীর দেশ (ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, চন্দ্রভাগা ও শতদ্রু)। এই পাঁচটি নদীর জল সিন্ধুপ্রদেশের বিখ্যাত সিন্ধু নদে মিশিতেছে এবং তারপর সিন্ধু আরব সাগরে পড়িতেছে। এই পাঁচটি নদীর জল যেমন প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়া সিন্ধুতে মিশিতেছে, তেমনি দেশের বিভিন্ন গণপ্রবাহ তেমনি দুর্বার গতিতে গুরুজীর কর্মপ্রণালী ও সংগ্রামাদর্শে আপনাদের মিশাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। গুরুজীর আহ্বান উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, কারণ তিনি সমগ্র জাতির ধর্মগুরু। সুতরাং গুরু গোবিন্দ যেদিন অপমানিত অত্যাচারিত শিখজাতিকে ডাক দিবেন, সেইদিন সমগ্র পঞ্চনদীর দেশে প্রবল উদ্ধত কোলাহল জাগিয়া উঠিবে।

**ব্যাখ্যা—এখানে বিহার……আপন মর্মবাণী**—শিখগুরুর আহ্বান শুনিয়া সমগ্র জাতি কর্ম প্রেরণায় জাগিয়া উঠিবে, সংগ্রামে মাতিয়া উঠিবে, জাতির মধ্যস্থিত ভেদ বিদ্বেষ জাত্যভিমান ইত্যাদি সংকীর্ণতা দূর হইয়া যাইবে, এই বিষয়ে গুরু গোবিন্দের মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার সেই মহান ব্রত, জাতির নেতৃত্ব করিবার সেই কঠিন কর্তব্য পালনে এখনও তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া উঠেন নাই বলিয়াই নির্জনে তিনি দীর্ঘকাল আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত আছেন। আপনাকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে দীক্ষিত না করিলে কেমন করিয়া তিনি দেশবাসীর কাছে আদর্শ হইবেন? তাই অরণ্যে পর্বতে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দুঃসহ কঠোর জীবন যাপন করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন অনুশীলনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাঁহার তপস্যা ও প্রস্তুতি। নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে দেশবাসীকে যে তাঁহার পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করিবে না তাহা জানিয়াও গুরুজী এখনও আপনাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলিয়া মনে করিতেছেন না। এখনও সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতায়

তিনি অবতীর্ণ হইতে চান না, কল্পজগতেই তিনি আপাতত অবস্থান করিতেছেন। জনগণের মনের সর্বময় কর্তৃপদ গ্রহণ করার সময় আসে নাই বলিয়াই এখনও তাঁহার কর্মকেন্দ্র অরণ্যের নির্জনতাতেই। সমবেত দেশবাসীকে বক্তৃতায় উত্তেজিত করা, নির্দেশদান ও পরিচালনা করা অপেক্ষা আত্মমগ্ন চিন্তা, ধ্যান, নীরব সাধনা, কর্মের চাঞ্চল্য অপেক্ষা মৌনী হইয়া আপনাকে প্রস্তুত করার প্রতীক্ষা এবং আপনার অন্তরের সংগুপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি জমাইয়া তোলা ব্যতীত তাঁহার পক্ষে আর কিছুই করার নাই—ইহাই তিনি তাঁহার নিকট সমবেত অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন।

**ব্যাখ্যা—চারিদিক হতে······দেখিব কবে**—শিখ ধর্মগুরু গোবিন্দ দেশবাসীর জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার পূর্বে দীর্ঘকাল নিজেকে নির্জন সাধনায় প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইহা এক প্রকার পূর্ণতার সাধনা, মনুষ্যত্বের সর্বময় বিকাশের সাধনা। ঔরংজেবের ধর্মান্ধ হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে শিখ মারাঠা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল এবং চারিদিক হইতে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসমাজের সংগঠিত সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেছিল। শিখ সম্প্রদায় মোগল কূটশাসনের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এই লাঞ্ছনার প্রতিবিধানের জন্য ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে কবি একটি যোদ্ধবাহিনী (খালসা) গঠন করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণের জন্য গুরু গোবিন্দের এই আত্মগুপ্ত নির্জন সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্বের উপযোগী হইবার জন্য চরিত্রশুদ্ধির সাধনা বলিয়া আলোচ্য কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি যথার্থ দেশনেতা হইবেন, তাঁহাকে পূর্ণ মনুষ্য হইতে হইবে। তাঁহার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটা বাঞ্ছনীয়। যে সকল মহান ব্যক্তি লোকহিতার্থে জীবন দান করিয়া অবিনশ্বর হইয়া আছেন তাঁহাদের জীবনের প্রেরণায় নেতাকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সেই মহৎ ত্যাগ, প্রভূত চরিত্রবল, অসামান্য বীর্য এইগুলি হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া নেতার জীবন মহানায়কের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। যেদিন এইভাবে গুরু গোবিন্দ আপনাকে যোগ্য ও সম্পূর্ণ মনে করিবেন, যেদিন তাঁহার নির্জন সাধনা অনুশীলন ও শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবেন, সেইদিনই তিনি জাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

(স্তবক ২০—২৫) **পেয়েছি আমার শেষ**—আপনার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি

করিতে পারিব। **আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ**—শিখধর্ম, কেবল শিখধর্ম কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সকল ধর্মই গুরুবাদী। গুরু কেবল ধর্মে নয়, রাজনীতি সমাজনীতির ক্ষেত্রেও একজন নেতাকেই জনসাধারণ অনুসরণ করে। তিনিই জনগণমনঅধিনায়ক, জাতির ভাগ্যবিধাতা—

তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।

গুরু গোবিন্দ কেবল শিখ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিখ জাতির ধর্মগুরু, চৈতন্যদেব যেমন বৈষ্ণবদের। সুতরাং গুরুর জীবনের বাণী ও সাধনার মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির জাগরণ ঘটিবে, জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া অত্যাচারীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, ইহাই গুরু গোবিন্দের বিশ্বাস।

**অলখ নিরঞ্জন**—ধর্মভীরু শিখসম্প্রদায় তাহাদের জীবনের সকল কর্ম ও আচরণে ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করে, এই নিরঞ্জন লক্ষ্যহীন বর্ণহীন অনির্বচনীয় ব্রহ্মস্বরূপের মন্ত্র লইয়াই তাহারা জীবনের কঠিনতম দুঃখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। 'বন্দীবীর' কবিতায় এই ধ্বনি তুলিয়া শিখ যোদ্ধারা কিরূপে মহাদর্পে মৃত্যুর মুখে আত্মদান করিয়াছিল তাহার দৃপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

**প্রশ্নোত্তর**

**প্রশ্ন ১। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা অবলম্বনে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মধ্য দিয়া কবি দেশনেতার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ও সার্থকতা অলোচনা কর।**

**উত্তর।** ভূমিকা ও আলোচনা অবলম্বনে লিখ।

**প্রশ্ন ২। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ কর।**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

## ভৈরবী গান

### ভূমিকা

ভৈরবী করুণ রাগিণী, শিশিরসজল প্রভাত বেলার আবহাওয়াকে মীড়ে মীড়ে সে বিষণ্ণ করিয়া তোলে। কবি তাঁহার গানে গাহিয়াছেন, 'সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী'। 'রবীন্দ্রসংগীতে'র লেখক শান্তিদেব ঘোষের অভিমত,

রবীন্দ্রনাথের নিকট ভৈরবী রাগিণী

"ভৈরবী গুরুদেবের অন্যতম একটি প্রিয় রাগিণী, তিনি বহুগান এই সুরে রচনা করেন। একজন শিল্পী বলেছিলেন যে, গুরুদেব ভৈরবীসিদ্ধ। কথাটা অসত্য নয়। কেবল ভৈরবীতে এত রকমের গান রচনা করতে বাঙলা দেশের আর কোনো রচয়িতাকে দেখি নি। ঠুংরির মত তাঁর ভৈরবীতে শুদ্ধ কোমল ও তীব্র মধ্যম নিয়ে বারোটি পর্দাই তিনি ব্যবহার করেছেন। তবে সবগুলি একই গানে একসঙ্গে ব্যবহার করেন নি, নানা গানে তা ছড়িয়ে আছে।" (ভৈরবীতে মোট সাতটি পর্দা লাগে, রে গা ধা নি এই চারিটি পর্দা কেবল কোমল, অন্যগুলি শুদ্ধ)। বস্তুত ভৈরবীতে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ যে কতখানি তাহা তাঁহার গানের সহিত যাহার সামান্য পরিচয় আছে তাহাকে বুঝাইতে হইবে না। ছিন্নপত্রের একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি লিখিতেছেন,

"আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। মনে হয়, একটা নিয়মের যন্ত্র-হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সকালবেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছলছল করে চেয়ে আছে।" (জুন ১৮৮৯)।

কবিচিত্তে ভৈরবীর প্রভাব

প্রভাতের রাগরাগিণীর প্রতি কবির একটি সহজাত আসক্তি ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাতী সুরগুলি কবির কাছে বিষণ্ণতা বৈরাগ্য নৈরাশ্য ও বেদনাই উদ্রিক্ত করিয়াছে। কড়ি ও কোমলের 'যোগিয়া' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানেও প্রসন্ন প্রভাতবেলায় যোগিয়ার সুর শুনিয়া কবির মনে অকারণ বিরহব্যথা ও অনির্ব্যক্ত বিষাদ জাগিয়া উঠিয়াছে—

কড়ি ও কোমলের 'যোগিয়া' কবিতা

আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্‌খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে।
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্‌ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা একটু দেছে কি দেখা
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।...

'ভৈরবী গান' কবিতাও একই ভঙ্গীতে রচিত। কবির মন বিষাদক্লিষ্ট, বিরহার্ত্ত, তাহার উপর ভৈরবীর করুণ সুরমূর্ছনা মনের মনে একটি অনুষঙ্গ জাগাইয়া তুলিতেছে। এই বিরহ ক্ষণকালের নয়, ইহা মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন এক গভীর শোকের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, "যারা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ।" এই মৃত্যু-বিদীর্ণ হৃদয়বিলাপ হইতেই 'ভৈরবী গান' কবিতাটি উৎসারিত।

মৃত্যুশোকের স্মৃতি-উদ্দীপক

## ভাবার্থ

এক বিষণ্ণ শান্ত প্রভাতে কোন্‌ অজ্ঞাত-পরিচয় গায়কের উদাস কণ্ঠে ভৈরবী গান শুনিয়া কবির বিভোর বহির্মুখী তরুণ চিত্ত সহসা উচ্ছ্বসিত

ব্যাকুলতায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই রাগিণীর ভাষাহীন স্বরমূর্ছনা তাঁহাকে বেদনায় বিমনা করিয়া গেল, জীবনের সকল কর্মোদ্যম ও প্রতিজ্ঞা ভুলাইয়া এক রিক্ত প্রণয়ের ব্যর্থ বিলাপে কবিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। সহসা ফেলিয়া-আসা কোনো প্রিয়তমার অসংবৃত কেশ রোরুদ্যমান মূর্তি মনে পড়িয়া গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যে সকল প্রিয়জন গৃহান্তরালে রহিয়াছে, সকলের স্মৃতি যেন কবিকে বিহ্বল করিয়া দিল। বর্তমানের ক্লিষ্ট কর্মভারগ্রস্ত শঙ্কাতুর মরুজীবনের তুলনায় সেই সকল প্রতীক্ষমাণা প্রিয়জনের জন্য কবির মন পলাতক হইতে চাহিল। ( স্তবক ১-৪ )

এই বিষাদজড়িত ভৈরবীর স্থর কবির মনে স্মরণের দ্বার খুলিয়া দেয়, কবির চোখে ভাসে একটি ছায়াঘন তরুকুঞ্জের মধুর দিনের স্মৃতি, মধ্যাহ্নের বিরহী কোকিলের অবিরাম কুহুধ্বনি এখনও যেন শ্রবণে আসিয়া প্রবেশ করে। ছায়ালোক-তরঙ্গিত ধীর-প্রবাহিণী গঙ্গার তীরে যেন আজও সেদিনের সেই বালকবালিকা ক্রীড়ায় নিরত আছে। এই সব অস্ফুট সুকোমল স্বপ্ন-স্মৃতিগুলি কবিকে আবিষ্ট করিয়া দেয়। ( স্তবক ৫-৬ )

কবিহৃদয়ের যত অচরিতার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যত নৈরাশ্য ও মর্মকাতরতা জমিয়াছে, এই ভৈরবীর স্থরে সেইগুলিকে আজ তিনি গাঁথিয়া তুলিবেন। অসমাপ্ত কর্তব্যের হতাশ আর্তনাদে আপনার মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হইবেন; এই বিপুল সংসারের শত কর্মব্রত সাধন করার অসম্ভাব্যতায় সংশয়ে আত্মচ্ছিন্ন হইবেন। তারপর একদিন সকাতর দৃষ্টিতে আপনার পলাতক স্থখ যৌবনের জন্য, বিগত বসন্তের জন্য নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন। সহসা অনুভব করিবেন, আপনার নিরাশ নিষ্ক্রিয়তায় জগতের ক্ষতি হয় নাই, কেবল প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখা গেল না, চিরজীবনের তৃষ্ণাও মিটিল না।

( স্তবক ৭-১২ )

কিন্তু এই বিষাদ-ব্যাকুল ভৈরবী গান কবির প্রভাতের পথচলাকে বিবশ করিয়া দিতেছে বলিয়া এই ভৈরবী স্থর তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না। দিবসের উজ্জ্বল সূর্য এখনি উদিত হইবে, অমারজনীর দুঃস্বপ্ন অপগত হইবে। কবি যাত্রা করিবেন সেই ভাগ্যবিধাতাকে স্মরণ করিয়া যাঁহার পাথেয় লাভ করিয়া মহাঅভিযাত্রী দল জীবনপথ পরিক্রমা করিয়াছেন। ( স্তবক ১৩-১৫ )

আর যাহারা বেদনাকৈবল্যের মধ্যেই আত্মনিমজ্জিত হইয়া আছে, পথ জানিয়াও যাহারা ললিত লতাবন্ধনে পথপাশে পড়িয়া থাকিতে চায়, ভৈরবী

গান তাহাদের জন্যই থাকুক। তাহাদের আলস্যমথিত হৃদয়ে এই রাগিণীর সকরুণ উদাসীনতা পরিব্যাপ্ত হোক। তাহাদের বিলাপ-আবেশে তাহারা আত্মমগ্ন থাকুক, কোমল শয্যায় নিদ্রাসুখে তাহারা বিভোর হইয়া থাকুক। কিন্তু কবির জন্য থাক প্রখর দাহ, কঠিন বন্ধুর পথচলা। এই মৃত্যুশঙ্কাপূর্ণ পথচলা সহস্রগুণ সুখকর। ( স্তবক ১৬-২০ )

## আলোচনা

রবীন্দ্রকাব্যে চরম নৈরাশ্যবাদী কবিতা

'ভৈরবী গান' কবিতাটি সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন যে, এত নৈরাশ্যপূর্ণ কবিতা রবীন্দ্রনাথ জীবনে আর লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহা ইতিপূর্বে গ্রন্থের প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবিতার মূলে যে মৃত্যুশোক আছে তাহাও তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "আঘাতের নৈদারুণ্যে প্রথমে কিছুদিন তিনি অন্তর্লোকে একটা নৈরাজ্যের মত অনুভব করিয়াছিলেন। মানসীর 'ভৈরবীগান' কবিতায় এই ভাবটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এমন নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যপূর্ণ কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নাই—মানসীতেও নয়।"

বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য

অথচ এই কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকগণ ইতিপূর্বে এমন বহু অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করিয়াছেন যাহার ফলে কবিতাটি সম্পর্কে পাঠকমনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাতীয় সমালোচনার দুই একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"রবীন্দ্রনাথ মানসীতে যে-সমস্ত স্বদেশ-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলিই বিদ্রূপাত্মক নহে। এই কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, আমি আর উদাস-করা বিষণ্ণ সুরের গান শুনিতে চাহিনা, তাঁহার পথিক পরাণ যাইতে যাইতেও পিছন ফিরিতে চায় এই করুণ সুরের মোহে। আঁটা মতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করিতে বড় আরাম, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম; কিন্তু প্রখর তপন-দিবস আর রাক্ষসী তিমির-রজনীর ভিতর দিয়া যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে—

যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

কারণ তাঁহার প্রাণশক্তি সামান্য হইলেও তাঁহার মনে জগতের দুর্গতি ও দুঃখহরণ করিবার ব্যাকুলতা জাগিয়াছে—

কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা হরিতে।

অতএব কবি সংকল্প করিতেছেন—

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন
নিঠুর আঘাত চরণে।…
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।"

রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য,

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"ভৈরবী গানটি 'পরিত্যক্ত' কবিতার পরিপূর্তি রূপেও দেখা যাইতে পারে। প্রাচীনেরা উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বা ত্যাগ করিতে উদ্যত, কারণ তাঁহাদের মতে, রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীলতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগ সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই ভৈরবী গান গাওয়া বৃথা; মন উদাস করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তৃপ্ত করিবার উপাদান উহাতে কম—

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই প্রভাতে।…ইত্যাদি

পরিত্যক্ত কবিতায় কবি যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাই এই কবিতাটিতে বলিলেন অন্যভাবে; দেশবাসী অতীতের মোহে অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকিতে চায়, বাস্তবের সহিত মুখোমুখি হইতে তাহাদের ভয়। বর্তমানের দৈনন্দিন সংগ্রাম দৃঢ় আদর্শবাদের অভাবে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতেছে না। কবি এই পরাভবকে জাতির নৈতিক পরাজয় বলিয়া মনে করিতেন, তাই কবির যাহা করণীয় তাহাই তিনি করিতেন, ভাষার কাকলিতে আশাহীন জীবনে প্রাণের স্পন্দন আনিবার চেষ্টা।"

মোহিতলাল মজুমদারও কবিতাটিকে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক হইতে ব্যাখ্যা না করিয়া সাধারণীকৃত করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে,

মোহিতলাল মজুমদার

"আমরা স্বভাবতই কর্মবিমুখ অলস জাতি। সামান্যে আমরা সন্তুষ্ট, কর্তব্যের কঠিন পথে পদচারণা করিবার কিছুমাত্র বাসনা আমাদের নাই। দুর্গম দুরূহকে জয় করিবার অভিযানে

আমাদের উৎসাহ নাই, অল্পেই ক্লান্তি জাগে, শান্তির নীড়ে বিশ্রামলাভের বাসনাই আমাদের চরম বাসনা। রবীন্দ্রনাথ ঐ মোহমুগ্ধ ভাবাবেশকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার কবিতায়। কিন্তু এই ভাবাবেশ-বিরোধী একটা নীতি ঘটিত সত্যের কথাও কবিতার একাধিক স্তবকে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ভাবাবেগের উপর এই জাতীয় নৈতিক হিতাহিতজ্ঞান সর্বদা আর্টের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই।"

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যাও কবিতাটির অন্তর্নিহিত শোক-সূত্রের উৎস সন্ধান না করিয়া বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সহিত মিলাইবার অকারণ প্রয়াসে পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন,

"হতাশার কুয়াশায় আচ্ছন্ন, জড়তার হিমশীতল-বন্ধনে জর্জরিত অন্তঃসার-হীন বাঙালী সমাজের অচল অবস্থার কথা কবির কাব্যে বিদ্রূপ ও বেদনায় প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই চিরন্তন নৈরাশ্যের গান গাহিতে গাহিতে কবিচিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কোনো আশার আলো দেখিতেছেন না। কোনো কর্মময় সবল জীবনের আহ্বান তাঁহার নিকট পৌছায় না, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবনের নিশ্চেষ্টতা ও আরাম যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে।"

আশ্চর্যের বিষয়, 'ভৈরবী গান' কবিতাটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক ও সমাজচেতনা বিষয়ক কবিতার সহিত মিশিয়া এক প্রকার জটিল অর্থের উদ্বোধন করিয়াছে। কিন্তু কবিতাটি মানসীর একটি বিশিষ্ট প্রেম কবিতা। গাজিপুরে রচিত কবিতাগুচ্ছ সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে,

অজিতকুমার চক্রবর্তী

"মানসীর অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরে লেখা।...কিন্তু সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি অনুভব করিলেন যে, সৌন্দর্যের কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের তৃপ্তি নাই। কর্মহীন জীবনের একটা অবসাদ তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।"

এই অবসাদ রাজনৈতিক চেতনায় দেশচেতনায় সমাজচেতনায় এবং প্রেমচেতনায় সমগ্রভাবেই পড়িয়াছে এবং 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'কবির প্রতি নিবেদন', 'গুরু গোবিন্দ', 'পরিত্যক্ত' ইত্যাদি কবিতার পর 'ভৈরবী গান' রচিত বলিয়া ইহার সম্পর্কে সমালোচকদের

মনেও ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ 'ভৈরবী গান' কবিতাটির সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে 'শূন্য গৃহে', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'জীবনমধ্যাহ্ন', 'প্রকৃতির প্রতি', 'শ্রান্তি', 'মরণ স্বপ্ন', 'বিচ্ছেদ', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে। অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই একটি আকস্মিক চিত্তবিক্ষোভ, বিশ্বাসহীন নৈরাশ্য, অচরিতার্থ বেদনার রুদ্ধ অশ্রুজল মৃত্যুমুহূর্তের বিশ্বব্যাপী পদধ্বনি নিহিত, 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় দেখি সমগ্র প্রকৃতির উপর কবির রুদ্ধশ্বাস শোক বিকীর্ণ হইয়া প্রকৃতিকে স্নেহহীন দুর্বোধ পদার্থে পরিণত করিয়াছে। 'তুষার কঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার' 'মরণ স্বপ্ন' কবিতার পংক্তি হইতে পাঠকমনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতার

সমকালীন নৈরাশ্যের কবিতা

বৃহৎ বিষাদছায়া বিরহ গভীর
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর—

এই পর্বের সবগুলি কবিতারই যেন পটভূমিকা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনার শূন্যতা হইতে সবেগে বাহির হইয়া আসিবেন, জীবনে তাঁহার অনেক কর্ম অনেক প্রতিশ্রুতি আছে। কবি হিসাবে কত সংকল্প ও সাধনাই তাঁহার ছিল। সেই কর্মময় জীবনের জন্য ক্ষীণ তরঙ্গ প্রাণতন্ত্রীতে কাঁপিতে থাকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নির্বিকল্প গভীর আত্মকেন্দ্রিক শোকবেদনা ও বহির্জগতের দিকে কর্মোদ্যত অনুপ্রাণনা এই উভয়ের দ্বন্দ্বে কবির মানসিক স্থিতি-বিচলনের চিত্র খানিকটা আছে 'ভৈরবী গানে'।

ভৈরবী গানের দ্বন্দ্ব

ইহা কবিজীবনের একটি অতি বাস্তব সমস্যা বলিয়াই এমন তীব্র আকারে তাহা কখনও কখনও নগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়। এই মৃত্যুশোকের বিষাদ হইতে মুক্তি লইয়া কবি কড়ি ও কোমলের যুগেই সংকল্প করিয়াছিলেন মানবের মাঝে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান, জীবন্ত হৃদয়ে সৌরকরে পুষ্পিত কাননে সংগীত সাধনা করিয়া তিনি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। 'পুরাতন' কবিতায় পুরাতনকে বিদায় দিয়াছিলেন তিনি এই বলিয়া—

কড়ি ও কোমলে এই দুই বিপরীত চিন্তার সংঘাত

বাতাসে যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারই মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,

সুদূরে বাজিছে বাঁশি তুমি কেন ঢাল আসি
তারই মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।

'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি' কবিতায় অনুতাপ-শ্রান্তি-অবসাদের অন্তিম প্রার্থনা—

মিছে শোক মিছে এই বিলাপ কাতর
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

'মঙ্গল-গীত' কবিতায় বৃহত্তর জীবনচৈতন্য লাভার্থে কবির নবপ্রবুদ্ধ সংকল্প—

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা-দ্বেষ
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মা গো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা যে বারবার ভাঙিয়া গেছে রুদ্ধ হৃদয়ের সংগুপ্ত বেদনা যে বাহিরের সকল আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কড়ি ও কোমল হইতে মানসী পর্যন্ত তাহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত। ইহারই মধ্যে কবি সান্ত্বনাও পাইয়াছেন বারবার, অনন্ত প্রেমের ধারণা এই পর্বেই কবিচেতনায় অঙ্কুরিত মুকুলিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সোনার তরী চিত্রায় কবি প্রেয়সীকে অন্তরের চিরন্তন নায়িকারূপে এবং বহির্বিশ্বে বিচিত্ররূপিণী সৌন্দর্যময়ী করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তবু সেই চিত্রাতেও সকল দার্শনিক প্রশান্তি, কাব্যিক সুখ, সৌন্দর্যমদির রোমান্টিক প্রাপ্তির মোহাবেশ চূর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের মত সেই বাস্তব বৈশাখের অনির্বাণ দাহশিখা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—

শোকের তীব্রতা বার বার প্রকাশমান

আবার আহ্বান?
যতকিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান…

হে অশান্ত শান্তিহীন শেষ হয়ে গেল দিন—
এখনো আহ্বান ?

ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম ধর্ম। সেই দ্বন্দ্বময়, ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত হৃদয়ের চিত্রখানিই 'ভৈরবী গান' কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'ভৈরবী গান' কবিতাটি স্নিগ্ধকরুণ, ভৈরবী গানের মতই তাহা ম্লান প্রভাতের শিশিরসজল শূন্যতা লইয়া চাহিয়া আছে। ভৈরবী রাগিণীর সুরমূর্ছন কবির কাছে বিরহস্মৃতি-উদ্দীপক বলিয়া সকাল বেলার ম্লান বিষণ্ণ আলোকে কবির মনে পড়িয়া যায় অতীতের অশ্রুসিক্ত মলিন স্মৃতিগুলি—ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ নৈরাশ্যক্ষুব্ধ অন্তরে অসমাপ্ত কর্ম ও কর্তব্যের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কীই বা করিবার থাকে। তাই স্মৃতিবন্ধনের চরণজড়ানো আর্তি ও সব কিছু উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়ার আবেদন, এই সংকটে 'ভৈরবী গান' কবিতাটি লিখিত।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

( স্তবক ১-২ )

**উদাসমুরতি**—যাহার কণ্ঠে কবি ভৈরবী রাগিণীর আলাপন শুনিতে পাইলেন ইহা তাহারই বর্ণনা। গায়কও যেন উদাসমূর্তিতে বসিয়া ভৈরবী গাহিতেছে, আর এইজন্য রাগিণীতে একটি সকরুণ বৈরাগ্য সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়াছে। **বিষাদশান্ত শোভাতে**—ইহাও সেই গায়কেরই বিবরণ, কিন্তু ঔদাস্য ও বিষাদ আসলে রাগিণীরই বৈশিষ্ট্য, তাহাই যেন গায়কের উপর আরোপিত হইয়াছে। **মোর ঘর ছাড়া……শোভাতে**—ভৈরবী রাগিণীর মধ্যে যে ব্যাপ্ত কারুণ্য, কোমল পর্দার পেলবতা ও মাধুর্য আছে, তাহা কবিকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করিতেছে। একেই তিনি গৃহের বন্ধন ফেলিয়া ঘর ছাড়িয়া পথের প্রেমে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর তাঁহার কোমল হৃদয় ভৈরবী গানের সুরে আরও বিহ্বল হইয়া পড়ে।

**মন-উদাসী……কাকলি**—ভৈরবী রাগিণী সম্পর্কে প্রযুক্ত। ইহা মনকে বৈরাগ্যে পূর্ণ করিয়া তোলে ও চিত্তে নৈরাশ্য সঞ্চার করে। কেবল রাগিণীর আলাপন বলিয়া ইহা ভাষাহীন। **দেয় ব্যাকুল পরশে…বিকলি**—ভৈরবীর বিমূর্ত সংগীত কবির জীবনে এক প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতার সৃষ্টি করে বলিয়া জীবনের সকল কর্মোদ্যম স্তিমিত হইয়া যায়।

**ব্যাখ্যা—দেয় চরণে বাঁধিয়া……শিকলি**—ভৈরবী রাগিণীর বিষণ্ণ সুরমূর্ছনা শ্রবণ করিয়া কবির বৈরাগ্য ও দীর্ঘশ্বাসের কারণ এইবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভৈরবী গানের সহিত তাঁহার কোনো সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ, কোন অচরিতার্থ অপরিতৃপ্ত প্রেমবেদনার মর্মযাতনা মিশিয়া আছে। ইহার সুর শুনিলে কবির তাই সেই পুরাতন প্রেমস্মৃতি উন্মথিত হইয়া যায়। সেই প্রেমের স্মৃতি বিরহিত বিলাপে অশ্রুকারুণ্যে তাঁহার গতি অবরুদ্ধ করিয়া তোলে, মনে হয় কেহ যেন চরণে প্রেমের অশ্রুকাতর শৃঙ্খল পরাইয়া দিতেছে। সংক্ষেপে, কবি করুণতম কোনো প্রেমের স্মৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই কারণে প্রেমের স্মৃতি প্রভাতের বিষণ্ণ ভৈরবী গানের সহিত মিশিয়া কবিজীবনকে অব্যক্ত বেদনায় আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। তখন জীবনের সকল কর্ম-সাধনা-প্রতিজ্ঞা-সংকল্প সবই নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। 'আমার রাত পোহাল' গানে বাঁশির প্রভাতী রাগিণী শুনিয়াও কবির মনে হইয়াছিল,

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।

( স্তবক ৩-৪ )

**যারে ফেলিয়া……কেশভার**—ভৈরবীর করুণ সুরমূর্ছনা কবিকে স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল—যাহাকে অনেকদিন পূর্বে হারাইয়াছেন, সহসা তাহাকে একবার দেখিবার জন্য সমস্ত মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সে এখন কোন অজানা দেশে আলুলায়িতকুন্তলা হইয়া হয়ত কবির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তুলনীয়, কড়ি ও কোমলের 'আজি শরত তপনে' কবিতায়—

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন ছায়াময়ী অলকায়,
আজি কোন উপবনে বিরহবেদনে
আমারই কারণে কেঁদে যায়।

**যারা গৃহছায়ে……সে সবার**—স্মৃতি এখানে ব্যক্তির জন্য নয়, সমষ্টির জন্য বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। যাহারা ব্যর্থ প্রেমে ব্যাকুল হইয়া গৃহান্তরালে প্রিয়জনের জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিতেছে সেই সকল প্রতীক্ষমাণার অশ্রুসজল মুখগুলি কবিকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিতেছে। ইহার

সহিত টেনিসনের Lotos-Eaters কবিতার এই ছত্রগুলির প্রতি সমালোচকগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—

Dear is the memory of our wedded lives,
And dear the last embraces of our wives
And their warm tears.

**ব্যাখ্যা—এই সংকটময়……পাহারা**—এক বিষাদশান্ত প্রভাতে করুণ ভৈরবী রাগিণীর স্বরমূর্ছনা শুনিয়া কবির ঘরছাড়া পথিকপরাণ সহসা এক অনির্বচনীয় বেদনায় বিহ্বল হইয়া গেল এবং তাঁহার স্মৃতিপটে অতীতের পলাতক প্রেমস্মৃতি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। কোনো হারাইয়া-যাওয়া প্রিয়জনের মুখ, অশ্রুসজল চাহনি, কোনো সজল প্রতীক্ষা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই রাগিণীর সহিত এমন একটি বৈরাগ্য মাখানো যাহা কবিকে স্বভাবতই কর্মবিমুখ করিয়া তুলিল। ইহার সহিত অকৃত প্রণয়ের অচরিতার্থ বিষাদ যুক্ত হইয়া কবির বাস্তব সংসারের কর্মোদ্যম ও সাধনা, আদর্শ ও সংকল্প সবই ভুলাইয়া দিল, জীবনের উপর একটি নিষ্ফলতা আরোপ করিল। যে ব্রত ও একাগ্রতা লইয়া কবি জীবনের পথে চলিতেছিলেন, তাহা এক মুহূর্তে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং সমগ্র কর্মময় সংসার নৈরাশ্য ও হতাশায় পাণ্ডুর মরীচিকাঘন মরুভূমিতে পরিণত হইল। কবি যেন এক মরুভূমির নিঃসঙ্গ যাত্রী—কোথাও কোনো আশ্রয় নাই, সাহায্য নাই, সঙ্গীস্বজন নাই—আর দূর হইতে এক মায়াবেষ্টিত দৈত্যের প্রাসাদপুরী দেখা যাইতেছে, সেখানে কোনো ভয়াবহ দৈত্য সেই পুরী প্রহরায় নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্তমান যেমন কবির কাছে বিষাদগ্রস্ত, ভবিষ্যৎও সেইরূপ নিরাশ ও নিরাশ্বাস বলিয়া মনে হইল। (এই দৈত্য শব্দটির মধ্যেও টেনিসনের লোটস-ইটার্স কবিতার শব্দসাদৃশ্য লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—

Where the wallowing monster
Spouted his foam-fountain, )

( স্তবক ৫-৬ )

**সেই ছায়াতে……মর্মর পবনে**—কোনো রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের মর্মরমুখরিত ছায়াঘন লতাকুঞ্জের স্মৃতি কবির মনে পড়িতেছে। এইরূপ দ্বিপ্রহর কবির চিরকালই প্রিয়। তুলনীয়—

"আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর আমি উদাসী।

রৌদ্রমাখানো অলসবেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কা মুরতি তব নীল আকাশে নয়নে উঠে গো আভাসি।"
(উৎসর্গ)

**সেই মুকুল-আকুল-বকুলকুঞ্জ-ভবনে**—কোনো মঞ্জরিত বকুলশাখাপূর্ণ রোমাঞ্চিত বসন্তের উপবনের স্মৃতি কবিকে উন্মনা করিতেছে। **সেই কুহুকুহুরিত……শ্রবণে**—সেদিন মুকুলমঞ্জরীতে বকুলকুঞ্জ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বিরহী কোকিলের কুহুরবের মিনতিতে মধ্যাহ্ন আতুর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কুহুধ্বনি যেন এই স্মৃতিমন্থিত প্রভাতের ভৈরবী মূর্ছিত কবিচিত্তে এখনও অতীতের পার হইতে ধ্বনিত হইতেছে। টেনিসনের প্রাগুক্ত কবিতাতেও নির্জনদ্বীপে পুষ্পবীজভুক্ত অবসাদগ্রস্ত নৌযাত্রীদের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অতীতের সৌন্দর্যময় নদীকলধ্বনিত স্মৃতিগুলি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানেও একই দীর্ঘশ্বাসে তাহারা বলিয়াছে How sweet it were.

**ব্যাখ্যা—সেই চির কলতান……বালিকা-বালকে**—গঙ্গাতীরের কোনো স্মৃতি কবির মনে পড়িতেছে, সম্ভবত গাজিপুরের গঙ্গাতীর তাহারই স্মৃতিউদ্দীপক। কবির মনে হইতেছে, গঙ্গা এখনো একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে—তাহার উদার নদীস্রোত, তরঙ্গধ্বনির আলোছায়াকম্পন অনাদিকাল ধরিয়া একই রকম আছে, ইহার তো কোনোই পরিবর্তন হয় নাই। প্রকৃতি যদি নিত্য কাল অপরিবর্তনীয় থাকে তবে মানব জীবনে কেন পরিবর্তন ঘটে, কেন দুইটি জীবন চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, মাঝখানে অতল অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে? এই প্রশ্নই যেন কবির মনে উদিত হইয়াছে। তাঁহার মনে হইয়াছে, গঙ্গা যেমন নিত্যকাল একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, মানব জীবনের যাহা কিছু সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ তাহাও কোথাও ক্ষয়হীন অপরিবর্তনীয় আছে। কবির স্মৃতিতে যে গঙ্গার চিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়াছে, সম্ভবত তাহা তাঁহার কৈশোর বয়সের। সেই গঙ্গার তীর যেদিন দুই কিশোর-কিশোরীর অর্থহীন ঘনিষ্ঠ ক্রীড়াচাপল্যে মুখর হইয়াছিল। সেই অবোধ মধুর কৈশোর ক্রীড়ার প্রত্যক্ষসাক্ষী গঙ্গা ঠিক তেমনি করিয়াই যখন বহিয়া যাইতেছে তবে সেই দুই কিশোর-কিশোরীর মধুর ক্রীড়া কেন হারাইয়া যাইবে? তাহারাও কোথাও চির কিশোর-কিশোরী হইয়া আজও

এই গঙ্গাতীরেই ক্রীড়ারত, কেবল কবিই দুর্ভাগ্যবশত দেখিতে পাইতেছেন না।

[ রবীন্দ্রজীবনী পাঠকের জানা আছে কবি নিতান্ত বালক বয়সে কলিকাতার ডেঙ্গু জ্বরের মড়কের সময় পেনেটি গঙ্গাতীরে কিছুদিন ছিলেন। তারপর একবিংশ বৎসর বয়সে বিলাত হইতে ফিরিয়া কবি চন্দননগর গঙ্গাতীরে কয়েক দিন কাটান। ইহার সম্পর্কে জীবনস্মৃতির 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়টি পঠিতব্য—

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! ...আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।" ]

**ধীরে সারাদেহ......পলকে**—এই সকল রোমাঞ্চিত স্মৃতি কবিকে অতীতের স্বপ্নমদির নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে এবং ক্রমশ বস্তুভারহীন রহস্যময় মায়াময় জগতে কবিচেতনা বিলীন হইয়া যাইতেছে। স্বপ্ন অর্থাৎ স্মৃতিস্বপ্নকে কবি একটি পাখির সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং পাখির পালকের কোমল স্পর্শ যেমন নিদ্রা-আহ্বায়ক তেমনি এই স্মৃতিগুলিও কবিকে বাস্তব হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। টেনিসন এই অবস্থা সম্পর্কেই লিখিয়াছিলেন,

With half-shut eyes ever to seem
Falling asleep in a half-dream!

( স্তবক ৭-৮ )

**অতৃপ্ত যত......মর্মকাহিনী**—একদিকে পুরাতন অপরিতৃপ্ত প্রেমের স্মৃতিডোর অন্যদিকে অকৃত কর্মের জন্য অনুতাপ—এই আত্মসংকটে 'ভৈরবী গান' কবিতাটি ক্ষতবক্ষ। এই পংক্তি হইতে কবির সেই সংশয় জাগিয়াছে। তাঁহার চিত্তে কত মহৎ ব্রত ও সংকল্প ছিল, এখন সেইগুলির অসমাপ্তির বেদনা তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতেছে। **এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবনবাহিনী**—মহান উদ্দেশ্য ব্রত ও সংকল্পকে কবি একটি নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই নদী তাহার গতিপথটি সম্পূর্ণ করিতে পারিল না, চিত্তের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াই তাহার ধারা পথটি শুষ্ক হইয়া গেল।

**ওই ভৈরবী······কাহিনী**—এই অতৃপ্ত কর্মের জন্য নৈরাশ্য কিছুকাল ধরিয়াই কবির অন্তরে জমিতেছে। এখন তাঁহার মনে হইতেছে যে, একমাত্র ভৈরবীর ঐ সুরমূর্ছনার দ্বারাই সেই মর্মদাহনকারী অতৃপ্ত নৈরাশ্যকাহিনীকে তিনি সংগীত করিয়া তুলিবেন।

**সদা করুণ কণ্ঠ······রবে না**—কবি ভৈরবী রাগিণী-গীতে তাঁহার কর্ম-বিমুখ আশাবঞ্চিত নিরাশ জীবনের বিলাপকে সংগীত করিয়া বাজাইবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। যাহা অসমাপ্ত রহিল তাহা কোনোকালেই সমাপ্ত হইবার নয়, এইরূপ হতাশ আক্ষেপই তাঁহার গানে ধ্বনিত হইবে। পৃথিবী মায়া-রচিত বিগ্রহ মাত্র, এখানে কোনো সংকল্পই সত্য নয়, কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়—এই নশ্বরতার সংগীতই কবির একমাত্র প্রতিপাদ্য হইবে। টেনিসনের কবিতাতেও এই নশ্বরতার বিলাপ আছে। যথা—

Death is the end of life ; ah why
Should life all labour be ?
Let us alone. Time driveth onward fast,
And in a little while our lips are dumb.
Let us alone. What is it that will last ?

**কেহ জীবনের······লবে না**—জীবনের মহৎ ব্রত ও সাধনা সংকল্প ও আদর্শ কোনোদিনই সার্থক হইবে না, তাহারাও এই পৃথিবীতে নশ্বরতা প্রাপ্ত হইবে। কবির অসমাপ্ত প্রতিজ্ঞা অপরে কেহ পালন করিবে না।

( স্তবক ৯-১০ )

**ব্যাখ্যা—এই সংশয় মাঝে······মত আঁটিয়া**—সহসা জীবনের নশ্বরতায় কবি আরও নৈরাশ্যপীড়িত হইলেন এবং ক্রমশ কর্মের উদ্যম শিথিলতর হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে পুরাতন প্রেমের রোমাঞ্চিত স্মৃতি ও মহৎ কর্মের সংকল্পের মধ্যে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সাময়িক অবকাশ ঘটিল। এক ব্যর্থতার করুণ বিলাপে তিনি আত্মমগ্ন হইলেন। প্রভাতের বিষণ্ণ ভৈরবী তাঁহার চিত্তে সংসারের অনিশ্চয়তাকেই যেন প্রবলভাবে স্মরণ করাইয়া দিল বলিয়া ঐ ভৈরবী সুর দিয়াই কবি তাঁহার আপন চিত্তের নৈরাশ্যকে সংগীতে গাঁথিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই মায়া-

কলিত বিশ্বে যখন কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, একটি নশ্বরতার বেদনায় সমস্ত বিশ্বসংসার ক্রন্দমান তখন আমাদের ব্রতসাধনাও নিষ্ফল। আমাদের সকল কর্মোদ্যোগ অর্থহীন, কারণ কাহার জন্য আমাদের এই শ্রমাপচয়? কেহই যখন অবিনশ্বর নয়, তখন কাহারও জন্য আমাদের বেদনা-বিদীর্ণ হইবারও প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে সত্য মিথ্যা সম্পর্কেও চরম কিছু বিভাজন হইয়া যায় নাই। আজ যাহা সত্য কাল তাহা মিথ্যায় পরিণত হইবে।

[ আলোচ্য পংক্তিগুচ্ছে যে কর্মনৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে মোহিতলাল যথার্থই বলিয়াছেন যে, টেনিসনের লোটস্ ইটার্স কবিতার দ্বারাই তাহা প্রভাবিত। অবশ্য উভয় কবিতার প্রেরণা বক্তব্য ও প্রকার ভিন্ন, কিন্তু পংক্তি, স্তবক ও শব্দগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। যথা, বর্তমান পংক্তিগুলির সহিত তুলনীয়—

Why should we toil alone,
We only toil, who are the first of things,
And make perpetual moan……
Why should we only toil, the roof and crown of things ?
What pleasure can we have
To war with the evil ? Is there any peace
In ever climbing up the climbing waves ?]

**কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা হরিতে**—শিশির বিন্দু সামান্য এক ফোঁটা জল, তাহার দ্বারা যেমন জগতের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না, তেমনি কবির দ্বারাও জগতের অকল্পনীয় বৃহৎ অসমাপ্ত কাজ কখনই সমাধা হইতে পারে না। সুতরাং জগতের অকৃত কর্মের ব্যাপ্তি এবং আপনার সামান্যতা, এই দুয়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য আছে তাহাই কবির নৈরাশ্যকে ঘনীভূত করিয়াছে এবং কবিকে নিশ্চিতভাবে কর্মবিরাগী করিয়াছে। **কেন অকূল সাগরে……তরীতে**—কর্মের মধ্যে কবি প্রথমে মহৎ বাসনা ও ব্রত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে আপনার সামান্য জীবনের দ্বারা জগতের মহত্তর কর্ম-সমাধানের আশা ছাড়িয়া দিলেন। এই বৃহৎ জগতের অচরিতার্থ কর্মের তুলনায় কবির ক্ষমতা

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই তিনি কর্মবিমুখ হইতে চান এবং স্বপ্নমদির নেশায় স্মৃতিবিহ্বলতায় তাঁহার দিনগুলি ভরাইতে চান। তাঁহার ক্ষীণ আয়ুর জীর্ণ তরণীর সাহায্যে বিপুল কর্মসমুদ্র লঙ্ঘন করা যাইবে না।

( স্তবক ১১-১২ )

**ব্যাখ্যা—শেষে দেখিব পড়িল……আছে বসিয়া**—জীবনে কর্মের অভাব নাই, কিন্তু মানুষের নশ্বর ক্ষীণায়ু জীবনের পক্ষে সেই কর্মসমাধা করা বাতুলতা বলিয়া কর্মহীন নিষ্ক্রিয় স্বপ্নময় জীবনকেই 'ভৈরবী গানে'র কবি বরণীয় মনে করিতেছেন। কর্ম ও অকর্মণ্যতার মধ্যে কবি সংশয়াচ্ছন্ন, সত্য মিথ্যা সম্পর্কে তিনি কোনো চিরন্তন ধারণায় বিশ্বাসী নহেন, অকূল কর্মসমুদ্রে আয়ুর জীর্ণ তরণী লইয়া ভাসিতে তাঁহার আর স্পৃহা নাই। হয়ত এইভাবে মিথ্যা কর্মগৌরবে মাতিয়া একদিন তাঁহার ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে অজ্ঞাতসারে নিঃশেষ করিয়া অনুতাপ করিবেন। কখন যে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া বসন্ত নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল, কবি সাড়া দিলেন না। কিন্তু কিসের জন্য এই নিঃশব্দ অর্থহীন ত্যাগ, এই নিষ্ফল বসন্ত-প্রত্যাখ্যান, এই অকারণ যৌবন অপচয়? যে মহৎ কর্মের জন্য কবি এইভাবে তাঁহার আয়ু ক্ষয়িষ্ণু করিলেন, একদিন সকাতর চিত্তে তিনি আবিষ্কার করিবেন, সেই মহৎ কর্ম কিছুই সাধিত হয় নাই, ইহার দ্বারা জগতের কোনো উপকার হয় নাই। জগৎ পূর্বে যেমন ছিল তেমনি আছে।

**শুধু আমারই……তিয়াষে**—জগতের উন্নতি একবিন্দুও সাধিত হইল না, অথচ মিথ্যা মহৎ কর্ম ও কর্তব্যের লোভে কবি তাঁহার জীবনকে অপচয়িত করিলেন। **এই দগ্ধ হৃদয় এতদিন আছে কী আশে**—নৈরাশ্যক্ষুব্ধ ব্যর্থতাভার-পীড়িত কবিচিত্ত কিসের আশায় এতকাল বাঁচিয়া আছে তাহা কবি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। **সেই ভাগর নয়ন………দিয়া সে**—একদিকে প্রেমস্মৃতি অন্যদিকে কর্তব্যকর্ম এই উভয়ের সংকট ও সংশয়ই 'ভৈরবী গান' কবিতাটির ভাববস্তু। কবি মনে করিতেছেন, একবার প্রিয়জনের স্মৃতির মধ্যে আকুল হইয়া আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবেন, আবার কখনও মনে করিতেছেন, জীবনের বহুতর মহৎ কর্তব্য সমাধা করিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্মগৌরব তাঁহাকে আকর্ষণ করিল না। কর্মের প্রতি অনন্যচিত্ত হওয়ার ফলে তিনি আশঙ্কা করিলেন, তাঁহার ক্ষণস্থায়ী যৌবন কখন নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে।

এই শুষ্ক কর্মানুগত্য তাঁহাকে প্রিয়জনের স্মৃতি হইতে দূরে অপসারিত করিবে। তারপর নিষ্ফল অন্তরে তিনি একদিন অনুভব করিবেন, তাঁহার প্রিয়জনের সেই আয়ত নেত্রের দৃষ্টিপাত, সেই স্মিত অধরের প্রসন্নতা কখন হারাইয়া গিয়াছে।

( স্তবক ১৩-১৪ )

**ব্যাখ্যা—ওগো থামো যারে……ছেয়ো না**—সহসা এই স্তবক হইতে কবি আবার আপনার পূর্বচিন্তার প্রতিবাদ করিলেন। অষ্টম স্তবক হইতে দ্বাদশ স্তবক পর্যন্ত ছিল কবির করুণ কণ্ঠের স্বগতোক্তি, বিষণ্ণ প্রভাত বেলার ভৈরবী গান শুনিয়া কবির যাহা মনে হইয়াছিল। এখন পুনরায় তিনি আপন নৈরাশ্যের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন, অশ্রুসজল ভৈরবী গানে আর তাঁহার প্রয়োজন নাই। কর্মের জগৎ হইতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কবি মধুর-বিধুর স্মৃতি-সুখে আচ্ছন্ন হইতে চাহেন না, কারণ যে প্রিয়জন চিরকালের মত বিদায় লইয়াছে তাহার জন্য বিলোপে আর কী ফল? এখন তাঁহার কবি-জীবনের তরুণ সূচনা, জীবনের যাত্রাপথের এই প্রারম্ভিক মুহূর্তকে তিনি হতাশায় পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন না।

**কুহক রাগিণী**—ভৈরবীর করুণ স্বরমূর্ছনা তাঁহাকে বিষণ্ণ অতীতের দিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিতেছিল বলিয়াই তাহাকে মায়াবিনী রাগিণী বলিতেছেন। **বিবশে**—অবশ করিয়া দেয়। **পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন দিবসে**—ভৈরবী প্রভাতের প্রথমক্ষণের রাগিণী। কিন্তু এখনও দিবসের অধিকাংশই বাকি রহিয়াছে, সূর্যালোক এখনও তীব্র হয় নাই। সুতরাং প্রভাত সূচনাতেই মনকে বিকল ও নৈরাশ্যময় করিবার প্রয়োজন নাই। **পথে রাক্ষসী…নিবসে**—অন্ধকার রাত্রি স্মৃতি ভারাক্রান্ত ও অশুভ ইঙ্গিতে পূর্ণ বলিয়া তাহাকে রাক্ষসী বলা হইয়াছে। **নিবসে**—বাস করে।

( স্তবক ১৫-১৬ )

**ব্যাখ্যা—থামো শুধু একবার……ধরিয়া**—ভৈরবীর বিষণ্ণ আলাপন শুনিয়া কবির মন প্রভাতে এলায়িত হইয়া পড়িয়াছিল, আলস্যে কর্মবৈরাগ্যে নিষ্ফলতার আবেশে তিনি ভাবিয়াছিলেন এই বিষাদমগ্ন সুরেই জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতিক্রান্ত করিবেন। কিন্তু এই আবেশ-বিহ্বলতা স্থায়ী হইল না। জীবনের কর্মের, বিশেষ করিয়া, মহৎ কর্মের প্রতি তাঁহার

নিস্পৃহতা সাময়িকভাবে প্রকাশ পাইলেও শেষ পর্যন্ত বৃথা স্মৃতিরোমন্থন অপেক্ষা জীবনের কর্মক্ষেত্রে যাত্রা করাকেই তিনি অভিপ্রেত মনে করিলেন। তাই ভৈরবী রাগিণীর আলাপরত গায়ককে কিংবা আপন মূর্ছাতুর স্বগত কণ্ঠকে নিরুদ্ধ করিয়া তিনি ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহার এই নবজীবনের সূচনায় তিনি সেই ভাগ্য বিধাতার উপর আস্থা রাখিবেন, যাঁহার আশিস্ লাভ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া অগণিত যাত্রীদল জীবনপথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহার সহিত কবি অনুসরণ করিবেন সেই সকল মহাপুরুষদিগের আদর্শ, যাঁহারা দৈবশক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা নিখিল মানবের নিকট যে সাধনার পথরেখা চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন, কবি সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

**যাও তাহাদের কাছে……কাঁদিয়া**—ইহা সেই অলস আবেশময় ভৈরবী রাগিণীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। কবি নিখিল জগতে মহাপুরুষদের কর্তিত পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত দিবসের কর্তব্য-কঠোর সূর্যালোকে আগাইয়া যাইবেন, ভৈরবীর মোহমদির বিষণ্নতায় মুগ্ধ থাকিবেন না। কিন্তু এখনও যাহারা গৃহকারায় আবদ্ধ রহিয়াছে, অন্তর হইতে যাহারা শোকের গভীর ভার নামাইতে পারিতেছে না, ভৈরবী গান তাহাদের প্রলুব্ধ করুক। তাহাদের অবসন্ন হৃদয়বেদনার সহিত ভৈরবী আপনার করুণ সুরমূর্ছনা মিশাইয়া ফেলুক, ইহাই কবির বক্তব্য। **তারা পড়ে………সাধিয়া**—সেই সকল শোক-বিলাসীগণ আপনাদের স্বরচিত দুঃখবাদে আপন কর্তব্য কর্মের পথ স্বেচ্ছায় রোধ করিতেছে।

( স্তবক ১৭-১৮ )

**ব্যাখ্যা—হায় উঠিতে চাহিছে…টুটিতে**—কবি এই পংক্তিদ্বয়ে পৃথিবীর দুঃখবাদীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কবি প্রভাতের বিষণ্ন মুহূর্তে ভৈরবীর অবসন্ন রাগিণী শুনিয়া মূর্ছাতুর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অবসাদ তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এখনও অনেক শোক বিলাসীর দল গৃহকারায় স্বেচ্ছারচিত কারাগারে হৃদয়বেদনার শৃঙ্খলে বন্দী রহিয়াছে। তাহারা এতই শোকাভিভূত যে, কোনোমতে বিষাদভার কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই বিষাদ ও বৈরাগ্য ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি নাই। বিষণ্নতা যেন তাহাদের চরণে লতার মত বন্ধন দিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছিন্ন করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।

**তারা পথ……লুটিতে**—শোকাবসাদ নয়, কর্তব্যকর্ম ও জীবনসাধনাই যে মানুষের ব্রত ইহা জানিয়াও তাহারা সেই অবসন্ন হৃদয় আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে।

**ব্যাখ্যা—তারা অলস বেদন……বাহিয়া**—সেই সকল দুখবিলাসী বৈরাগীদের উদ্দেশ্যে কবি বলিতেছেন যে স্বেচ্ছারচিত শোককারাগারে যাহারা বিষাদের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাদের মুগ্ধ করিবার জন্যই এই প্রভাত বেলার ভৈরবী সুর। উহার ললিত-পেলব কোমল মাধুর্যে সুর মিশাইয়া তাহারা শোকসংগীত গান করুক; তাহাদের বেদনাকে অলসভাবে তাহারা উপভোগ করুক। মধুর বিষাদে তাহারা আবিষ্ট হইয়া থাকুক; স্বপ্নের দূরবর্তী কোনো আলোকের দিকে তাহাদের কল্পনা প্রসারিত হোক। তাহাদের বিলাপ, তাহাদের দীর্ঘশ্বাস শোকের বিলাসিতা মাত্র। তাহারা শোকের সুমধুর সংগীত রচনা করিয়া দিনরাত্রি পূর্ণ করিয়া রাখুক, কবির কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যে তাহাদের মত শোকবিলাসী হইতে চাহেন নাই, তিনি যে অবসাদের গ্লানিমা কাটাইয়া উঠিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বক্তব্য।

( স্তবক ১৯-২০ )

**সেই আপনার……বুলাবে**—শোকবিলাসী স্বপ্নমুগ্ধদের সম্পর্কে কবির বক্তব্য, তাহারা আপন চিত্তের অবরুদ্ধ বেদনাকে তো দূর করিবেই না, পরন্তু সেই বেদনার সহিত ভৈরবী রাগিণীকে যুক্ত করিয়া নিজেদের চারপাশে একটি মোহাবেশময় আবিল নেশাচ্ছন্নতার সৃষ্টি করিবে এবং আপনাদের স্বেচ্ছাপূর্বক সেই আবেশের কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবে। এইরূপে তাহারা আপনাদের অস্তিত্বকে সস্নেহে একটি শোককৈবল্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে। শোকবাদীদের প্রতি কবির একটি সূক্ষ্ম প্রতিবাদও যেন এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

**ব্যাখ্যা—ও গো এর চেয়ে……সেই চরণে**—এই জীবন কবির কাছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। কবিতার প্রথমে কবিও তাহাই চাহিয়াছিলেন—এই বিষাদ বেদনাই জীবনের চরম বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রিয়জনের শোকস্মৃতি বক্ষে লালন করিয়া কর্মবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই ক্ষণস্থায়ী জীবনযৌবন শোকসংগীত রচনা করিয়া কাটাইতে চাহিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি কর্মজীবনকেই বরণীয় মনে

করিলেন, অনর্থক শোকবেদনার স্বেচ্ছারচিত বন্ধনের মুক্তি চাহিলেন। তাই প্রভাতের কুয়াশাজড়িত আবেশময় অস্পষ্ট মুহূর্তের স্বপ্নাচ্ছন্নতাময় ভৈরবী গানের বিষণ্ণতা অপেক্ষা দিবসের কর্তব্যকঠোর প্রখর তীব্র সূর্যালোকিত কর্মপথই তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। ইহাকেই তিনি ধ্রুব ও সত্য বলিয়া জানিলেন। এই কর্মজীবনে দুঃখ আছে, পথচলার প্রতিবন্ধকতা আছে, তথাপি ইহা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যকে জাগাইয়া তুলিবে, আবেশে মুগ্ধ করিবে না। সারা জীবন প্রস্তরের মত কঠিন পথে চলিতেও কবি এখন ইতস্তত করিতেছেন না, বরং তাহাই তাঁহার কাছে প্রার্থনীয়। যদি এই কর্ম ও কর্তব্যের পথে তাঁহার জীবনপাত তথাপি এই মৃত্যুও তাঁহার কাছে সুখকর হইবে।

**প্রশ্নোত্তর**

**প্রশ্ন ১। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপর ভৈরবী রাগিণীর প্রভাব কতখানি ছিল এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া 'ভৈরবী গান' কবিতাটির মর্মার্থ লিখ।**

**উত্তর।** ভূমিকা ও ভাবার্থ সংক্ষেপে উদ্ধৃত কর।

**প্রশ্ন ২। 'ভৈরবী গান' কবিতাটি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও, এবং সেইগুলির অসামঞ্জস্য কোথায় দেখাইয়া 'ভৈরবী গান' কবিতাটিকে কোন অর্থে কী প্রসঙ্গে ও পরিস্থিতিতে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও আলোচনা কর।**

**উত্তর।** আলোচনা অংশে বিভিন্ন সমালোচকের মত দেওয়া হইয়াছে। ঐগুলির সংক্ষিপ্তসারের সহিত তাহাদের অসামঞ্জস্যের আলোচনা কর এবং আলোচ্য অংশ হইতে প্রশ্নের দ্বিতীয়ার্ধের উত্তর দাও।

**প্রশ্ন ৩। 'এই সংশয়মাঝে কোন পথে যাই,**
**কার তরে মরি খাটিয়া'—এই পংক্তির মধ্যে কবি কী জাতীয় সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন? এইরূপ সংশয়ের কারণ কী, কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা কর। সংশয়বাদেই কি কবিতাটির সমাপ্তি?**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

# বর্ষার দিনে

## ভাবার্থ

একটি মেঘগর্জিত, ধারাপ্লাবিত ও কালিমাচ্ছন্ন বাদলের রাত্রির নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কবির মন হৃদয়ের একান্ত সমীপবর্তী কোনো প্রিয়জনের নিকট নিঃসঙ্কোচে আপন রুদ্ধবাক্ অন্তরকে উজাড় করিয়া দিতে চাহিতেছে। তখন সমগ্র বিশ্বপৃথিবী দুইটি দৃষ্টিসন্নিধ মানুষকে যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ উভয়ের পারস্পরিক মিলন কামনার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াছে। তখন এই ঐহিক বাস্তব সংসারের কর্মব্যস্ততা ও প্রয়োজনকে নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া দুইটি হৃদয় সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করে। সেই নির্জন একাকারের মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার অশ্রুসিক্ত পারস্পরিক সংলাপ কাহাকেও সামান্যতম বিচলিত না করিয়া দুইটি প্রাণে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। বর্ষণমুখরিত দিবসে নির্জন গৃহকোণে এইভাবে কবি যদি তাঁহার প্রিয়তমের কানে হৃদয়ের গোপন বাণী মেলিয়া আপন মনোবেদনাকে লঘু করিতে পারেন, তাহাতে সমগ্র ব্যস্ত-বিপুল জগতের কোনোই ক্ষতি নাই, তারপর পরিবর্তমান জগতের চঞ্চলতায় সে নিবিড় কর্ণভাষণ কোথায় হারাইয়া যাইবে কে জানে। তাই আজিকার এই অশ্রান্ত বৃষ্টিব্যাকুল বিদ্যুচ্চমকিত দিনে কবি তাঁহার প্রিয়জনের কানে সর্বাধিক অপ্রকাশনীয় কথাটি বলিয়া যাইতে চান!

## আলোচনা

বর্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু। প্রতি বৎসর ধরণীর চেলাঞ্চল উড়াইয়া এই মেঘাবগুণ্ঠিত ঋতুটি কবিতা ও গানের সাজি উজাড় করিয়া দিয়া গেছে।

কবিজীবনে বর্ষা

জীবনের প্রতিটি বর্ষা ঋতুকে কবি সজ্ঞানে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাকে বরণ করিয়াছেন, গানের সুরে তাহার মঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'একাল ও সেকাল' কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বর্ষার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা

হইয়াছে। 'বর্ষার দিনে' মানসী কাব্যের অন্তর্গত একখানি সংগীত এবং রবীন্দ্রগীতরসিকের নিকট ইহা সুপরিচিত একটি বর্ষা-গীতি। সুরই ইহার আবেদন, সুরের ঘনীভূত রস ইহাকে মর্মগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে, সংযত ভাষায়, ইঙ্গিতে-আভাসে, অর্ধব্যক্ত শব্দে ইহা এমন মধুর ও নিবিড় হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে যে, কবিতাটি পাঠ করিলে (এবং গানের সুরে কানে শুনিলে তো বটেই) সমালোচনার ভাষা স্তব্ধ হইয়া থাকে। কেবল একটি নিবিড় বর্ষণব্যাকুল দিবস, একটি নিঃসঙ্গ অন্তরাত্মার অপরিতৃপ্ত ক্রন্দন, একটি মৌনী বিরহ বেদনা মৃদু সজল হওয়ার মত সমগ্র সত্তাকে যেন স্পর্শ করিয়া যায়। সাতটি স্তবকে রচিত ইহা যেন এক চিরবিরহের সপ্তপদী শ্লোক।

একটি সুপরিচিত বর্ষাগীতি

'বর্ষার দিনে' প্রেমের কবিতা। এ প্রেমের নায়ক কবি, নায়িকা এই কবিতায় অনুপস্থিত। বর্ষা কেবল প্রেমের পটভূমিটি রচনা করিয়া দিয়াছে। একটি ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস, একটি সকাতর প্রার্থনা বৃষ্টিঘন বাতাসের কান্না হইয়া বাতায়নে প্রবেশ করিতেছে। দুটি হৃদয়ের পরস্পর মুখোমুখি হইবার একটি দুরন্ত বাসনা কবিমন হইতে কখন পাঠক বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। কিন্তু মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই মিলিত হওয়া যায় না। কারণ, মানসী কাব্যেরই 'মেঘের খেলা' কবিতার ভাষায় বলা যায়—

প্রেমের কবিতা

যেমন প্রাণপণ বাসনা
তেমনি বাধা তার সুকঠিন—

সে বাধা কী, কোথায়, কেন, তাহার কোনো উত্তর কেহ দেয় নাই। তথাপি সেই বাধার জন্যই আমাদের সকল ক্রন্দন বৃথাই বাদল বাতাসে ভাসিয়া যায়, সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘের মত তাহার রঙ মিলাইয়া যায়। তাই কেবল আতুর দীর্ঘশ্বাসে, অচরিতার্থ ক্ষোভে, মিলনের আশ্বাসে এবং বিরহের বঞ্চনায় কবির কণ্ঠভাষা গান হইয়া উঠে—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়।

বর্ষার ঘনঘোর ভয়ংকর রূপটিকে নূতন করিয়া বর্ষায় ফুটাইবার দরকার নাই, কেবল এই বিলাপকরুণ হতাশ আর্তনাদের দ্বারাই দিগন্ত-বিস্তৃত তরল

গম্ভীর রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই বর্ষার সহিত মানবমনের মিলনের উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। পরিণত বয়সে এই ভাবটি, 'বর্ষার দিনে' কবিতার মর্মবাণীটি 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে ফুটাইয়াছেন—

"আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এই যে বর্ষা, এ-তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গীহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিক দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝরঝর করে বলছে—'কৈসে গোঙায়ব হরি বিনে দিন রাতিয়া'।"

শ্রাবণ সন্ধ্যা

কবির আত্মস্মৃতি ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, অত্যন্ত অল্প বয়স হইতেই বর্ষাপ্রকৃতি তাঁহার অপরিণত চেতনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,

"বর্ষাকাল বালকের কাল, বর্ষাকালে শ্যামল কোমলতার মত আমাদের স্বাভাবিক শৈশব স্ফূর্তি পেয়ে ওঠে—বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।"

বর্ষা সম্পর্কে কবির শৈশব স্মৃতি

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, একবিংশ বৎসর বয়সে যখন কিছুদিন গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন, তখন এক একদিন বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইত। সে অভিজ্ঞতার মধ্যেও বর্ষার বিবরণ আছে—

জীবনস্মৃতি

"কখনও বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম।"

আরও প্রৌঢ় বয়সে এই স্মৃতি আরও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে কবির নিকট—

শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায় চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারিকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।

আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত॥
ইমারত ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু করে তার বুক উঠত দুলে।......
বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
( পুনশ্চ : বালক

শৈশবে বাদলের যে নবনীল আষাঢ় কবির নির্বাসিত কিশোর মনকে অকারণ দোলা দিত, যৌবনে তাহার অর্থ গেল. বদলাইয়া। কবির জগৎ মিশিয়া গেল কলিদাস-বিদ্যাপতির জগতের সহিত। বৃষ্টিমুখর দিনের মর্মতল হইতে উঠিল একটি বিরহের চিরন্তন হাহাকার। রোমাণ্টিক কবিমন উপলব্ধি করিল যাহার সহিত আমরা মিলিত হইতে চাই, সে আমাদের মিলনের সকল সীমার অন্তরালে—

যৌবনে চিন্তার পরিবর্তন

হরি রহু মানস সুরধুনি পার।

কিন্তু তাহার সহিত মিলনতো চাই। বিদ্যাপতি বলিলেন, সেই দিনরাত্রির হরি না মিলিলে কেমন করিয়া বিরহিণী বাঁচিয়া থাকিবে—

'কৈসে গোঙায়ব হরি বিনে দিন রাতিয়া ?'

'বর্ষার দিনে' কবিতাটি এই ভাবের ভাষান্তর মাত্র। এখানেও কবি সেই নিত্যকালের কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন, বর্ষা সেই পরম মিলনের লগ্নটিকে ঘনাইয়া তোলে। প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরাত্মাকে আকুল করিয়া তোলে। মনে ঘনাইয়া তোলে একটি বাণী, একটি মিনতি—

অন্যান্য গানের সঙ্গে তুলনা

আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে।...

কারণ শুধায়ো না অর্থ নাহি তার
সুরের সংকেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।
স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে
ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে
কানে কানে গুঞ্জরিব তাই বাদলের অন্ধকারে॥

এই ভাবটিই 'বর্ষার দিনে' কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

**ব্যাখ্যা—এমন দিনে……তমসায়**—একটি মৃদু স্নিগ্ধ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কবিতাটি সূচিত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা ভাষায় অর্ধস্ফুট হইলেও পাঠক মনে ইহার ব্যঞ্জনা দূরপ্রসারী। একটি বাদল নিশীথে বৃষ্টিধারার উত্তাল পতনধ্বনি চারিদিকে একটি বিরল গম্ভীর ও নিবিড় কর্মবিরতি সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ একটি অন্ধকার কর্মহীন বৃষ্টিমুখর মুহূর্তে মানুষের অন্তরে যে প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, কবি তাহাকেই ভাষা দিয়াছেন। এ ভাবাবেগ যেন কোনো একান্ত প্রিয়জনের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য। দিবসের গতানুগতিক সংসারযাত্রায় মানুষ তাহার প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তির সুযোগ পায় না। সাংসারিক ক্ষোভক্ষতি দ্বন্দ্বসংশয় প্রয়োজন ও কর্মভার মনের পথ যেন রুদ্ধ করিয়া রাখে। তাই দুজনের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বার্থহীন নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রকৃতির সহযোগিতার প্রয়োজন—যখন কর্মের কোনো তাড়না থাকিবে না, অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকিবে না, যখন বহির্বিশ্বও একটি অব্যক্ত অথচ ব্যাকুল হৃদয়ভাবে উত্তাল হইয়া উঠিবে। এই আলোকহীন মেঘগর্জিত ভরা বর্ষার লগ্নটি সেই স্বর্ণ-অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই কবির গোপন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—এমন দিনে তারে বলা যায়।

**ব্যাখ্যা—সে কথা শুনিবে……যেন নাহি আর**—বৃষ্টিধারা-ব্যথিত আকাশ পৃথিবীর উপর নির্জনতার আবরণ বিছাইয়া দিল। মেঘের উত্তাল তুমুল মন্দ্রে, অবিশ্রাম বর্ষণ কলরোলে বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে বহির্বিশ্বের কর্ম কোলাহল ও চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে অন্য কোনো মানুষ প্রাণী নাই। কেবল একটি কর্মহীন নির্জন বিরল অবকাশে একটি গৃহকুটীরে দুটি মানব-মানবীর জীবনের পরম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত সমাগত। পরিচিত সংসারের অভ্যস্ত দিনযাপনে প্রেমিক-প্রেমিকার চারিদিকে প্রয়োজনের যে

শত বিঘ্ন বাধা থাকে, এখন সেগুলি অপসারিত। এইরূপ হৃদয় বিনিময়ের একান্ত নিবিড় মুহূর্তে প্রিয়জনের কাছে নিজেকে নিঃশেষে দান করিতে ইচ্ছা জাগে। এ ইচ্ছা একটি রোমান্টিক প্রেমব্যাকুলতা, যাহাকে ভাষা দিয়া যুক্তি দিয়া সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন হৃদয়ে এমন কিছু অর্থহীন প্রেমের কাকলি উদ্ভূত হয়, যাহা প্রেমিকা-ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। এই নিবিড় মিলন যে কেবল আনন্দের তাহা নয়, বরং আমাদের চিত্তের মধ্যে যে সর্বদা একটি অনির্দেশ্য দুর্জ্ঞেয় বিষাদবেদনা আছে, তাহা এখানে প্রকাশ করা যায় এবং প্রেমিকও পরস্পরের বেদনার ভাগ লইয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। আকাশ হইতে নিবিড় অবিশ্রাম বর্ষণের মতই তাহাদের চিত্তের অবরুদ্ধ ভাব বিগলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতে চায় অপরের কাছে।

**ব্যাখ্যা—সমাজ সংসার……গেছে আর সব**—একটি বৃষ্টিমুখর বর্ষা দিবসে মেঘাচ্ছাদিত অন্ধকারে কর্মক্লান্ত কুটীরের বিরল অবকাশে কবি তাঁহার প্রিয়জনের নিকট হৃদয়ের বহু অপরিতৃপ্ত বাসনা ও অপ্রকাশিত গোপন বার্তা উজাড় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

প্রতিদিন মানুষ কর্মজগতের শত বন্ধনে, প্রয়োজনের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া দিশাহারা হয়। সংসারে সকলেই লোভক্ষোভ ঈর্ষাবিদ্বেষে কাতর হইয়া আছে, সেখানে প্রেমের কোনো স্থান নাই, হৃদয়ের গোপন মর্মরের কোনো মূল্য নাই। প্রাত্যহিকতার শরবিদ্ধ হইয়া অন্যান্য অসংখ্য সাধারণ মানুষের মত কবি ও জর্জরিত হইয়া উঠেন, সেখানে প্রিয়জনের মুখোমুখি বসিয়া দুদণ্ড নিবিড় একান্তে পরস্পরের হৃদয়ের আদান-প্রদান সম্ভব হয় না। কিন্তু বর্ষা যেন ক্ষণিকের জন্য সেই নিবিড় মিলনের পরিবেশ রচনা করিয়া দেয়। সে তাহার বর্ষণে গর্জনে অন্ধকারে এই চেনা পৃথিবীর একটি অচেনার আভাস আনিয়া দেয়, একটি কর্মহীন অবকাশের ঘন বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তখন বাহিরের পথে লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, কাজের কপাটে খিল পড়ে। তখন সকল কোলাহল কলরব চাওয়া-পাওয়ার উত্তেজনা লোভক্ষুধা ক্ষয়ক্ষতি সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া পড়ে। তখন প্রতিদিনের কর্মচঞ্চল বাস্তব সংসারটি মিথ্যা মনে হয়, জীবনের সমস্ত তরঙ্গবিক্ষোভ অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। তখন যাহাকে আমরা ভালোবাসি তাহার ভালোবাসার গভীরতায় তলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। নিবিড় দৃষ্টির বিনিময়ের দ্বারা অন্তরের মাধুর্য পান

করিতে, হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করিতে এক দুর্মর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। সেই উষ্ণ আবেগঘন আকাঙ্ক্ষাটির কথাই স্তবকের রোমাঞ্চিত পংক্তিগুলির ভিতর দিয়া রোমান্টিক কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

**ব্যাখ্যা—বলিতে বাজিবে……দুটি প্রাণে**—এক ভরাবাদলের নির্জন অবকাশে কবি তাঁহার প্রেয়সীর নিকট দৃষ্টি ও হৃদয়ের অব্যক্ত ইঙ্গিতময় ভাষায় অবরুদ্ধ প্রেম নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন। বর্ষার এই একান্ত মুহূর্তে উভয়ের কানে কানে প্রচারিত অর্ধস্ফুট সংলাপগুলি কিছু কল্পনা কিছু স্বপ্ন-মদিরতায় পূর্ণ। সেই কথাগুলি সংসারের বাস্তব কর্মচঞ্চলতার মধ্যে হয়ত বেমানান হইত, কিন্তু এই নির্জন ও আত্ম-বিতরণের উন্মুখ মুহূর্তে সেই আপাত-অবাস্তব কথাও কাহাকে পীড়িত বা বিস্মিত করিবে না। দুর্জ্ঞেয় বেদনায় হৃদয়ের গোপন উৎস হইতে উৎসারিত সেই কথাগুলি দুইটি মিলনোৎসুক হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

**তাহাতে এ জগতে……মনোভার**—সংসারের চতুর্দিকে কত শাসন, কত নিষেধ, কত নির্দেশ ও বন্ধন। কিন্তু যদি কবি বর্ষার এক বর্ষণমুখর নির্জন অবকাশে তাঁহার পরমপ্রিয়ের কণ্ঠে আপন মনে গোপন কথা উজাড় করিয়া দিতে পারেন এবং এইভাবে আপন হৃদয়ের অবরুদ্ধতার বেদনা হ্রাস করিতে পারেন, তবে বিশ্বজগতের কোনো ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনাই নাই। গভীর উৎসুক প্রেম নিবেদনের পথে কর্মময় বিশ্ব যে কেবলই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই অভিমানই যেন পরোক্ষে এখানে পাইয়াছে।

**আছে তো তারপরে……পাবে নাশ**—প্রেম নিবেদনের গভীর নিবিড় মুহূর্তটি যে ক্ষণিক, তাহা কবি জানেন। একটি শ্রাবণব্যাকুল দিবসের হঠাৎ-পাওয়া নির্জন অবকাশে তাহা কবির কাছে যদি আসিয়া থাকে, তাহাকে উপভোগ করিবার, বরণ করিবার, গ্রহণ করিবার বাধা কোথায়? কবি জানেন, সেই মন বিনিময়ের কালটি আবার হারাইয়া যাইবে। আবার সাময়িকভাবে কর্মক্লান্ত সংসার নড়িয়া উঠিবে। তখন অসংখ্য মানুষের আনাগোনায়, দৈনন্দিনতার সহস্র আন্দোলনে দুঃখশোকের ক্ষয়ক্ষতির দীর্ঘশ্বাসে গভীর প্রেমের সেই অন্তরঙ্গ বাণীটি কোথায় হারাইয়া যাইবে। তাই সেই ক্ষণমিলনের মধুর লগ্নটিকে পাইয়া কবি হারাইতে চান না।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটির বক্তব্য বস্তুর আলোচনা করিয়া কবিতাটির একটি রসগ্রাহী সমালোচনা লিখ।**

**উত্তর।** 'বর্ষার দিনে' মানসীর অন্তর্গত একখানি ঘনীভূত গীতিকবিতা। যথার্থ গীতিকবিতা একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক। ইহা কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের নিবিড় সুখদুঃখ বিরহ-মিলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি-ব্যর্থতার স্বগত ভাষণ। এই আত্মমগ্ন চৈতন্য-সংলাপকে ছন্দে সুরে ভূষিত করিয়া কবিরা সর্বজনীন করিয়া তোলেন। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি একটি বর্ষামুখর দিবসে এক নিঃসঙ্গ কবিহৃদয়ের নিবিড় মিলনোৎকণ্ঠার পরিচায়ক। বাহিরে যখন শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণ পৃথিবীর সকল বস্তুঘন কোলাহলকে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে, যখন কাজের পথে লোক নাই, ঠিক তখনই মানুষের অন্তরে একটি নৈর্ব্যক্তিক বিরহ ব্যথা উত্তাল হইয়া উঠে। কালিদাস বলিয়াছেন, মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তিচিত্তেও আনমনা ভাব উপস্থিত হয়। যাহার প্রিয়জন নিকটে নাই, তাহার বিষাদ তো আরও প্রবল হইবেই। 'বর্ষার দিনে' কবিতায় সেই বিরহী কবিচিত্ত মিলনের গভীর ব্যাকুলতায় স্তব্ধ হৃদয়ের পূর্ণ বিষাদকে একটি মধুর আকাঙ্ক্ষার সংগীতে দ্রবীভূত করিয়া দিয়াছে।

[ইহার পর কবিতাটির ভূমিকা এবং আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদ সংযোজন করিলেই হইবে।]

---

# অনন্ত প্রেম

## ভাবার্থ

প্রেমিকার নিকট আত্মনিবেদনের নিবিড় মুহূর্তে কবির মনে হয় তাঁহার প্রেম এক জন্মের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। ইহা লোক ও জন্মের চক্রাবর্তন বাহিয়া অনন্তের পথে চলিয়াছে। জন্মে জন্মে যুগে যুগে কবি ও কবিপ্রিয়ার শতরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে, একে অপরকে মাল্যবন্ধনে বাঁধিয়াছেন, সংগীতে মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সে সবই দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতেরই প্রেমলীলা, বহুর মধ্যে একেরই প্রণয়-বৈচিত্র্য। আপনাদের প্রেমের এই অনন্ত স্বরূপ কবিকে সহসা যেন এক প্রকার রোমান্টিক জাতিস্মরতা দান করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালের স্মরণীয় প্রেমপ্রীতির কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে তিনি তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন এবং সে সকল-কিছুকে আপনাদের জন্মান্তরীণ প্রেমলীলা বলিয়া অনুভব করেন। বহুকালের বহু নায়িকার মুখ কবির প্রেয়সীর মুখশ্রীর সহিত একীভূত হইয়া যায়। অনন্ত কালের অন্ধকারে একটি মুখই ধ্রুবতারকার মত দৃশ্যমান হইয়া উঠে।

ইহাই অনন্ত প্রেম। কবি ও তাঁহার প্রেমিকা অনন্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে দেশে কালে অগণ্য প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের মধ্য দিয়া তাঁহারাই নব নব রূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। এই অনন্ত উপলব্ধি লইয়া কবি তাঁহার বর্তমানের প্রেয়সীর দিকে দৃষ্টি দান করিলেন। এই প্রেয়সীর চরণে তিনি নিবেদন করিলেন তাঁহার অনন্ত প্রেমচেতনাকে। অনন্ত সুখদুঃখ, বিশ্বের শাশ্বত মানবাত্মার ভালোবাসা, নিখিল বিশ্বের কবিকুলের প্রেমসংগীত যেহেতু কবির আত্মারই সার্বভৌমত্বের লীলা, সেইজন্য সেই দেশ-কাল পাত্রহীন অনন্ত প্রেমের সংগীত লইয়া কবি তাঁহার নিত্য প্রেয়সীর নামেই অর্পণ করিলেন।

## আলোচনা

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় প্রেমিকের দেহরূপের মধ্যে কবি 'আত্মার রহস্য শিখা' লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া অস্থির হতাশা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, অনন্ত প্রেম না থাকিলে নারীর অনন্ত সৌন্দর্য লাভ করা যায় না। সে অনন্ত প্রেমের স্বরূপ কী? কবি লিখিয়াছিলেন,

নিষ্ফল কামনায় অনন্ত প্রেমের সংজ্ঞা

কী আছে বা তোর;
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয় অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির সহচরে,
চিররাত্রিদিন
একা অসহায়?

ইহাই অনন্ত প্রেমের সংজ্ঞা। অনন্ত প্রেম প্রেমের সার্বভৌমীকরণের ও বিশ্বজনীনতার নামান্তর মাত্র। যথার্থ প্রেম দেহরূপে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা জন্ম জন্মান্তরেও অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা এমন একটি অনুভূতি যাহার দ্বারা আপনার নশ্বরতার বোধ বিলীন হইয়া যায় এবং সংকীর্ণ দেহকারাগার হইতে প্রেমকে বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে মানব-মানবীর মধ্যে অনুভব করিতে চায়। এই বিশাল বিশ্বের ঘূর্ণ্যমান জ্যোতির্মণ্ডলী, অগণ্য গ্রহতারার চক্রাবর্তন, মহাকাশের দুর্নিরীক্ষ্য অসীমতা, কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ দুর্গম উদয় অস্তাচল—এ সকলের তুলনায় দুইটি নরনারীর প্রেম-ভালোবাসা সুখ দুঃখ মিলন বিরহপূর্ণ জীবন কত তুচ্ছ অসহায় ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মানুষের নশ্বর প্রেম ইহার সমস্ত নশ্বরতা ও ক্ষণিকতাকে উপেক্ষা করিতে চায়, এই অনন্ত বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চায়। আমি চলিয়া যাইব, প্রেমিকা চিরকাল থাকিবে না, মৃত্যুর দ্বারা উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছিন্নতা ঘটিবে, ধুলি-

অনন্ত প্রেমের তাৎপর্য

রাশির মধ্যে প্রেম চির সমাধি লাভ করিবে, ইহা ভাবা যে অসহ্য ক্রন্দনময়, অসম্ভব! তাই এই নশ্বরতার চিন্তা হইতে, বিস্মৃতির অনিবার্য বেদনা হইতে উদ্ধারের বা মুক্তির উপায় কী? একমাত্র উপায় প্রেমকে অবিনশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা, প্রেমিক-প্রেমিকাকে অনন্ত বিশ্বের নরনারীর সহিত একাত্ম করিয়া দেখা। এই দেখায় ক্ষণত্বের দুঃখ দূর হইয়া যায়, প্রেমকে চিরকালের বলিয়া সান্ত্বনা পাওয়া যায়—তাই ইহার নাম অনন্ত প্রেম। সেই অনন্ত প্রেমের তত্ত্ব ও তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া কবি অনন্ত প্রেমের আধ্যাত্মিক উল্লাস বুদ্ধির দ্বারা উপভোগ করিয়াছেন 'অনন্ত প্রেম' কবিতায়। 'নিষ্ফল কামনা'য় যাহা নৈরাশ্য ও অপ্রাপ্তিজনিত হাহাকার, 'অনন্ত প্রেম' তাহারই দার্শনিক সান্ত্বনা।

কড়ি ও কোমলের 'স্মৃতি' কবিতা

নারীর মধ্যে এই অনন্তায়নের চেষ্টা কড়ি ও কোমলের একটি কবিতায় ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছিল। কবিতাটির নাম 'স্মৃতি'। কবি যেন এখানে রূপের জাতিস্মর, নারীদেহ তাঁহার কাছে পঞ্চভূতাত্মক সমুচ্চয় মাত্র নয়, দেহের গবাক্ষ দিয়া তিনি অনন্ত রূপের সন্ধান পাইয়াছেন। কবিতাটি প্রসঙ্গত উদ্ধারযোগ্য—

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারই তুমি আত্মবিস্মরণ
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা,
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে চেয়ে হতেছে বিলীন॥

বলা বাহুল্য ইহার পরই 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় ভাবটি স্পষ্ট সূচিত

হইতেছে। এখানে দেহরূপকে, নারীকে প্রেমের আধারকে, রূপের পাত্রকে অনন্ত বলিয়া উপলব্ধি, আর 'অনন্ত প্রেমে' প্রেমকে অনন্ত বলিয়া ঘোষণা। কিন্তু একই চিন্তা চেতনা ও অনুভব হইতে দুইটি উৎসারিত।

রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত প্রেম পরিকল্পনার সহিত অনেকেই বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের সাদৃশ্য খুঁজিবার চেষ্টা করেন। রবিরশ্মির লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্বত্রয় হইতেছে যে ভগবান নিত্য এবং জীব নিত্য, আর সেই উভয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেম তাহাও নিত্য। অতএব প্রেম জন্ম জন্মান্তরের অনন্ত সাধনার ধন। ইংরেজ কবি রসেটি বলেন যে—প্রেম ভগবানের সমান অসীম অনাদি, কারণ ভগবান হইতেছেন প্রেমময়। তাঁহার এক কণা প্রেম দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রেমিক প্রেমিকার রূপ গ্রহণ করে। আত্মার ধর্ম হইতেছে প্রেম সাধনা। আত্মা যদি অনাদি হয়, তবে তাহার ধর্ম প্রেম ও অনাদি হইতে বাধ্য। তাই আমাদের কবিও বলিতেছেন যে, প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে নিত্যকাল ভালবাসিয়া আসিতেছে, জন্ম জন্মান্তরে তাহাদের সেই অনাদি পুরাতন প্রেমেরই কেবল পুনরভিনয় হইতেছে মাত্র। সেখানে যত প্রেমিক-প্রেমিকা আছেন—শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, ইউসুফ-জুলেখা, শিরী-ফরহাঁদ, লয়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট, দান্তে-বিয়াত্রিচে ইত্যাদি—তাঁহারা সকলে আমাদেরই প্রেমের প্রতিনিধি ও প্রতিরূপ মাত্র। জন্ম জন্মান্তরের যে প্রেম তাহা মনের ভাবে স্থির হইয়া থাকে, এবং কর্মফলের নিয়তির মতন সঙ্গে সঙ্গে চলে—ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি—শকুন্তলা নাটকে কবি কালিদাসও বলিয়া গিয়াছেন। তাই প্রেমিকাকে দেখিবামাত্র আমাদের মনে হয়—

বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা

"যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।"

কিন্তু বৈষ্ণব দর্শনে যে প্রেমকে নিত্য বলা হইয়াছে তাহা ভাগবত প্রেম, আর রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমকে নিত্য বলিয়াছেন তাহা মানবীয় প্রেম। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে বৈষ্ণবীয় সাধনার রাগাত্মিক প্রেম হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রেমিক-প্রেমিকা নিখিল মানবের প্রতিনিধি। বিবর্তনবাদের দিক হইতে তিনি প্রেমকে

দেখিয়াছেন, বৈষ্ণবরা দেখিয়াছেন আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে। ইহাই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

**চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার**—বিশ্বের কাব্যসংগীতের অন্যতম প্রধান প্রেরণা নরনারীর প্রেম। প্রেমমুগ্ধ কবি-সাহিত্যিকগণ তাহাদের হৃদয়ের মোহ অনুরাগকে সংগীত করিয়া মালার মত গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। **কতরূপ ধরে……অনিবার**—প্রেমিক-কবি আপনার হৃদয়-জাত প্রণয়ব্যাকুলতা মোহ অনুরাগকে প্রকাশ করিতে চায়, তাই রচিত হয় শিল্প-সাহিত্য কবিতা-সংগীত। এইগুলি এক হিসাবে কবির অন্তর্জাত প্রেম তথা প্রেমিকেরই বন্দনা। কবিরা তাঁহাদের প্রণয়-পাত্রীকে বন্দনা করেন সংগীতের মালা গাঁথিয়া, প্রেমিকা সেই ভক্তের প্রেম-উপহার কণ্ঠে ধারণ করেন। ইহাই চলিতেছে শাশ্বতকাল ধরিয়া। কারণ Love is the solar passion of the races.

**যত শুনি সেই…প্রাচীন প্রেমের ব্যথা**—প্রেম কদাচিৎ মিলন-তৃপ্ত, প্রায়শই বিচ্ছেদ-কাতর, যন্ত্রণাক্ত, দীর্ঘশ্বাস-বিলাপিত এবং অপরিতৃপ্ত। বিশ্ব-সাহিত্যে যেখানেই প্রেমের উপাখ্যান আছে সেখানেই এই দুর্ভাগ্যের করাঘাত। কবি সেই সকল কাব্যকাহিনী বিবরণ গাথা-গীতিকা নাটক-উপাখ্যান পাঠ করেন। **অতি পুরাতন বিরহমিলন-কথা**—পৃথিবীতে অগণ্য প্রেমের কাহিনী রচিত হইতেছে এবং হইবে। বিভিন্ন দেশ-কালে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সমস্যায় স্থাপিত এই সকল প্রেমকাহিনীর উদ্দেশ্য কিন্তু একই—সেই এক নায়ক ও নায়িকার মিলন অথবা বিচ্ছেদের আনন্দবেদনায় মাখানো একই ছন্দের ব্যাপার। তথাপি ইহা পুরাতন হইল না, ইহার আবেদন হ্রাস পাইল না। **কালের তিমির রজনী**—যে কাল যে যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা এক মহাঅন্ধকারের সহিত তুলনীয়। **ভেদিয়া**—ভেদ করিয়া, ছিন্ন করিয়া। **চিরস্মৃতিময়ী**—যাহাকে কোনদিন ভোলা যায় না, যাহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে এমন যে নারী। **চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকা**—উপমাটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহার ইতিপূর্বে রচিত

অনেক কবিতাতেই প্রেমিকাকে হৃদয়-আকাশে স্মৃতিরূপে বিরাজমানা ধ্রুবতারকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্ধকার আকাশে তারকা বিরাজ করে, কবির কাছে অন্ধকার অতীতের প্রতীক; সুতরাং এই ধ্রুবতারকার উদ্দিষ্টা বর্তমানের নারী নহেন, অতীতের কোনো স্মৃতিময়ী রমণী এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে। তারকার সহিত তাঁহার তুলনা দেওয়ায় মনে হয়, কবি উর্ধ্বাকাশে তারকায় রূপান্তরিত বলিতে কোনো মৃত্যুর ইঙ্গিত দিতেছেন। ধ্রুবতারকার উল্লেখ আরও তাৎপর্যময়। ধ্রুবতারকা স্থির পদপ্রদর্শক। সুতরাং কবির নিকট তাঁহার প্রেম ঐহিক নয়, তাহা কবিকে দিগ্‌ভ্রান্তি হইতে সতর্ক করিবে, পথ দেখাইবে, তাহা দিব্য প্রেমে পরিণত। মানসীর শেষের দিকের 'বিদায়' কবিতায় এই তারকার চিত্রকল্পেই কবি ও কবি-প্রেমিকার সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

> সম্মুখেতে তোমারই নয়ন জেগে আছে
> আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল-কাছে
> স্থির ধ্রুবতারা-সম।

**যুগল প্রেমের স্রোত**—প্রেম একজনের নয়, তাহা দুইজনের মিলিত সৃষ্টি। প্রেমিক ও প্রেমিকার যুগপৎ মিলনোচ্ছ্বাসে ও বিরহ-বেদনায়, উৎকণ্ঠায় কিংবা আবেগে প্রেমের একটি অখণ্ড ধারা গড়িয়া উঠে। ইহা যেন একটি নদী-প্রবাহ, নদীর মতই ইহা প্রবহমান অখণ্ড বেগবতী। **অনাদি-কালের হৃদয়-উৎস হতে**—নদীর একটি উৎস আছে, তাহার উৎসারণ সেই উৎস হইতেই। কবি যে যুগল প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারও একটি উৎস আছে। সেই উৎস একটি শাশ্বত কালের অদ্বৈত হৃদয়। যুগে যুগে কালে-কালে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের খণ্ড খণ্ড কাহিনী রচনা করিলেও এইগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রেমেরই ধারা। প্রেমিক-প্রেমিকার খণ্ড খণ্ড প্রেম অনিত্য বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি নিত্য প্রেমেরই ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। পৃথিবীর বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ এই কালচেতনার অন্তরে একটি অনাদি শাশ্বত নিত্য কাল-চেতনা বর্তমান আছে—তাহাই সত্য, ভবিষ্যৎ-বর্তমান-অতীত এইগুলি আপেক্ষিক মাত্র। শত কোটি মানব-মানবীর হৃদয়ও ভ্রান্তি-প্রতীতি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সেই নিত্যকালের অন্তরে একটি নিত্য প্রেমিক-প্রেমিকার অবস্থান। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিত্য প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় হইতে যে প্রেমের ধারা

প্রবাহিত হইয়া অনিত্যকালের দিকে অর্থাৎ নশ্বর মানুষের নিকট বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ হইয়া দেখা দিতেছে, তাহাই কবি ও তাহার প্রেমিকার মধ্য দিয়াও আপনাকে সম্পূর্ণ করিতেছে। ইহাই সেই হৃদয়-উৎস এবং কবিও তাহার প্রেয়সী সেই উৎসেরই যুগল-প্রেমের প্রবাহ।

**ব্যাখ্যা—যত শুনি সেই·········ধ্রুবতারকার বেশে**—কবি তাঁহার প্রেমকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা হইতে অনন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছেন। প্রেম মানব জীবনের একটি আদিম বৃত্তি এবং সর্বমানব-সাধারণ অনুভূতি। এই প্রেম কেবল জৈবিক আকর্ষণ মাত্র নয়, ইহা কেবল দুইটি দেহের ঘনিষ্ঠতা ও মিলনোৎকণ্ঠা মাত্র নয়। প্রেম একটি অনির্বচনীয় শাশ্বত অনুভূতি। ইহা দেহকে অতিক্রম করিয়া, আত্মার অনাদ্যন্ত প্রবাহের মধ্য দিয়া সংক্রামিত হয় বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন। সুতরাং ইহা একটি অনাদি সৃষ্টি-প্রবাহের অখণ্ড ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, সেই প্রেয়সী নারী আমাদের আত্মার সহিত জন্মজন্মান্তরের সম্পর্কে গ্রথিত। যাহাকে বর্তমানে দেখিতেছি, সে আমার চিরকালের পরমাত্মীয়া। প্রেমকে এইরূপ বিবর্তনশীলতার মধ্যে স্থাপিত করিয়া কবি বর্তমান স্তবকে প্রেমিকার একটি শাশ্বত প্রতীক রচনা করিয়াছেন।

কবির প্রেমিক হৃদয় সহসা একটি জাতিস্মর জন্মস্মর চেতনা লাভ করিয়াছে, বর্তমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে ও বর্তমানের হৃদয়লক্ষ্মী মানসীকে তিনি অসীম কালের হৃদয়পটে স্থাপন করিয়া দেখিলেন। পৃথিবীর সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে অসংখ্য যুগ কাল ধরিয়া বহু প্রেম-কবিতা প্রেমসংগীত প্রেম-গাথা রচিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল উপাখ্যানের আশ্রয় দেশান্তর কালান্তরের নায়ক-নায়িকা। তাহাদের মিলন-বিরহ, দীর্ঘশ্বাস-সুখতৃপ্তি, বিলাপ-উল্লাসের কত মধুর বিধুর স্মৃতিতে পূর্ণ এই সকল কাহিনী, কিন্তু কবি যখনই এই সকল কাহিনী কবিতাগাথা সংগীত পাঠ করেন তাঁহার অন্তর একটি আশ্চর্য সর্বাত্মকতার অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া যায়। যে-কাল চলিয়া গিয়াছে, সেই ধুসর হারানো অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়া তিনি যে কাব্যনায়িকার চিত্রটি ভাবিতে চেষ্টা করেন তাহা কখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহারই সাম্প্রতিক মানসসুন্দরীতে পরিণত হইয়া যায়। অনন্ত কালের অন্ধকারে তাহা ধ্রুবতারকার মত জলজল করিতে থাকে। কবির প্রেমিকাই জগতের সকল প্রেমকাব্যে প্রণয় গাথায় যে মিশিয়া আছে কবি এই সত্য উপলব্ধি করেন।

তাই সময়ের আবরণ অপসারিত করিয়া তাঁহার প্রেমিকের স্মৃতি স্থির অচঞ্চল ধ্রুবতারকার মত নিত্য হইয়া আবির্ভূত হয়।

[ ধ্রুবতারা শব্দের উপর টীকা সংযোজিতব্য ]

**ব্যাখ্যা—আমরা দুজনে ভাসিয়া……নিত্য নূতন সাজে**—[ পূর্বের ব্যাখ্যার প্রথম বাক্য "কবি তাঁহার প্রেমকে" হইতে প্রথম অনুচ্ছেদের সমাপ্তি বাক্য "শাশ্বত প্রতীক রচনা করিয়াছেন" পর্যন্ত একই প্রকার ]।

এই জাতিস্মর জন্মস্মর প্রেমচেতনা একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতি সন্দেহ নাই। কবি তাঁহার বর্তমানের নশ্বর প্রেমকে স্মরণীয় করিবার জন্য তাহাকে নিত্যকালের পটে স্থাপিত করিয়াছেন। কবির মনে হইতেছে যে, তিনি এবং তাঁহার প্রেমিকা বিশ্বের অনাদ্যন্ত প্রেম-প্রবাহেরই একটি তাৎক্ষণিক রূপ, তাঁহাদের বর্তমানের পৃথক সত্তা কেবল একটি মায়াভাস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সৃষ্টি-প্রবাহের সমান্তরাল বিশ্বের একটি প্রেম-প্রবাহ আছে, যুগে যুগে দেশে-কালে যত মানব-মানবীর প্রেম প্রীতি অনুরাগ, যত হাসি-অশ্রুজল মিলন-বিরহ সবই সেই প্রবাহেরই রূপান্তর। কালপ্রতীতিহীন সময়হারা অনাদি অকল্পনীয় একটি অবস্থা আছে, যেখানে একটি অনাদি নিত্য হৃদয় আছে। উৎস হইতে যেমন নির্ঝর নির্গত হইয়া দেশে দেশে নদীরূপে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ একটি অদ্বৈত নিত্য হৃদয় হইতে একটি প্রেমের ধারা উৎসারিত হইয়া কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ও নারীর নামে তাহাদের সাময়িক প্রেম-তরঙ্গ ও মিলন-বিরহের বর্ণালী ইন্দ্রধনু রচনা করিতেছে। কবি বিশ্বাস করেন, তিনি ও তাঁহার প্রেমিকা সেই অনাদি হৃদয়েরই অংশ, তাঁহার শাশ্বত প্রেম যুগে যুগে রূপান্তরে জন্মান্তরে লোকালয়ের কূলে কূলে তরঙ্গ তুলিতেছে। তিনিই এই বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় প্রণয়ী আর তাঁহার প্রিয়তমা সেই এক নারী। তাঁহাদের প্রেমের লীলাই বিশ্বের কোটি প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমলীলার মধ্য দিয়া বিবর্তিত। অনন্তকাল অপরের মধ্য দিয়া তাঁহারা আপনার প্রণয়লীলারই স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, অপরের বিরহ-যন্ত্রণা, মিলনোৎকণ্ঠা, লজ্জিত সম্মিলন ও কুণ্ঠিত দর্শন—সবই কবি কবি-প্রেয়সীর নিত্য প্রেমের প্রাতিভাসিক রূপান্তর মাত্র।

**ব্যাখ্যা—আজি সেই চির……সকল কবির গীতি**—[ প্রথম ব্যাখ্যার প্রথম অনুচ্ছেদ এখানেও যথাযথ সংযোজিতব্য ]।

প্রেম একটি অনন্ত অনুভূতি; প্রেমিক-প্রেমিকার পৃথক দ্বৈত সত্তা

থাকিলেও তাহাদের উৎস এক অনাদি অদ্বৈত হৃদয় হইতে এবং প্রেমের কোনো জন্মমৃত্যু-জাত ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাহার রূপান্তর আছে, বিবর্তন আছে। প্রেম যেন একটি নিত্য লীলা, আর সেই লীলার কেন্দ্র কবির প্রেমিক-সত্তা ও কবিপ্রেয়সীর প্রেমিকা-সত্তা, যাহারা অনন্ত পুরুষ ও নারীর প্রতীক। এই নিত্য প্রেমকেই কবি অনন্ত প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই অনাদিকালের প্রেমচেতনার আলোকে কবি তাঁহার বর্তমানের প্রেয়সীর বন্দনা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মানস-লক্ষ্মী কেবল এই জন্মের জীবনসঙ্গিনী মাত্র নয়, এই অনুভূতি লাভ করিবার পর কবি তাঁহার অনন্ত প্রেমের অনন্ত উল্লাস প্রেমিকার চরণতলে নিবেদন করিতে চাহেন। যে নারীর মধ্যে বিশ্বের কবিতাসুন্দরীর বিকাশ, তাহার মধ্যে বিশ্বের সুখ তৃপ্তি দুঃখ অনুরাগ সমীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কী? কবি তাঁহার আপন কণ্ঠে এই প্রেমের জয়গান গাহিয়া যেন পরিতুষ্টি পাইতেছেন না, তাই নিখিল বিশ্বের নিত্যকালের যত প্রেমসংগীত সবই এই শাশ্বত কালের প্রেমিকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন।

**প্রশ্নোত্তর**

**প্রশ্ন ১। 'অনন্ত প্রেম' কবিতার সূচনা 'নিষ্ফল কামনা'য়—প্রেমকে ক্ষুদ্র সীমা হইতে সর্বজনীনতা দান করিবার প্রয়াস 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—এই মন্তব্যটি বিচার কর।**

। আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

# মেঘদূত

## ভূমিকা

মানসী কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি কেবল মানসীর নয়, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্যেরই একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের নিকট কালিদাস ছিল প্রিয়পাঠ্য এবং 'মেঘদূত' কালিদাসের কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কবির নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। এই মেঘদূত সম্বন্ধে কবি জীবনের নানা সময় নানা প্রবন্ধ কবিতা-গান এবং নানাভাবে ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তথাপি এই অমর কাব্যটি সম্পর্কে তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। সম্ভবত কবির আপন কবিজীবনের আদর্শ মেঘদূতের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাই মেঘদূত প্রসঙ্গ তাঁহাকে এত চঞ্চল বিহ্বল করিয়া দিত। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় কবির মেঘদূত পাঠ কবিজীবনের একটি শাশ্বত ঘটনা বলা যাইতে পারে। কবি তাঁহার মৃত্যুপূর্ব কাব্যগ্রন্থেও এই মেঘদূতের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে অনেকবার অনেক গ্রন্থ বিষয়ে মতামত পরিবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু মেঘদূত সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা

রবীন্দ্রনাথের উপর মেঘদূতের প্রভাব

এখন এই মেঘদূত কাব্যটি সম্পর্কে কবি কী কথা বারবার বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা দেখা যাক।

মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোককে কালিদাস আপন কাব্যের সঘন সংগীতের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে কবির গৃহত্যাগী মন মেঘের সঙ্গী হইয়া মেঘদূতে বর্ণিত গিরিনদী অঞ্চলগুলির উপর মানস-বিহার করে। তারপর কামনার মোক্ষধাম অলকায় উপনীত হয়। যক্ষপ্রিয়া কবির ভাষায় 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি' কিন্তু চিরবিরহিণী, অলকা কবির মতে, লক্ষ্মীর বিলাসপুরী এবং অনন্ত সৌন্দর্যের দেশ। কবি যে সেই অনন্ত সৌন্দর্যের দেশে, যেখানে 'কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-

কবিকৃত কয়েকটি মেঘদূত-ভাষ্য

মানসীর মেঘদূত

'বেদনা' সেখানে যাইতে পারেন না, এই আক্ষেপে কবিতাটি সমাপ্ত হইয়াছে।

এই কবিতা লেখার প্রায় দু একদিনের মধ্যেই কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি চিঠিতে মেঘদূত সম্পর্কে পুনরায় তাঁহার অভিমত ব্যাখ্যা করেন। পত্রটি মানসীর পরিশিষ্টে সংকলিত আছে। তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

কবির মতে মেঘদূত "বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে" এইজন্য আকাশবিহারের উদ্দাম কল্পনায় সেই বন্দীদশা হইতে যক্ষরূপ কবি যেন মুক্তি অনুভব করিয়াছেন। "মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ।" এই ভ্রমণ নিরুদ্দেশ্য নয়। ইহার পরিণামে রহিয়াছে একটি "আকাঙ্ক্ষার ধন।" সেই পরম সুন্দর রাজ্যে যাত্রার জন্য পথটিকেও কবি কালিদাস যেন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্বিন্ধ্যা, চিত্রকূট, আম্রকূট বিন্ধ্য, দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী—"এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য আছে।" এই কারণে মেঘদূত পাঠ করিতে করিতে কবির মন উন্মনা হইয়া যায়। তাঁহার মনে হয়, "এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনক্ষেত্রে মুক্তি দিতে" হইবে। সমস্ত সংসার যখন দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া অন্ধকার হইয়া বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কবির ইচ্ছা হয়, "ওই রকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোনো প্রবাসে বিরহ শয়নে বিলীন" হইয়া থাকে এবং কবি যদি "জড় অথবা চেতন কোনো দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে" তাহা জানিতে পারেন, "তা হলে বেশ হয়।"

সমকালীন একটি পত্রাংশ

প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত 'মেঘদূতে'র কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রবন্ধটি মানসীর আলোচ্য কবিতার মাত্র এক বৎসর পরে লেখা। এখানেও কবির বক্তব্য কবিতার বক্তব্যেরই অনুরূপ। অর্থাৎ মেঘদূতে বর্ণিত জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে একালের কর্মব্যস্ত সংসার নির্বাসিত হইয়াছে কেবল সেই সৌন্দর্যময় জগতের মৃদু আভাস আসিয়া অধুনা আমাদের ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক করিয়া দেয়। "সেই প্রাচীন ভারত খণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর।" সেই শোভা শুচিতা সম্ভ্রমপূর্ণ জীবনযাত্রায়

প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত

যদি প্রবেশের কোনো উপায় কবির জানা থাকিত ! একালের পাঠক তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেঘদূত পাঠ করিয়া থাকে। তারপর মেঘদূত কাব্যের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া কবি বলিতেছেন যে, মনুষ্য অতি নিঃসঙ্গ প্রাণী, "এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।" যেন কাহার অভিশাপে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি আমাদের চারিপাশে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই এক সৌন্দর্যজগৎ কল্পলোক স্বপ্ন-কামনার রাজধানী হইতে নির্বাসিত হইয়াছি—"অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম. অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে।" সেই প্রিয়তম মানুষটিই হইল মেঘদূতে কালিদাস বর্ণিত বিরহিণী প্রিয়া, আমরা যক্ষের মতই তাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, কিন্তু অভিশপ্ত বলিয়া মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইতেছি। "আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি ; মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা, শিপ্রা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য ভোগ.ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর।"

প্রসঙ্গত ১৩০৮ সালে লেখা বিচিত্র প্রবন্ধের 'নববর্ষা' ( বঙ্গদর্শনে 'মেঘদূত' নামেই প্রকাশিত হয় ) প্রবন্ধের উল্লেখও করণীয়। এই প্রবন্ধেও দেখি "নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত" আষাঢ়ের মেঘকে দেখিয়া কবির মেঘদূতের কথাই মনে পড়িয়াছে। কবিও এই কর্মব্যস্ত সংসার হইতে ক্ষণিকের অবকাশে মেঘের সঙ্গী হইয়া কালিদাসের পূর্বমেঘ-উত্তরমেঘের ভ্রমণসূচী-নির্দিষ্ট জগতে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সেই মেঘদূতের মেঘ কবিকে "কোন অলকাপুরীতে কোন চিরযৌবনের রাজ্যে চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে" আকর্ষণ করে। মেঘদূত কাব্যের এমন সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণ ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যাখ্যা কবি আর করেন নাই। যে নববর্ষ শব্দটি তিনি প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরিবর্তিত করিয়া মেঘদূত শব্দটি ব্যবহার করিলেই কবির বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। কবির ভাষায়—

বিচিত্র প্রবন্ধের নববর্ষা

"আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া সজল মেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়…আমাকে রামগিরি

আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোন্ এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে: নদীকলধ্বনিত সানুমৎপর্বতবন্ধুর জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার নববারিসিঞ্চিত যূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষধামে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।"

পরবর্তীকালে লিখিত সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন', লিপিকার 'মেঘদূত', পুনশ্চের 'বিচ্ছেদ', সানাইয়ের 'যক্ষ' ইত্যাদি কবিতা ও রচনা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

## ভাবার্থ

মেঘদূত কাব্য পাঠ করিতে করিতে কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, অতীতের কোন্ এক অজ্ঞাত-পরিচয় বৎসরের বর্ষাঋতুর প্রথম দিবসে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল সেই তথ্যটি হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিখিল জগতের প্রিয়-বিরহিত মানুষের গভীর বেদনা এই কাব্যের মেঘধ্বনিসদৃশ গম্ভীর শ্লোকসংগীতে পূর্ণ হইয়া আছে। হয়ত সেদিন কবি কালিদাসের উজ্জয়িনী প্রাসাদের উপর নিবিড় ঝড়বৃষ্টি ঘনাইয়া আসিয়াছিল আর সেই মেঘগর্জনের ভিতর সহসা বহু যুগের অব্যক্ত বিরহ-বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। সেদিনের ধারাবর্ষণে ঝরিয়া পড়িয়াছিল চিরদিনের বহু মানুষের ক্রন্দন। তাহাই কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের উদাত্ত শ্লোকে পরিণত হইয়াছে। (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক)

হয়ত বা সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তস্থিত প্রবাসী বিরহীগণ মেঘকে সম্বোধন করিয়া সকাতর বিরহের ও গৃহপ্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল। দূর প্রোষিতভর্তৃকার উদ্দেশে তাহারা তাহাদের যে করুণ প্রেমবার্তা মেঘের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকেই কবি কালিদাস সংগীত করিয়া তুলিয়াছেন। দেশদেশান্তের প্রিয়-বিরহীদের নিকট ধাবিত সেই সংগীত যেন শ্রাবণব্যথিত জাহ্নবীর সমুদ্রাভিযান, প্রস্তর-বন্দী হিমালয়ের গগনচারী মেঘমালা দেখিয়া শূন্যে উধাও হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

(তৃতীয় স্তবক)

উপায় নাই। 'অথচ আমাদের অন্তরের প্রিয়জন আমাদের অভাবে নিঃসঙ্গ বাস করিতেছে। ইহাই ট্র্যাজেডি—দুইজন প্রেমিক দুই জগতে নিঃসঙ্গ একাকী, কিন্তু মিলনের পথ জানা নাই। কেবল স্বপ্নে কল্পনায় সেই সৌন্দর্যের দেশে যাওয়া যাইতে পারে—আর সেই স্বপ্নকল্পনাভিসারই মেঘদূত পাঠের অভিজ্ঞতা।

আলোচ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, মেঘদূত পাঠ করিলে বিরহবেদনার অবসান হয়। প্রথম স্তবকে বলা হইয়াছে, মেঘদূতের মেঘমন্দ্র শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোকের ঘনীভবন মাত্র। দ্বিতীয় স্তবকে বলিয়াছেন, সহর্ষ বর্ষের অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন মেঘদূত রচনার দিন আকাশের মেঘসংঘর্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে কবির বক্তব্য, সেদিন জগতে যত প্রবাসী প্রিয়জন ছিল, তাহারা নবমেঘের দিকে জোড়হস্তে মাথা তুলিয়া অশ্রুবাষ্পভরা বিরহের গান গাহিয়াছিল, তাহাদের সেই সমবেত বিলাপ-সংগীতই কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। ষষ্ঠ স্তবকে ইহারাই পুনরাবৃত্তি করিয়া কবি বলিতেছেন যে, কত কাল ধরিয়া সঙ্গীহীন নির্জন প্রকোষ্ঠে কত বিরহাতুর মানুষ একাকী এই মেঘদূত পাঠ করিয়া তাহাদের বিজন বেদনা প্রকাশ করিয়াছে। অষ্টম স্তবকে কবিও একই ভাবে তাঁহার সাম্প্রতিক নিঃসঙ্গতার দুঃখ নিবারণের জন্য মেঘদূত পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে আসন গ্রহন করিয়া দেশ দেশান্তরে উড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কেবল উড্ডীন হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—এই মেঘসহ আকাশ বিহারের লক্ষ্য—

মেঘদূত ও বিরহ

> হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
> কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
> বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
> সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি—

এই বিরহিণী যক্ষের প্রিয়তমা নারী মাত্র নয়, ইহার সহিত কবির মানস-প্রিয়তমার সমীভবন ঘটিয়া গিয়াছে। কবি যখন যক্ষের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, তখন যক্ষপ্রেয়সী ও কবিপ্রেয়সীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। আর যক্ষ যেমন নির্বাসিত বলিয়া অলকায় অবস্থিত প্রিয়তমার নিকট সশরীরে উপনীত হইতে পারে নাই, কবিও তেমনি

যক্ষপ্রিয়া ও কবিমানসী

কর্মলাঞ্ছিত সংসারে নির্বাসিত বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য-মানসীর নিকট সশরীরে যাইতে পারেন না। তাই দূর হইতে কেবল কল্পনায় তাহাকে নিরীক্ষণ করেন, কেবল ব্যর্থ বিরহে ক্রন্দমান হন, আপনার অভিশপ্ত নিঃসঙ্গতার জন্য কপালে করাঘাত করেন, মানব-জীবনের চিরবিরহের অনিবার্যতার জন্য আক্ষেপ করেন—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান!
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ!
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ!

প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে এই কথাটিই আরও অপরূপ করিয়া কবি ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"……প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শী বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে। আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্মমৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র।"

শাশ্বত বিরহ-চেতনা

বস্তুত 'মেঘদূত' একটি অপূর্ব কবিতা। ইতিপূর্বে 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় কবি এই ইহলোকের প্রেমকে যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তরে প্রসারিত অনন্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন, এখন বিরহকেও কবি সেইরূপ নিত্যকালের পটভূমিতে দেখিলেন। উক্ত কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলিয়াছিলেন যে, সেই প্রাচীন প্রেমের ব্যথাভরা কাহিনী শুনিতে শুনিতে কবি যতই সেই অসীম অতীতে আত্ম-নিমজ্জিত হন ততই দেখিতে পান নিত্যকালের প্রেমিকারূপে তাঁহার একালের প্রিয়তমাই চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে আবির্ভূত হইতেছে। 'মেঘদূত' কবিতাতেও অলকাপুরীর প্রকোষ্ঠ-বিরাহিতা সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি যক্ষপ্রিয়া

'অনন্ত প্রেম'-কবিতারই সম্প্রসারণ

কবির বিরহিণী প্রিয়ায় পরিণত। সুতরাং 'মেঘদূত' 'অনন্ত প্রেমে'রই সম্প্রসারণ মাত্র।

অথচ ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'মেঘদূত' কবিতা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত। কালিদাসের কাব্য হইতে কবি যে কেবল অষ্টম স্তবকের বর্ণনাগুলি নিয়াছেন তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার উপকরণও কালিদাসের কাব্যেই আছে। কালিদাস লিখিয়াছেন।

কালিদাসের সহিত তুলনা

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

অর্থাৎ 'মেঘদর্শনে সুখিজনের চিত্তও বিকারযুক্ত হয়। কণ্ঠালিঙ্গনকামী জন দূরে থাকিলে তো কথাই নাই'। রবীন্দ্রনাথও সেই বিরহ-বিকারে মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অলকাপুরীর যে সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও কালিদাসের কাব্যের অনুরূপ। যক্ষ মেঘকে বলিয়াছে,

গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকা ধৌতহর্ম্যা ॥

অর্থাৎ 'তোমার গন্তব্য যক্ষেশ্বরদের বসতি সেই অলকাপুরী যেখানকার প্রাসাদ-পুরীগুলি বহিরুদ্যানস্থিত শিবের মস্তক নিঃসৃত চন্দ্রকিরণে চির উদ্‌ভাসিত।' উত্তরমেঘ অংশে যক্ষ এই অলকার আরও বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন,

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগপপত্তি
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

অর্থাৎ 'যেখানে যক্ষগণের অশ্রুজল কেবল আনন্দের জন্যই নির্গত হয়, অন্য কোনো কারণে নয়; কেবল কুসুমশরজতাপ ব্যতীত যেখানে অন্য তাপ নাই; এবং যে তাপ প্রিয়সমাগমে নিবৃত্ত হয়; প্রণয়কলহভিন্ন অন্য কারণে যেখানে বিচ্ছেদ ঘটে না; যৌবন ব্যতীত যেখানে বয়স নাই'। রবীন্দ্রনাথ এই বর্ণনা অবলম্বনেই লিখিয়াছেন,

লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে

নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
স্বর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে ইত্যাদি।

ইন্দ্রনীলশৈলমূলে স্বর্ণসরোজফুল্ল সরোবরও যক্ষের বর্ণনারই অনুরূপ। উত্তরমেঘের আর একটি শ্লোকে আছে,

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ বৈদূর্যনালৈঃ॥

অর্থাৎ 'সেখানে একটি সরোবরও আছে, যাহার সোপানগুলি মরকত প্রস্তরে বাঁধানো এবং তাহা স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালযুক্ত বিকশিত হৈমকমলে আচ্ছন্ন।' পুনশ্চ,

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।

অর্থাৎ 'তাহার তীরে সুন্দর ইন্দ্রনীলমণিময় শিখরযুক্ত ক্রীড়াশৈল আছে, যাহা কনককদলীতরুর বেষ্টনযুক্ত থাকায় সুদৃশ্য।' রবীন্দ্রনাথ যক্ষপ্রিয়াকে বলিয়াছেন, 'বিরহিণী প্রিয়তমা—সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি'। ইহাও কালিদাসের অনুসৃতি মাত্র,

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্রস্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

অর্থাৎ 'সেই যে যক্ষপ্রিয়া সেখানে আছে, সে তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, শ্রোণীভারে অলসগমনা, স্তনভারে ঈষৎ অবনতা, যুবতিবিষয়ে সে বিধাতার আদিসৃষ্টির তুল্যা।'

মেঘদূতের উত্তরমেঘের ৮৯ হইতে সুরু করিয়া পরবর্তী শ্লোকগুলি বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার সম্ভাব্য বিরহদশা ও বৈকল্যের বিচিত্র বর্ণনা। কবি যাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়—

তাহাও মেঘদূত হইতে অবিকল গৃহীত। যক্ষের মুখ দিয়া কালিদাস বলিয়াছেন,

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।

অর্থাৎ 'সে দুঃখে শীর্ণা, বিরহশয়নে একপার্শ্বে স্থিতা, পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রের কলা-মাত্রাবশিষ্ট মূর্তির তুল্য'। রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিয়াছেন,

যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া—

এই চিররাত্রি জাগিয়া থাকার পরিকল্পনাটিও কলিদাসের। যক্ষপ্রিয়াও,

নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥

অর্থাৎ 'সে নিদ্রা কামনা করিতেছে, কিন্তু নয়নসলিলের প্রবাহ তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে।'

এইরূপ ভাষাগত সাদৃশ্য ও প্রেরণা অষ্টম স্তবক হইতে আরও দেওয়া যাইতে পারে, রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণে যথাসময়ে তাহার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং একথা বলা যায়, একালের রোমন্টিক কাব্যচেতনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের আধুনিক ভাষ্যরচনা করিলেও সেকালের রোমন্টিক কবি কালিদাসের কাব্যেই তাহার বীজ নিহিত ছিল। কালিদাস লিখিয়াছেন বিশেষের কথা, রবীন্দ্রনাথ নির্বিশেষের কথা। কিন্তু বিশেষের মধ্যেই কালিদাস নির্বিশেষের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই পল্লবিত করিয়াছেন।

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

(প্রথম স্তবক)

**কবিবর কবে কোন্…মেঘদূত**—কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্য আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তযুগে জীবিত ছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি, কিন্তু তাঁহার জীবন-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলে না। তাই 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল'। অথচ পরবর্তী কালে তাঁহার অমর কাব্য মেঘদূত পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, কালিদাসের আবির্ভাব কাল অথবা মেঘদূত কাব্যরচনার

বৎসরটি চিরকালের মত হারাইয়া গেলেও সেই আষাঢ়ের প্রথম দিনটি পবিত্র ও চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মেঘদূতের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে, রামগিরিপর্বতে নির্বাসিত কান্তাবিরহী এক যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে নতদেহে বপ্রক্রীড়ারত হস্তীর মত প্রেক্ষণীয় গিরিশিখরলগ্ন একখণ্ড মেঘ দেখিতে পাইল—

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।

**মেঘমন্দ্র শ্লোক**—মেঘদূতের বিষয়বস্তু বর্ষাবিরহ, ইহা মেঘের প্রতি জনৈক বিরহী যক্ষের সম্বোধন এবং এই ছন্দের নাম মন্দাক্রান্তা। বিরহের গভীর বেদনায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের গাম্ভীর্যে এই কবিতাগুচ্ছ যেন মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনির মত।

**মেঘমন্দ্র শ্লোক……পুঞ্জীভূত করে**—মেঘদূত কেবলমাত্র কালিদাস-রচিত কাব্যশ্লোক সমষ্টি নয়, ইহা তদপেক্ষা গুরুতর কিছু। ইহাকে কেবল মাত্র একটি যক্ষের বিরহবিলাপ বলিলে ভুল করা হইবে। এই কাব্যের শ্লোকগুলি মেঘধ্বনির মত গম্ভীর, ইহার অভ্যন্তরে যে সংগীত রহিয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সর্বত্র যত প্রিয়বিচ্ছিন্ন বিরহী প্রেমিক আছে, তাহাদের সমবেত বিরহ-বেদনার ঘনীভবন।

( দ্বিতীয় স্তবক )

**সেদিন সে উজ্জয়িনী……গুরুগুরু রব**—কবি কল্পনা করিতেছেন যে, কালিদাস যেদিন মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন সেদিন উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-উর্ধ্বের আকাশ নববর্ষার নবীন মেঘোদয়ে কালিমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবিশ্রাম বিদ্যুৎচমকে ও গুরুগর্জনে বর্ষাগমনের একটি উৎসব সূচিত হইয়াছিল। এইজন্য বর্ষাকে বরণ করিবার জন্য প্রাচীন কালে বর্ষামঙ্গল উৎসব করা হইত। **গম্ভীর নির্ঘোষ……একদিনে**—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উজ্জয়িনীর আকাশে শ্যামল নবমেঘের সমারোহে যে গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া কবি কালিদাস শুনিতে পাইয়াছিলেন বহু সহস্র বর্ষের সঞ্চিত বিরহ-বেদনা। মানুষের বিচ্ছেদ বিরহ অশ্রুব্যাকুলতা ও ক্রন্দন-কাতরতা যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াই সেই মেঘের গর্জনে পরিণত হইয়াছিল। তাহাই এক দিবসের মেঘমন্দ্রিত আয়োজনে কবি কালিদাসের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। **ছিন্ন করি কালের……উদার শ্লোকরাশি**—যুগ যুগান্ত ধরিয়া পৃথিবীর মানুষের মত প্রিয়বিচ্ছেদ-ক্রন্দন, যত মিলনোৎকণ্ঠিত

আর্তনাদ, যত বিরহ-বিলাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, সবই ঐ আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘসমারোহে পুঞ্জিত হইয়া উজ্জয়িনীর কবির কানে বাজিয়া উঠিল। তাহাকে তিনি মেঘের গর্জন বলিয়া ভুল করেন নাই। কবিবর যখন তাঁহার মেঘদূত কাব্য লিখিতেছিলেন, তখন আকাশলোকের সেই বৃষ্টিধারার সহিত বিরহীর অশ্রুজল মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারই প্রভাবে প্রতিক্রিয়ায় কালিদাসের কাব্যে মানুষের বিরহ-বেদনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

( তৃতীয় স্তবক )

**বন্ধনবিহীন……অশ্রুবাষ্পে ভরা**—নববর্ষার মেঘ-সমাগমকে কবি কেবল ঋতুবিশেষের প্রতীকরূপে দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছে, এই মুক্ত স্বচ্ছন্দ আকাশ-বিহারী মেঘ যেন মর্ত্য পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে অবস্থিত গৃহ-সুখোন্মুখ বিরহীদের বেদনা-গাথার বাহন। তাহারা সুদূর প্রবাসে আছে বলিয়া গৃহের উৎকণ্ঠিতা প্রিয়জনের কাছে যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের আবেগব্যথিত প্রেমের বার্তা তাহারা মেঘের হাত দিয়া তাই প্রিয়জনের কাছে পাঠাইতে চাহিয়াছে। **দূর বাতায়নে…সজল নয়নে**—প্রবাসী প্রিয়জনের কাছে দূর প্রোষিতভর্তৃকার চিত্রগুলি ছিল এইরূপ—যেন তাহাদের প্রতীক্ষা-কাতরা প্রেমিকাগণ বিরহে আর্তহৃদয়ে বাতায়নের পাশে শয্যায় অবশদেহে শায়িতা হইয়া আছে। তাহারা তাহাদের কেশবাস প্রসাধিত করে নাই, বিরহে তাহাদের দেহ কালিমাচ্ছন্ন এবং নয়ন রোদনক্লান্ত। বিরহিণী যক্ষবধূর এইরূপ চিত্র মেঘদূতের মধ্যে বারবার অঙ্কিত হইয়াছে।

( চতুর্থ স্তবক )

**তাদের সবার গান……বিরহিণী প্রিয়া ?**—এই মর্ত্যলোকের যত দূর-প্রবাসে অবস্থিত প্রিয়বঞ্চিত বিরহী সম্প্রদায়, তাহাদের রোরুদ্যমান মিলন-কাতরতা ও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘগর্জনে ও বৃষ্টিপুঞ্জে সমীভূত হইয়াছিল। কবি কালিদাস তাহাকেই কাব্যের ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। বিরহীদের যে ব্যাকুল প্রার্থনা তাহাদের প্রিয়জনের নিকট পৌছিতে পারে নাই, কালিদাস যেন সহৃদয়তাবশত সেই বিরহলিপিকেই কবিতায় রূপান্তরিত করিয়া সেই সকল বিরহীর প্রিয়পাত্রদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, মেঘদূত কালিদাসের মৌলিক কবি কল্পনার সৃষ্টি নয়, কবিবর কেবল প্রেরক মাত্র। এই কাব্যের শ্লোকগুলি প্রবাসী বিরহীদের বিরহলিপি এবং এই কাব্যের গ্রহীতা সেই

সকল বিরহিণী সম্প্রদায়। **শ্রাবণে জাহ্নবী……দিশাহারা**—একটি উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ষাকালে বিভিন্ন পরিপুষ্ট নদীর জল শাখাপথ বাহিয়া একটি বৃহৎ নদীর সহিত মিলিত হয় এবং তারপর সেই প্রবলা নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। কালিদাসের মেঘদূত কাব্য যেন সেই পরিপুষ্ট জলধারা, যাহাতে দেশ-দেশান্তরের ছোটখাট বিরহ-দুঃখের ধারা মিলিত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা এক বৃহৎ বিরহ সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে। **পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল**—হিমাচল অর্থাৎ হিমালয় পর্বতকে কবি একটি জাগ্রৎ সত্তা রূপে দেখিয়াছেন। কেবল কোনো অনিবার্য অভিশাপে যেন প্রস্তরের কঠিন বন্ধনে সর্বদাই বন্দী হইয়া আছে। **পাষাণশৃঙ্খলে……গগন পানে**—প্রস্তরীভূত শিকলে হিমালয় নিত্যকাল বন্দী বলিয়া তাহার বেদনা ও অতৃপ্তির শেষ নাই; আষাঢ় মাসে যখন আকাশে মুক্তপক্ষ বন্ধনহীন নবমেঘদল উড়িয়া বেড়ায়, তখন সেই স্বাধীন মেঘের অবাধ বিচরণ দেখিয়া বন্দী হিমালয়ের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার ব্যাকুল অথচ হতাশ মনোবেদনায় দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। কবি কল্পনা করিতেছেন, বর্ষাকালে পর্বত শিখরে তুষারের হিমবাষ্প জমিয়া উঠে—সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে পর্বতের নভোলোকে উড়িতে না পারার ব্যর্থতাজনিত দীর্ঘশ্বাস। **ধায় তারা……করে অধিকার**—পর্বতের উড্ডীন হইবার ব্যাকুলতা বাষ্প হইয়া উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়, তারপর শূন্যে তাহারা মেঘরূপে সমবেত হয়। মেঘ যেন পর্বতের উধাও হইবার ইচ্ছার বস্তুরূপ। তুলনীয়,

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—বলাকা।

(পঞ্চম স্তবক)

**সেদিনের পরে গেছে……নববরষার**—কালিদাসের মেঘদূত কাব্য-রচনার দিনটি ছিল আষাঢ়ের প্রথম তারিখ; তারপর কত শত বৎসর একবার করিয়া নবীন শ্যামল বর্ষার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তুলনীয়—"হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহ সংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু কালের শত শত সুখদুঃখ বিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।" —(ছিন্নপত্রাবলী: রবীন্দ্রনাথ)। **প্রতি বর্ষা……বারিধারা**—কবে কোন্

বিস্মৃত অতীতে কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন। দিনটি ছিল আষাঢ়ের প্রথম তারিখ, তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং এই জলভারাক্রান্ত ঋতুটি যেন মর্ত্য পৃথিবীর এই কাব্যগ্রন্থটির উপর তাহার সকল আশীর্বাদ উজাড় করিয়া দিয়াছে। **করিয়া বিস্তার……জলদমন্দ্রের**—পূর্ববর্তী বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া কবি বলিতেছেন, বর্ষার মেঘের যে শ্যামল ছায়া, মেঘের যে গুরুগর্জন সবই যেন এই পার্থিব কাব্যগ্রন্থটির প্রতিই প্রীতিসহকারে প্রসারিত হইয়াছে। **স্ফীত করি স্রোতাবেগ……তরঙ্গিণী সম**—বর্ষার জলধারায় শীর্ণকায়া নদীগুলি যেমন সবেগে স্রোতঃপ্রবাহে কল্লোলিত হয়, তেমনি নববর্ষা প্রতিবৎসর মেঘদূত কাব্যখানিকে সেই গতিবেগ দান করিয়াছে, যাহার ফলে এই কাব্যের মন্দাক্রান্তা ছন্দ খরধারা নদীর গতি লাভ করিয়াছে।

( ষষ্ঠ স্তবক )

**কতকাল ধ'রে…… বিজন বেদন**—কবি রবীন্দ্রনাথ বারবার বলিয়াছেন, মেঘদূত পৃথিবীর বিরহীহৃদয়ের ব্যর্থ বিলাপ বেদনা স্মরণে রচিত। এই কাব্য পাঠ করিয়া প্রিয়বঞ্চিত মানুষ তাই তাহার প্রবাসের নিঃসঙ্গতার বেদনা দ্রবীভূত করিতে চেষ্টা করে। ইহার নায়ক যক্ষের সহিত একাত্ম হইয়া, স্বজন-বঞ্চিত বিরহী তাহার দূর দেশস্থিত একাকিনী প্রিয়ার নিকট আপন মৌনী মনোবেদনাকে মেঘের বাহনে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যুগ-যুগ ধরিয়া অসংখ্য প্রিয়বিরহী এই কাব্য পাঠ করিয়াছে। যখন প্রবাসীর গৃহ নিঃসঙ্গতার দৈন্যে ঘনীভূত, যখন অন্ধকার প্রবল ব্যথার মত নামিয়া আসিয়াছে, তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণের শেষে তারকাচন্দ্রহীন আষাঢ়ের সন্ধ্যায় মৃদু প্রদীপ জ্বালাইয়া বিরহী এই কাব্য আবৃত্তি করিয়াছে, আর এই কাব্যের মধ্য দিয়া তাহার আপন হৃদয়ভার ও বিরহদুঃখকে সর্বজনীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। **সে সবার……কাব্য হতে**—এই মেঘদূত কাব্য পাঠ করিতে করিতে কবি জগতের সেই সকল বহুযুগের বিরহী হৃদয়ের ব্যাকুল নিঃসঙ্গতার বিলাপ যেন আজ শুনিতে পাইতেছেন। দূর হইতে মহাসমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি যেমন পথিকের নিকট শ্রুতিগোচর হয়, তেমনি মেঘদূতের মধ্যেও কবি সেই পৃথিবীর মহাসমুদ্রতুল্য বিরহবেদনার ধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন।

( সপ্তম স্তবক )

**জয়দেব কবি**—লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে

বর্তমান ছিলেন। প্রচলিত মত এই যে, জয়দেব বাঙালী কবি এবং বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল বলিয়া দাবী করা হয়, যদিও কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি বলিয়া এখন তথায় কোনো গ্রামের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অজয়ের তীরে পৌষসংক্রান্তিতে এখনো জয়দেবের নামে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। জয়দেবের খ্যাতি গীতগোবিন্দ নামক কাব্য রচনার জন্য—সুললিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাট্যগীতিমূলক এই কাব্যের বিষয় রাধাকৃষ্ণ প্রীতিলীলা। "কৃষ্ণ রাধাকে এড়াইয়া অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে জানিয়া রাধার দুর্জয় মান, ভৎর্সিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নির্বেদ, এবং সখীদূতীর মধ্যস্থতায় দুইজনের মিলন—ইহাই গীতগোবিন্দের বস্তু।" এই গীতগোবিন্দ ছিল শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়পাঠ্য এবং এই কাব্য বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাস প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণব কবিকে অসামান্য প্রভাবিত করিয়াছিল। **আর এক বর্ষা-দিনে……মেদুর অম্বর**—জয়দেবের কাব্যের বিষয় বৃন্দাবনের লীলাকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মানাভিমান, মিলন-বিরহ। কিন্তু বাঙলা দেশের কবি জয়দেব বাঙলা দেশের শ্যামায়মান মেঘপুঞ্জ ও নবনীল বর্ষাঋতুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকেই বর্ষাবর্ণনা দেখিতে পাই—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

অর্থাৎ 'হে রাধিকে! নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইয়া উঠিল, বনভূভাগও শ্যামল তমাল তরুনিকরে অন্ধকারময়, শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভয়শীল, নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তুমি ইহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন কর।' জয়দেবের কবিতার শব্দগুলিও রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন।

**আজি অন্ধকার দিবা……শূন্যে বরষিয়া**—এই কবিতা রচনার পটভূমিটি ছিল একটি বৃষ্টিদুর্যোগময় অপরাহ্ণ। শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মশেষের এই বর্ষণমুখর ঝড়বৃষ্টির দিনটির বিস্তৃত বর্ণনা কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রেও করিয়াছেন ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )।

( অষ্টম স্তবক )

**অন্ধকার রুদ্ধগৃহে……মেঘদূত**—কালিদাসের মেঘদূত কাব্যখানি পাঠ

করিবার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সেদিন সৃষ্টি হইয়াছিল। কবি শান্তিনিকেতনের আশ্রমে (তখন আশ্রম বলিতে খোলা মাঠের মধ্যে একখানি মাত্র কুটির আর কয়েকটি বৃক্ষ ছিল) অবস্থান করিতেছেন, সন্ধ্যা ঘনতর হইয়াছে, দারুণ ঝড়বৃষ্টি বাহিরে মাতামাতি করিতেছে। মেঘদূত কাব্য পড়িয়া কবি অনেক বর্ষাবিষয়ক কবিতাই এইভাবে রচনা করিয়াছেন। তুলনীয়, সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন' কবিতা—

বসে বসে সঙ্গীহীন ভালো লাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত কথা।
বাহিরে দিবস-রাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা।
বহুপূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগনদী নগর বাহিয়া
কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।

**গৃহত্যাগী মন**—বিরহী যক্ষ নির্বাসিত ছিল, তাহার মন কল্পনায় ধাবিত হইয়াছিল দূর অলকাপুরীর আপন কুটীরে, যেখানে তাহার প্রিয়তমা পত্নী একাকী অবস্থান করিতেছে। কবির মনও সেইরূপ বর্ষাদিনে মুক্তপক্ষ হইয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে চায়। গৃহের বন্ধন কোনোদিনই কবির ভালো লাগে না, তাঁহার চিত্ত সুদূরের জন্য চিরকাল উৎকণ্ঠিত, আপনাকে তিনি পথিক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'আমি চঞ্চল হে' এই তাঁহার কবিজীবনের মূল মন্ত্র। **মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন**—কবির মন অসীমের উদ্দেশে ধাবিত হইতে চায়, কিন্তু দেহ থাকে ঘরের বন্দী হইয়া। তাই কল্পনায় চলে তাহার বিশ্বাভিসার। মেঘদূতের মেঘের উপর ভর করিয়া সেই বহির্মুখ চিত্ত দেশ-দেশান্তরে ধাবিত হইতে চাহিতেছে। **কোথা আছে সানুমান আম্রকূট**—মেঘদূতের একটি শ্লোকে (পূর্ব মেঘ ১৭নং) বর্তমান অমরকণ্টক পাহাড়কে সানুমান অর্থাৎ উচ্চচূড়াবিশিষ্ট পর্বত বলা হইয়াছে। যক্ষ মেঘকে বলিতেছে যে, মেঘ যেন বর্ষণের দ্বারা আম্রকূট পর্বতের দাবাগ্নি প্রশমিত করে। **কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে উপলব্যথিত গতি**—ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা যাহার স্রোত বাধাগ্রস্ত হইতেছে এমন যে বিন্ধ্যপর্বতনির্গতা শীর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা

রেবা বা নর্মদা নদীর বর্ণনা। পূর্বমেঘের ১৯নং শ্লোকে এই বর্ণনা আছে—

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥

অর্থাৎ "বিন্ধ্যপর্বতের প্রস্তর কঠিন পাদদেশে হস্তীর দেহে চিত্রিত শৃঙ্গারলেখার মত তুমি সেই শীর্ণা রেবাকে দেখিতে পাইবে"। **বেত্রবতী কূলে……রয়েছে লুকায়ে**—বেত্রবতী নাম্নী নদীর তীরে সদ্যফোটা কেতকী বনে ঢাকা একটি গ্রাম—তাহার নাম দশার্ণ। সে গ্রামে জামের ঘন বনে জাম পাকিয়া আছে। এই বর্ণনাও অবিকল মেঘদূতের—

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥

( পূর্বমেঘ ২৪নং )

অর্থাৎ, "তোমার আগমনে দশার্ণ গ্রামের বাগানের বেড়াগুলি কেতকী ফুলে পাণ্ডুচ্ছায়া হইবে, গ্রামের গাছগুলি গৃহবলিভুক্ পাখির নীড় নির্মাণে আকুল হইবে, বনান্ত পাকা জামে শ্যামবর্ণ হইবে। সেখানে হংসগণ কয়েকদিনের জন্য অবস্থান করে।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, দশার্ণ একটি গ্রাম নহে, ইহা পূর্বমালব দেশ। দশার্ণের রাজধানীর নাম বিদিশা এবং এই বিদিশার পাশ দিয়াই বেত্রবতী নদী প্রবাহিত, ইহা মেঘদূতের পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে। বিদিশা বর্তমানে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ভিল্‌শা এবং বেত্রবতী বর্তমান বেত্তোয়া নদী। **পথতরুশাখে……বনস্পতি**—পূর্বোক্ত শ্লোকেই এই বর্ণনাটি আছে যেখানে বলা হইয়াছে যে গ্রামচৈত্য বা গ্রামের গাছগুলিতে বায়স কপোত ইত্যাদি গৃহবলিভুক্ পাখিগুলি নীড় নির্মাণ করিবে। **যুথীবন-বিহারিণী**—জুঁই ফুলের বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় যে নারী। **বনাঙ্গনা**—আরণ্যক কন্যা। **না জানি সে……হতেছে বিকল**—পূর্বমেঘের ২৭নং শ্লোক দ্রষ্টব্য—

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদী-তীরজাতানি সিঞ্চন্
মুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যুথিকাজালকানি

গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥

অর্থাৎ, "তুমি বিশ্রান্ত হইয়া বননদী তীরবর্তী উদ্যানে জাত জুঁই ফুলের কুঁড়ি-গুলিকে নতুন বৃষ্টির জলে ভিজাইয়া দিয়া যাইবে। যে সকল পুষ্পচায়িকার কর্ণোৎপল কপোলের স্বেদ মুছিতে মুছিতে ম্লান হইয়াছে, তাহাদের মুখে তুমি ক্ষণকাল ছায়া দিয়া তারপর যাত্রা করিও।" কালিদাস যাহাদের পুষ্পলাবী বা পুষ্পচায়িকা বলিয়াছেন, তাহারাই কবির মতে বনাঙ্গনা। **ভ্রূবিলাস শেখে নাই……সুনীল নয়ানে**—জনপদ বা গ্রামের সরলহৃদয়া নারীরা মেঘের দিকে প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে তাকাইবে, কারণে মেঘের উপর কৃষিফল নির্ভর করে। গ্রাম্যবধূ বলিয়া তাহারা কটাক্ষ জানে না, তাহাদের স্নিগ্ধসরল আয়ত নীলনেত্রে মেঘের ছায়া পড়িবে। ইহা পূর্বমেঘের ১৬নং শ্লোকের প্রায় অনুবাদ। **মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা**—'বিস্ময়বিমূঢ়া' [ অথবা 'সুন্দরী' অথবা 'সরলা' ] 'আকাশচারী দেবযোনি বিশেষের' কন্যা। **নবঘন**—নবমেঘ। **কোন্ মেঘশ্যামশৈলে……শিলাতলে**—পর্বতের ঊর্ধ্বশিখরগুলির গুহায় বাস করে 'সিদ্ধ' নামক সম্প্রদায় ( যাহারা তপস্যার দ্বারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে )। তাহাদের সরল বিস্মিত কন্যা পর্বতের নীলিমাচ্ছন্ন শিখরে বসিয়া একদা আষাঢ়ের নবশ্যামল মেঘ দেখিতেছিল। **সহসা আসিতে…উড়াইল বুঝি**—আকস্মিক ঝটিকার আগমনে কিশোরী বালিকা আপনার অসংবৃত বেশবাস সামলাইতে সামলাইতে সভয়ে নিরাপদ গুহায় ছুটিল এবং মাতাকে ডাকিয়া তাহার সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে শোনাইতে লাগিল। তাহার ধারণা প্রমত্ত ঝটিকায় পর্বতের শিখর বুঝি স্থানচ্যুত হইয়া বায়ুবেগে উড়িয়া আসিয়াছে। মেঘদূতের মূল শ্লোকটির প্রথম দুইচরণ উদ্ধৃতব্য—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।

অর্থাৎ "অদ্রি বা পর্বতের শৃঙ্গ পবন হরণ করিয়াছে বোধ হয়—এইরূপ ভাবিয়া ঊর্ধ্বমুখী সিদ্ধাঙ্গনা চকিত হইয়া তোমার ( মেঘের ) গমনের উদ্যোগ দর্শন করিবে।" রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ তুলনীয়—

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে,
মাগো পাহাড় শুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
( বিচ্ছেদ—পুনশ্চ )

**অবন্তীপুরী**—রাজ্যের নাম অবন্তী, রাজধানী উজ্জয়িনী বা বিশালা, পূর্বমেঘের ৩১নং শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। **নির্বিন্ধ্যা তটিনী**—বিন্ধ্যপর্বত-নিষ্ক্রান্তা নদী বিশেষ ; উইলসনের মতে, পার্বতী ও শিপ্রার মধ্যবর্তী একটি নদী। পূর্বমেঘের ২৯নং শ্লোকে এই নদীর উল্লেখ আছে। **কোথা শিপ্রানদী-তীরে……স্বমহিমচ্ছায়া**—প্রাচীনকালে উজ্জয়িনীর চারিটি নাম ছিল—উজ্জয়িনী বিশালা অবন্তী ও পুষ্পকরণ্ডিনী। উজ্জয়িনী অতি সমৃদ্ধ সৌধকিরীটিনী নগরী, শিপ্রানদীর স্বচ্ছ জলে তাহার শ্রীসম্পদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। উজ্জয়িনী সেই ছায়ায় আপনার সৌভাগ্য মহিমা অবলোকন করে। উজ্জয়িনী প্রসঙ্গে কালিদাস 'শ্রীবিশালা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ৩২নং শ্লোকে স্নিগ্ধ শিপ্রাবায়ুর উল্লেখ আছে। শিপ্রা উজ্জয়িনীর নদী। তুলনীয়—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে,
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে। ( স্বপ্ন—কল্পনা )

**যেথা নিশি দ্বিপ্রহরে……পারাবত**—যক্ষ মেঘকে বলিয়াছিল, উজ্জয়িনীতে যেখানে পাবাবতগণ সুপ্ত আছে, এমন কোনো পৌরভবনের অলিন্দে রাত্রি যাপন করিও। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পংক্তির উৎস। কবি ইহার সহিত 'প্রণয় চাঞ্চল্য ভুলি' যোগ করিয়াছেন। **বিরহবিকারে**—বিরহের তীব্র বেদনায় আর্ত হইয়া। **শুধু বিরহবিকারে……বিদ্যুতালোকে**—অন্ধকার উজ্জয়িনীর রাজপথে মধ্য রাত্রে চলে প্রেমের লীলানাট্যের এক বিচিত্র অভিনয়, যখন গৃহস্থ রমণীগণ তীব্র বিরহে আর্ত হইয়া তাহাদের অপেক্ষমান প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য রাস্তায় অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া অভিসার যাত্রা করে। তখন কালিদাসের যক্ষ মেঘকে সেই অন্ধকার পথে কেবল বিদ্যুতের আলোকে

তাহাদের পথ দেখাইতে বলিয়াছিল, কারণ গর্জনে তাহারা ভয় পাইতে পারে। শ্লোকটি দ্রষ্টব্য—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥

অর্থাৎ "সেই ( উজ্জয়িনী ) নগরীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টি রাজপথ দিয়া যে রমণীগণ প্রণয়ীর গৃহে অভিসারে যায়, কনকনিকষস্নিগ্ধ বিদ্যুতের দ্বারা তুমি তাহাদের পথ দেখাইয়া দিও, বর্ষণ ও গর্জনের দ্বারা শব্দায়মান হইও না, কারণ তাহারা ভীরু।" **কোথা সে বিরাজে ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র**—ব্রহ্মাবর্তে ছায়া ফেলিয়া যক্ষ মেঘকে কুরুক্ষেত্র গমন করিতে বলিয়াছিল। মনুতে আছে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যস্থিত দেবনির্মিত ভূখণ্ডের নাম ব্রহ্মাবর্ত। **কোথা কনখল**—হরিদ্বারের নিকটবর্তী স্থান, দক্ষযজ্ঞের ঘটনাস্থল। পুরাণে আছে যে এখানে গঙ্গা পর্বত ছাড়িয়া সমতলে অবতরণ করিয়াছে। **কনখল……চন্দ্রকরোজ্জল**—জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী পার্বতীর সপত্নী। কবিকল্পনায় বলা হইতেছে যে, এই লাস্যময়ী সপত্নী গৌরীর ভর্ৎসনা ও ক্রোধকে উপেক্ষা করিয়াই স্বামী মহাদেবের চন্দ্রকিরণে-উদ্ভাসিত জটা লইয়া রহস্য পরিহাস করিতেছেন। মেঘদূতের একটি শ্লোকে জাহ্নবীর মর্তাবতরণ এই উপমার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের ভাষায়—

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
গৌরী বক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥

অর্থাৎ "তথা হইতে কনখলের নিকটস্থ হিমালয়াবতীর্ণা জাহ্নবী সমীপে উপনীত হইবে, যিনি সগরতনয়গণের স্বর্গারোহণের সোপানপংক্তি স্বরূপ, যিনি গৌরীর বদনের ভ্রূকুটি যেন ফেনদ্বারা উপহাস করিয়া ঊর্মিরূপ হস্ত চন্দ্রে লগ্ন করিয়া শম্ভুর কেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ এত অনায়াসে আপন ভাষায় পরিবর্তিত করিয়াছেন যে তাহা বিস্ময়কর।

( নবম স্তবক )

**এই মতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে**—পূর্বমেঘে ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র নগর নদী জনপদের যে বিচিত্র সুন্দর বর্ণনা আছে, কবি যেন মেঘের সঙ্গী হইয়া এতক্ষণ তাহা পর্যবেক্ষণ করিলেন। এই পূর্বমেঘ সম্বন্ধে কবির আর কয়েকটি মন্তব্য স্মরণীয়—

"পূর্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত।···আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহুদূরে যে আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্যবট শুককাকলিতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।"

"অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয় এই হইল পূর্বমেঘ।"

"পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয়···"

**হৃদয় ভাসিয়া চলে······যেথায় বিরাজে**—পূর্বমেঘে যাত্রাপথ, উত্তরমেঘে যাত্রার পরিণাম, অর্থাৎ অলকাপুরীর যেখানে যক্ষের প্রিয়তমা পত্নী বিরাজ করিতেছে। অলকা যক্ষের আবাসভূমি—তাহাকে কামনার মোক্ষধাম বলিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, স্বভূমি বলিয়া যক্ষের আকর্ষণ অলকার প্রতি, তাই অলকার বর্ণনায় সে কল্পনার রাশ ছাড়িয়াছে, অলকা তাহার কাছে কামনার শ্রেষ্ঠ স্থল। দ্বিতীয়ত, প্রিয়তমা প্রেমিকার আবাস বলিয়াও তাহা কামনার মোক্ষধাম। মোক্ষধাম মানে যেখানে হৃদয় মুক্তি লাভ করে, বাঞ্ছিত বস্তু যেখানে পাওয়া যায়। **সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি**—যক্ষ তাহার পত্নীর সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে গিয়া তাহাকে বিধাতার আদি সৌন্দর্য সৃষ্টি বলিয়াছিল ( আলোচনা দ্রষ্টব্য )। রবীন্দ্রনাথের কাছে অলকা কেবল যক্ষের ভূমি নয়, তাহা মর্ত্য মানুষের কামনাপূর্তির রাজ্য। সেখানে আমাদের মানসলক্ষ্মী বাস করে, সেই অন্তপ্রিয়া বিশ্বের সৌন্দর্যের সার দিয়া নির্মিত। **সেথা কে পারিত······অমর ভুবনে**—উত্তরমেঘে কালিদাস অলকাপুরীর ও যক্ষপ্রিয়ার যে অসীম সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্মীর স্বর্গীয় বিলাসভবনের সহিত তুলনীয়, ইহা কোনো বাস্তব পৃথিবীর বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না। প্রতি মানুষের মনে সৌন্দর্যের জন্য যে একটি নিভৃত আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা এই বর্ণনায় যেন পরিতৃপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, কালিদাস

কবি, তাই তাঁহার পক্ষেই পাঠককে এইরূপ একটি মর্ত্য-ধূলিমালিন্যহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের রাজ্যে লইয়া যাওয়া সম্ভব। সৌন্দর্যবর্ণনার কবি কালিদাস সম্পর্কে চৈতালির একটি কবিতায় ( 'কালিদাসের প্রতি' ) কবি বলিয়াছেন, 'ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময় অলকার অধিবাসী'। আর একটি কবিতায় ( 'কাব্য' ) বলিয়াছেন—

তবু সে সবার উর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে।

**ব্যাখ্যা—অনন্ত বসন্তে……বিরহবেদনা**—'মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে' আসন গ্রহণ করিয়া 'মেঘদূতে'র কবি এতক্ষণ কালিদাসের কাব্যবর্ণিত দেশ-দেশান্তরে মানস-ভ্রমণ করিতেছিলেন। পূর্বমেঘে যক্ষ অলকা পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়াছিল, উত্তরমেঘে সেই যাত্রার অবসানে অলকাপুরীর বিস্তৃত বর্ণনা এবং যক্ষপ্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই অলকাপুরী কেবল যক্ষের নয়, কবির নিকটও কামনার মোক্ষধাম, কারণ প্রত্যেক মর্ত্য মানুষের হৃদয়েই একটি বিরহী যক্ষ বাস করিতেছে, যে সৌন্দর্য ও প্রেমের এক বিশুদ্ধ জগৎ হইতে এই ধূলিধূসরিত বাস্তব সংসারে চিরকালের মত নির্বাসিত। অথচ তাহার অন্তরে কল্পনায় রহিয়াছে সেই কাম্য কল্পস্থান, যেখানে অনন্ত সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছে এবং সেই অন্তরের কেন্দ্রে আছে আমাদের চিরবাঞ্ছিতা মানসলক্ষ্মী। 'আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে'—তাই সেই মানসসুন্দরীও আমার অভাবে বিরহিণী—অসীম সম্পদ ও সৌন্দর্যের মধ্যেও তাহার নিঃসঙ্গতা ঘুচিল না। ইহাই যেন জীবনের ট্রাজেডি। মানবাত্মা সৌন্দর্য ও সুন্দরী প্রেয়সীর জন্য উৎকণ্ঠিত। আর সৌন্দর্য ও সম্পদের মধ্যে আমাদের অন্তরলক্ষ্মী বিরহিণী হইয়া কাঁদিতেছে। উত্তরমেঘ পাঠ করিলে মানবের এই নির্বিশেষ ট্রাজেডির স্বরূপই যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানের মধ্য দিয়া সত্য বলিয়া মনে হয়।

অলকাপুরীর যে বর্ণনা কালিদাস তাঁহার কাব্যে করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, অলকাপুরীতে সর্বদাই বসন্ত বিরাজ করে, সেখানে অন্য কোনো ঋতু নাই। সেখানে পুষ্প সর্বদাই প্রস্ফুটিত, তাহার জরা নাই। সেই অলকাপুরী শিবের মস্তকস্থিত চন্দ্রের আলোকে নিত্যই আলোকিত, তাই

সেখানে অন্ধকার নাই। সেই নগরী রত্নভূষিতা, সৌধকিরীটিনী। যক্ষপ্রিয়ার যে বাসভবনের বর্ণনা আছে তাহাতে দেখি, মরকতশিলার দ্বারা সোপান-নির্মিত একটি সরোবর যাহা স্নিগ্ধ বৈদূর্যমণির নালযুক্ত বিকশিত হৈমকমলে আচ্ছন্ন। তাহার তীরে সুন্দর ইন্দ্রনীলমণিময় শিখরযুক্ত ক্রীড়াশৈল আছে। আর চারিদিকে স্ফটিক মণিমুক্তা কাঞ্চনের শেষ নাই। এমন কি ময়ূরের দাঁড়টিও স্ফটিকফলকযুক্ত কাঞ্চনের এবং আভাময় মণির দ্বারা বদ্ধ। এহেন স্বর্ণমাণিক্যসম্পদের মধ্যে বাস করে যে নারী তাহার সৌন্দর্য উক্ত পরিবেশেরই উপযুক্ত। কিন্তু সম্পদ শ্রী ও শোভা থাকিলেও সে যে বিরহিণী মাত্র, উন্নিদ্রা অবনীশয়না, 'প্রবলরুদিত উচ্ছূননেত্রং' প্রবল রোদনের ফলে স্ফীতনেত্রা, শিশিরমথিতা পদ্মিনীর তুল্য। এই বর্ণনাকেই নির্বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সৌন্দর্যের মানসালকা অঙ্কন করিয়াছেন।

**মুক্ত বাতায়ন……অস্তপ্রায়**—এই দেখা যক্ষের দেখা, যক্ষের কাল্পনিক দৃষ্টির সহিত একালের কবিও দেখিয়া লইয়াছেন। যক্ষ বলিতেছে, "প্রবল রোদনের ফলে স্ফীতনেত্র, উষ্ণ নিশ্বাসে যাহার অধরোষ্ঠ বিবর্ণ হইয়াছে, অলক লম্বিত থাকায় যাহা অল্প দেখা যাইতেছে, হস্তে স্থাপিত সেই প্রিয়ার মুখ নিশ্চয় মেঘাক্রান্ত ইন্দুর মত মালিন্যযুক্ত হইয়াছে।" আবার অন্যত্র, "সে দুঃখে শীর্ণা, বিরহশয়নে একপার্শ্বে স্থিতা পূর্বদিগন্তে চন্দ্রের কলামাত্রাবশিষ্ট মূর্তির তুল্য।" এই কালিদাসীয় বর্ণনাকেই রবীন্দ্রনাথ আপন ভাষায় পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। এই বিষয়ে আরও উদাহরণ আলোচনা অংশে মূল শ্লোকসহ দেওয়া হইয়াছে।

**ব্যাখ্যা—কবি তব মন্ত্রে আজি……একাকী জাগিয়া**—এক নিঃসঙ্গ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় নির্জন গৃহে বর্ষার ঘনায়মান মেঘবৃষ্টির ঝড়ের মধ্যে বসিয়া কবি মেঘদূত পাঠ করিতেছিলেন, স্বজনবিহীন জীবনের বেদনার ভার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল, বাস্তব জগতের বিরোধবিদ্বেষ-মালিন্য কবিকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। মেঘদূতের পূর্বমেঘের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কবি একটি সৌন্দর্যময় অজ্ঞাতপরিচয় জগতের উপর দিয়া মানসভ্রমণ করিয়া আসিলেন। তারপর উত্তরমেঘে সকল কামনার পূর্তি, সকল বিরহের অবসান ঘটিল। যক্ষ তাহার মানসলক্ষ্মীর নিকট আষাঢ়ের নবমেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল। সেই দূরপ্রবাসী যক্ষের একান্ত প্রিয়জন ছিল অলকার নির্জন ভবনকোণে, সেখানে অনন্ত যৌবন বিরাজ করিতেছে, অনন্ত বসন্ত সেখানকার একমাত্র

ঋতু। সেখানকার কাননোদ্যান নিত্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পসৌন্দর্যে সর্বদাই শোভাময়, সেখানে অজস্র সম্পদ মণি-মাণিক্য, সেখানে প্রতিক্ষণেই চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকিরণ উদ্‌ভাসিত—মোটের উপর সেই সুন্দর শ্রীবিশাল দেশটির বুঝি তুলনা নাই। অসীম সৌন্দর্যের দেশটি কেবল যক্ষের একমাত্র স্বদেশ নয়, তাহা যেন প্রত্যেক মানবাত্মার আপন ভূমি—আমরা প্রত্যেকেই একদা এক অসীম সৌন্দর্যের জগতের অধিবাসী ছিলাম, সেখান হইতে এই কর্মগ্রস্ত জগতে নির্বাসিত হইয়া পড়িয়াছি। সেই মানসলোকেই আমাদের আত্মার সর্বোত্তম আত্মীয়, আমাদের প্রিয়তম্ সৌন্দর্যমূরতি বিরাজ করিতেছে। সে যে বিরহিণী, সে আমারই জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। সুতরাং সেই বিরহের স্বর্গভূমিটির জন্য কবির মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নিঃসঙ্গ সান্ধ্য গৃহে যে হৃদয় বেদনায় তিনি অভিভূত হইতেছিলেন, তাহা যেন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। কালিদাসের কাব্য পাঠ করিয়া তিনি অনুভব করিলেন, কবি নিঃসঙ্গ নহেন, তাঁহার অন্তরলক্ষ্মী কোথাও আছে—বিরহিণী হইলেও আমার জন্যই তাহার কাতর ক্রন্দন। অন্তর সৌন্দর্যের মধ্যে একাকিনী জাগর রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আমারই জন্য তাহার কাতর প্রতীক্ষা।

( দশম স্তবক )

**ব্যাখ্যা—আবার হারায়ে……অকুল-উদ্দেশে**—উত্তরমেঘের অন্তর্গত অলকাপুরীর ও তন্নিহিতা যক্ষপ্রিয়ার বিবরণ পাঠ করিতে কবি যক্ষের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, ঐ অলকা যেন কবিরই পূর্বজন্মের জগৎ, যেখান হইতে দৈবশাপে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু সেই অসীম সৌন্দর্যপুরীর অনন্ত সম্পদের মধ্যে তাঁহার মানসলক্ষ্মী বিনিদ্র রজনী ক্রন্দমানা হইয়া যাপন করিতেছে। যাহাকে কবি ভালোবাসেন, সে যে মানসলোকের অগম পারে এখনো প্রতীক্ষা করিতেছে, এই দৃশ্যটি তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য রোমাঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্তপরেই তাহা মিলাইয়া গেল। কল্পলোকের বিরহিণী, প্রতীক্ষমানা মানসপ্রিয়া দেখা দিয়াই যেন মিলাইয়া গেল। তখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কবি এতক্ষণ মেঘদূত পড়িতেছিলেন। বাহিরে ঝড়বৃষ্টি তখন উত্তাল। বিকালের আলোক কখন রাত্রির অন্ধকারে পরিণত। চারিদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে—দূরবর্তী প্রান্তরে ঝড়ের বাতাস যেন একটি ব্যাকুল বিলাপ ধ্বনিত করিতেছে। এক কথায়, কবির মনে মানস-লক্ষ্মীর সহিত যে মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন মিলাইয়া গেল। ঐ ঝড় কবি মনেরই যেন বিলাপ!

**ব্যাখ্যা—ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি……নাহি পায় পথ!**—এক বর্ষণ-মুখর মেঘগর্জিত জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের প্রান্তর-মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে বসিয়া কবি মেঘদূত কাব্যখানি পাঠ করিতেছিলেন। জগতের কর্ম-কোলাহল ব্যস্ততা নৈরাশ্য ও অবক্ষয়ে কবিমন ক্ষুব্ধ ছিল, তাই শত শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া ক্ষণিকের জন্য কবির বর্তমানকে লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। মেঘদূতের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুই অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে কবি প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-খচিত জনপদ-নগরী-নদী-পর্বতের উপর তাঁহার কল্পনাবাহিত মনকে পরিক্রমণ করাইয়া আনিলেন। কালিদাস উত্তরমেঘাংশে অলকাপুরীর সৌন্দর্যসম্পদ রত্নসমৃদ্ধির যে বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার ভিতর একটি রূপকার্থ আবিষ্কার করিলেন। অলকাপুরীর পুরশ্রীশোভার মধ্যে যক্ষের প্রিয়তমা পত্নী 'যুবতিবিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি' বিরহশয়নে বেদনার্ত চিত্তে যক্ষের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নিকট বড়ই ব্যঞ্জনাগর্ভ মনে হইল। তাঁহার কর্মাভিশপ্ত সাংসারিক মনটি সহসা যক্ষের সহিত একাত্মতা লাভ করিল। সুন্দর একটি পৃথিবীর রমণীয় দৃশ্যশোভা অতিক্রম করিয়া অলকা নামক একটি মালিন্যহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জগতে কবি তাঁহার অন্তরলক্ষ্মীর অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। মেঘদূত কাব্য পাঠসূচনায় কবির দুর্বহ নিঃসঙ্গতা পীড়াদায়ক মনে হইতেছিল। এখন তাঁহার মনে হইল, যাহার সহিত কবির জন্মজন্মান্তরের অনন্ত প্রেমের সম্পর্ক, সে কোন্ মানসলোকের অগম পারে বাস করিতেছে। জগতের কোনো এক পথচিহ্নহীন সৌন্দর্যের রহস্যতীর্থে আমাদের মানসলক্ষ্মী আমাদেরই পথ চাহিয়া রোরুদ্যমানা, এই কল্পনা কবিকে প্রথমে রোমাঞ্চিত করিলেও শেষ পর্যন্ত আর এক প্রকার নৈর্ব্যক্তিক বিষাদে তিনি আচ্ছন্ন হইলেন। যাহার সহিত আমাদের গভীরতম অনুরাগের জন্মান্তরীণ বন্ধন, তাহার সহিত মিলনের দুস্তর বাধা—ইহাও সত্য। যক্ষ যেমন ঊর্ধ্বাকাশে মুখ তুলিয়া তাহার সুদূরশায়ী প্রিয়জনের জন্য মেঘকে বিকলহৃদয়ে সম্বোধন করিয়াছিল, কবিও তেমনি এই বর্তমানের নির্জনতার দ্বীপে একাকী বসিয়া আছেন, চারিদিকে বিচ্ছেদের লবণাক্ত সমুদ্র আর কোন্ দূর সিন্ধুপারে কোন্ রহস্য নিকেতনে আমাদের প্রিয়তম হৃদয়বাঞ্ছিত প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রেম যদি সত্য হয়, সে যদি আমার চিরজন্মের মানসসুন্দরী হয়, তবে দুজনের মধ্যে কেন এই ব্যবধান! কাহার শাপে দুইটি অনন্ত প্রাণের মধ্যে অনন্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে!

চিরমিলনের সম্ভাবনায় দুইজনকে কাঁদাইয়া তুলিতেছে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায় দুইজনকে ব্যাকুল করিতেছে, কিন্তু মিলনের কোনো পথ জানা নাই। এই মানবাত্মার ট্রাজেডির চিন্তা কবির নিদ্রাহীন অর্ধরাত্রি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল।

**ব্যাখ্যা—সশরীরে কোন নর······সকলের শেষে!**—মেঘদূত কাব্য পাঠ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ উত্তরমেঘের মধ্যে একটি রূপকার্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উত্তরমেঘে বর্ণিত অলকাপুরীর সম্পদ-সমারোহের মধ্যে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা যে যক্ষপ্রিয়া একাকিনী বিরহ শয়ানে ক্রন্দমানা, কবি যেন তাঁহারই মধ্যে নিখিল মানবের অন্তর্লক্ষ্মীর স্বরূপ দেখিলেন। প্রত্যেক মানুষই একদা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জগতে সংসক্ত ছিল, কিন্তু কর্মের তাড়নায়, উদ্দেশ্যের স্থূলতায় সেখান হইতে তাহারা এই মর্ত্যভুবনে নির্বাসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমাদের স্বপ্নে-কল্পনায় সেই সৌন্দর্যের জগৎ আমাদের নিকট হাতছানি দেয়, সেথাকার অনবদ্য সৌন্দর্যস্বরূপের মধ্যে আমাদের বিরহিণী প্রিয়তমা আমাদেরই জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। অথচ ইহাই মানুষের ট্রাজেডি যে, সেই জগতে প্রত্যাবর্তনের কোনো উপায় আমাদের জানা নাই। সেই কল্পজগৎটি যেন এই পরিচিত কর্মব্যস্ত জগতের জনপদ-প্রকৃতি হইতে বহুদূরে, কোনো পথচিহ্নহীন অসীমে অবস্থান করিতেছে, যাহার ঠিকানা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। হয়ত সেই জগৎ আমাদেরই অন্তরে—যেমন অভিসারিকা রাধার কাছে গোবিন্দদাস কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন—

সুন্দরী কৈসে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস-সুরধুনি-পার॥

সেই কল্প-সৌন্দর্যের জগৎ আমাদের বাস্তব জগতের মত দিনরাত্রির দ্বারা খণ্ডিত নয়, এই সাংসারিক তুচ্ছতার দ্বারা তাহার পরিমাপ করা যায় না। সে দেশ অনন্ত রূপ-যৌবনের রাজ্য, সেখানে প্রদোষের অন্ধকার রত্নমাণিক্যের জ্যোতিতে সর্বদাই উদ্‌ভাসিত, আর সেই জগতের অন্যপ্রান্তে স্থিত সেই সৌন্দর্য রাজ্যে আমাদেরই মানসলক্ষ্মী আমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য চিরকাল সাশ্রুনেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু যে কর্মের জগতে আমরা নির্বাসিত হইয়াছি, তথা হইতে সশরীরে তো সেই সৌন্দর্যের দেশে যাওয়া যায় না—যক্ষ যেমন স্বয়ং অলকাপুরীতে যাইতে পারে নাই, মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল। মানুষও সেইরূপ তাহার অভিশপ্ত বর্তমানে দাঁড়াইয়া

ঊর্ধ্বমুখে প্রতীক্ষা করে, কবে কোন্ শারদীয়া জ্যোৎস্নারাত্রিতে তাহার সহিত মিলন ঘটিবে। কিন্তু মিলন যে কোনো কালেই ঘটিবার নয়, ইহাই মানবাত্মার সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি—

যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো—
পাবো না পাবো না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে ॥

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। 'মেঘদূত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অমর কাব্যখানির একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যের স্বরূপ কী, তোমার নিজের ভাষায় তাহার পরিচয় দাও।**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ২। "কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়**
**রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা—**
**কালিদাসের মেঘদূত কাব্য পাঠ করিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অভিজ্ঞতার কারণ কী, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও। ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতার মূল বক্তব্য?**

**উত্তর।** মানসীর অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতাটি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য পাঠ করিয়া কবিমনের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার আকারে লিখিত। কিন্তু কেবল কাব্যপাঠ-জনিত নির্বিকার অভিজ্ঞতাই এই কবিতার বক্তব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিমন কালিদাসের এই কাব্যের মধ্যে আপন হৃদয়ের প্রেম-সৌন্দর্য-ভাবনার প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করিয়াছে। যক্ষের সহিত একাত্ম হইয়া নদনদী-জনপদ-পর্বতের উপর দিয়া মেঘের সখ্য ও সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছে। পথচিহ্নহীন কোন্ অজ্ঞাত সৌন্দর্যের জনহীন প্রাসাদে বিরহ-শয্যায় লীনতনু এক সুরূপসী মানসসুন্দরীর জন্য তাঁহার অতৃপ্ত কবিমন অনির্দেশ্য বিষাদে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘদূত কাব্য পাঠ করিয়া কবির মানসিক চিন্তা কোন্ পথে প্রবাহিত হয়, সে বিষয়ে কবির একটি পত্রাংশ এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে।

'মেঘদূত' কবিতা রচনার সমসাময়িক এই পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখিতেছেন—

"বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা—এইজন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারই উপর আরোপণ ক'রে বিচিত্র নদী-পর্বত-বন-গ্রাম-নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে করতে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী-হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ।" এই শেষ পংক্তির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত কবিতার বক্তব্য নিহিত আছে। মেঘদূত যে রবীন্দ্রনাথকে এক আসন্ন বর্ষার মেঘান্ধকার বৃষ্টিচ্ছায়ামেদুর সজল সন্ধ্যায় উন্মনা করিয়া দিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ, ইহার মধ্যে কবির বন্দীহৃদয়ও যেন বিশ্বভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই, বন্দী হৃদয় বলিতে কবি কী বুঝাইয়াছেন? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই পৃথিবীর প্রতি মানুষই এক হিসাবে মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত নির্বাসিত। আমরা সকলেই একদা মালিন্যহীন শুভ্র নিষ্কলঙ্ক এক অপার সৌন্দর্যের রাজ্যের অধিবাসী ছিলাম। কিন্তু কর্মের প্রতি অতি মনোযোগের অপরাধে এই কর্মময় সংসারে যক্ষের মত অভিশপ্ত হইয়াছি। আমাদের চতুর্দিকে অশ্রুর লবনাক্ত সমুদ্র, আমরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নতার উপকূলে বাস করিতেছি। আমরা যে সৌন্দর্যলোকে বাস করিতাম, সেই চিরবসন্ত চিরযৌবন চিরসম্পদের রাজ্যে আমাদের বিরহিণী প্রিয়তমা আমাদের জন্যই নিত্যকাল অপেক্ষা করিয়া আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। যাহার সহিত আমরা মিলিত হইতে চাই সে আমাদের মানসলোকের অগম্য পারে বাস করিতেছে। সেই সৌন্দর্যের পরপারবর্তী মানুষটির কাছে সশরীরে যাইবার কোন পথ জানা নাই। কিন্তু মেঘ আসিয়া আপনার বিচিত্র-চিত্রবিন্যাসে গর্জনে বর্ষণে সেই সৌন্দর্যের রাজ্য ও তাহার মধ্যবর্তী নিঃসঙ্গ প্রিয়তমার জন্য আমাদের মনে ব্যাকুলতর বেদনা জাগাইয়া দিয়া যায়। আমরা নির্জন ঘরে বন্দী হইয়া আছি, স্বজনহীন প্রবাসের মত এই দিনরজনী দুঃসহ বোধ হইতেছে। ঠিক তখনই নববর্ষার শ্যামল সজলকান্তি ঘনমেঘ শত শতাব্দী পূর্বেকার অবন্তী-বিদিশা-উজ্জয়িনীর পরপার হইতে আবির্ভূত হইল। কালিদাস যে মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘে প্রাচীন ভারতের গিরিনদী-জনপদের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা ঠিক ভৌগোলিক অর্থে সত্য বলিয়া গ্রহণের

প্রয়োজন নাই। আমাদের মনের মধ্যে যে চিরসুন্দরের সমৃদ্ধ রাজ্যের চিত্র আছে, ইহা যেন সেই চিত্রটিকেই জাগাইয়া তোলে। উত্তরমেঘে কালিদাস অলকাপুরীর ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রাসাদ-প্রান্তবর্তী যে যৌবনগর্বিতা বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রমণীই যেন আমাদের নিত্যকালের মানস-সুন্দরী। অসীম সম্পদে নিমগনা থাকিয়াও যে প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিতেছে, সেই অন্তরলক্ষ্মীর জন্যই কবির রুদ্ধ হৃদয় আজ যন্ত্রণাক্ত হইয়াছে। সেই চিরসুন্দরের পথচিহ্নহীন প্রদেশে যাইবার পথখানিও হইবে সুন্দর। একের সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটাইবার জন্য প্রথমে অজ্ঞাত নিখিলের সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন। এইজন্যই তো পূর্বমেঘের পরিকল্পনা!

এই কারণেই মেঘদূত কাব্য পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রোমান্টিক কবিহৃদয়ের রুদ্ধ হৃদয় বন্ধন-মুক্তির আনন্দ লাভ করে। পূর্বমেঘের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কবির মন যেমন একটি নবীনসুন্দর বৃষ্টিধৌত অপরিচিত পৃথিবীর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তেমনি উত্তরমেঘের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার বিরহিত হৃদয়ের জন্য কোন এক দূরবিশ্বের একাকিনী বিরহিণী প্রিয়তমার অস্তিত্ব অনুভব করেন। এই বিশ্বের কোথাও একটি বিরহের স্বর্গলোক আছে, সেখানে আমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে কোনো প্রেমিকা, যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী—এই আশ্বাস পাইয়া কবি মনের মধ্যে একটি মুক্তি অনুভব করেন।

কিন্তু ইহাই কবিতাটির শেষ কথা নয়। শেষ পর্যন্ত একটি চিরবিরহের অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাসে 'মেঘদূত' কবিতাটি সমাপ্ত হইয়াছে। সেই সৌন্দর্যের রাজ্যে যে মানুষ সশরীরে কোনোদিন উপনীত হইতে পারিবে না, প্রেম যে চিরকাল অভিশপ্ত, এই গভীর বিষাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেঘদূত পাঠের অভিজ্ঞতা সমাপ্ত করিয়াছেন।

# অহল্যার প্রতি

## ভূমিকা

রামায়ণে অহল্যার পাষাণী হইবার কাহিনী আছে। ঋষি গৌতমের সুন্দরী পত্নী অহল্যা গৌতমের ছদ্মবেশে আগত ইন্দ্রের সহিত নিষিদ্ধ কামনায় লিপ্ত হইয়াছিল। এই অপরাধে গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণে পরিণত হইল। শাপমুক্তির শর্ত রহিল, দাশরথি রামচন্দ্র যখন সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর চরণ স্পর্শ করিবেন, তখন অহল্যা পুনরায় নারীরূপ ধারণ করিবে। এই পৌরাণিক কাহিনীর বীজমাত্র গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ অহল্যার প্রতি কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। পাষাণরূপে দীর্ঘকাল মৃত্তিকার গভীরে যে অহল্যা সুপ্ত ছিল, রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যেন তার সদ্য জীবনলাভ ঘটিয়াছে। জীবধাত্রী ধরিত্রীর মাতৃজঠর হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার মত কৈশোর-যৌবনের সীমাস্পর্শী বিকচসুন্দর অনিন্দিত তনুশোভা লইয়া সর্বপাপমুক্তা অহল্যা এই প্রসন্ন সূর্যকিরণ-শোভিত বসুন্ধরার তৃণশষ্পের বুকে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্পনায় সেই সদ্যোজাত সুকুমার তনুদেহটি দেখিয়া কবি যেন সৌন্দর্যের এক দেবীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তারপর তাঁহার ক্রমাগত প্রশ্ন, এতকাল ঐ যে পাষাণরূপে ধরিত্রীর বুকে লীন হইয়াছিল অহল্যা, বসুন্ধরার সেই গোপন রহস্যকেন্দ্রটি কিরূপ? যে মৃত্তিকার গভীর অন্তঃপুর হইতে লক্ষ লক্ষ জীবনের জন্য আনন্দরস সঞ্চারিত হইতেছে, সেই অন্তঃপুরে প্রবেশের বাসনা কবির বহুদিনের। কিন্তু জননী বসুন্ধরার বৃহৎ অঙ্গের উপরিতলেই আমাদের বাস। মাতৃবক্ষের নিগূঢ় অন্তরে প্রবেশের অধিকার তো আমাদের নাই। এও যেন মেঘদূতের ভাষাতেই বলা, 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে'? সুতরাং কবি যেখানে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, যে আদি জননীর রহস্যনিলয়ের আহ্বান তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে, সেই রহস্যের গভীর হইতেই উঠিয়া আসিল অহল্যা। তাই সদ্য-জীবনপ্রাপ্ত অহল্যাকে ঘিরিয়াই কবির প্রশ্ন শতধারায় যেন উৎসারিত

অহল্যা-কাহিনী

অহল্যার প্রতি কবির প্রশ্ন

জীবধাত্রী ধরিত্রীর রহস্যভেদের আকুতি

হইতেছে। অহল্যা এখানে উপলক্ষ মাত্র। কবির নবজাগ্রত বিশ্বচেতনা, বিশ্বানুভূতি, বিশ্বের মর্মরহস্য অবগত হইবার ব্যাকুলতা, বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রের সহিত একাত্ম হইবার উৎকণ্ঠাই অহল্যার মাধ্যমে আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। অহল্যা জননী বসুন্ধরার সন্তান, সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গে যেমন মাতৃজঠরের ঘ্রাণ, অহল্যার অঙ্গেও তেমনি বসুন্ধরার রহস্যময় অভ্যন্তরের ঘ্রাণ লাগিয়া আছে। ইহাই অহল্যার প্রতি কবির সারস্বত আগ্রহের কারণ। অহল্যা বসুন্ধরা নয়, কিন্তু বসুন্ধরারই প্রতীক তো বটেই।

অহল্যা মধ্যস্থা মাত্র

এখন প্রশ্ন এই যে, বিশ্বের সহিত একাত্ম হওয়া বা বিশ্বানুভূতি বলিতে আমরা কী বুঝি? রবীন্দ্রকাব্যের সহিত গভীর পরিচয় থাকিলে ইহা অনুভব করা বা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। মানসীর পূর্ববর্তী কাব্যে এই জাতীয় ভাবের যথোচিত বিকাশ ঘটে নাই, 'অহল্যার প্রতি' হইতেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বচেতনার জন্ম হইল। পরবর্তী সোনার তরী চিত্রা প্রভৃতি কাব্যে ইহা আরও বিতানিত হইয়াছে এবং ইহার স্বরূপ রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কবির এই বিশ্বচেতনাকে স্পষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পরবর্তী রচনার সাহায্য অপরিহার্য।

'অহল্যার প্রতি' কবিতার বিশ্বচেতনার স্বরূপ

কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অতি বিরাট এবং ব্যাপক, সীমাবদ্ধ মৃত্তিকা বা জীবনের মধ্যে তাহা কোনো কালেই সংকীর্ণ থাকে নাই। কোনো দেশ বা আঞ্চলিকতার মধ্যে তিনি আপনাকে নির্বাসিত করিয়া রাখেন নাই, মানুষকে একটি প্রদেশের বিশিষ্টতায় দেখিতে তিনি অভ্যস্ত নন। দেশকালাতীত জীবন যাহা সীমা হইতে অসীমের দিকে যাত্রা করিতেছে, তাহাই রবীন্দ্রকাব্যের উপাদান। প্রেমকে তিনি ক্ষুদ্র দেহোপভোগের মধ্যে করায়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, তাহাকে নিত্যকালে প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছেন। আমাদের বিরহবেদনায় যেমন আজও বৃন্দাবনের বিরহিণী রাধার আর্তবিলাপ মিশিয়া আছে, তেমনি আমাদের নির্জন হৃদয়ের হাহাকারের মধ্যে মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষের প্রলাপও মিশিয়া আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার লীলাচঞ্চলতার মধ্যে তিনি জন্ম-জন্মান্তরের কক্ষাবর্তন অনুভব করিয়াছেন। সমুদ্রে একটি তরণীর নিমজ্জনরূপ দুর্ঘটনার

মানসীর কবিতাবলীতে সীমা হইতে অসীমের দিকে প্রয়াণ

মধ্যে তিনি বিশ্বের সর্বত্রব্যাপ্ত সৃষ্টির একটি স্নেহপ্রেম-উদাসীন নির্মম নিষ্ঠুরতাকে প্রত্যক্ষ করেন। বিহারের দ্বিপ্রহরে একটি অখ্যাত পল্লীর কুটিরপার্শ্বে কুহুধ্বনি শুনিয়া কবির মনে হয়, যেন এই

ধীরে ধীরে বিশ্ববোধ

বিশ্বের বক্ষের কাছে 'কোন সরলা সুন্দরী' বসিয়া আছে। তাহার সম্মোহন-বীণায় নিনাদিত সৌন্দর্যের সরল সংগীতই শ্রান্তিহীন কুহুধ্বনি হইয়া বাজিতেছে। বিশ্বব্যাপী মানবের মনে এই গান যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রবেশ করিতেছে। বিশাল মানবপ্রাণ, অতীতের সুখদুঃখ, শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান, দেশকাল অভিভূত করিয়া কবির মধ্যে বর্তমান হয়। কী বিস্ময়কর এই অসীম অভিজ্ঞতা।

'কুহুধ্বনি'

'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি বলিয়াছেন, মঙ্গলমধুর প্রেমের স্পর্শে জীবনের গতি বৃদ্ধি পায়, নলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রানন্দ মূর্তি ধারণ করে, আর তখনই

বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

মানসীর 'দুরন্ত আশা' কবিতায় জীবন-যাপনের পদ্ধতি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কবি যে দুর্বার এক দৃপ্তযৌবন ইচ্ছা প্রকাশ

'দুরন্ত আশা'

করিয়াছেন, তাহাও সেই বিশ্বচেতনারই প্রকারভেদ—

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে!

মানসীর কবিতাগুলি এইভাবে পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়, 'বিশ্ব' শব্দটির প্রতি কবির যেন একটি সহজাত আকর্ষণ আছে। প্রেম সৌন্দর্য বা কোনো হৃদয়ভাব, সংগীত বা জীবনাসক্তিকে সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় তিনি দেখিতে অভ্যস্ত। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় কবি প্রকৃতির যে লীলাময়ী রহস্যময়ী রূপগুলি দেখিয়াছেন, তাহাও এক হিসাবে বিশ্বজনীন দেখা। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় আসিয়া এই সকল খণ্ডছিন্ন বিশ্বচেতনা কেন্দ্রীভূত হইল, সমগ্র বসুন্ধরা এখন কবির ভাবকল্পনার সামগ্রী হইল—বিশ্বের দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরে প্রবেশের গভীরতম আকুতি অহল্যার মধ্য দিয়া প্রচারিত হইল, ইহাই 'অহল্যার প্রতি'র জন্মকথা।

'অহল্যার প্রতি' কবিতার বিশ্বচেতনা আরও স্পষ্ট ভাষায় পরবর্তী কালের রচনায় প্রকাশিত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামক রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ হইতে কিছু চিঠির ভাষা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে

'অহল্যার প্রতি'তে বিশ্বানুভূতি সংহত

একটি চিঠিতে কবি বলিতেছেন—

"...এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত। সূর্যকিরণে আমার সুন্দর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দময় একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।..."

ছিন্নপত্র হইতে বিশ্বের প্রতি জন্মান্তরীণ আকর্ষণের স্বরূপ

আর একটি চিঠির অংশ হইতে—

"...আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম!......তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার উপর ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত।..."

বিচিত্র প্রবন্ধের 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ স্মরণীয়—

"অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে।...কোনো-এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয় শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি। সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে

আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোন খবর না দিয়া যখন হূহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি। তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মত মূঢ়ের মত কাঁপিয়াছি, আমাদের সর্বাঙ্গ ঝরঝর মরমর করিয়া পাগলের মত গান গাহিয়াছে, আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত।”

বিচিত্র প্রবন্ধের 'বসন্ত যাপন'

'অহল্যার প্রতি' কবিতার সহিত বিশেষভাবে সাদৃশ্য আছে সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার। অনেক সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার খসড়াই যেন 'অহল্যার প্রতি'। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি এই জীবধাত্রী বসুন্ধরার প্রতি তাঁহার আদিম প্রণের যে একাত্মতার চেতনা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়—

সোনার তরীর 'বসুন্ধরা'

ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা সনে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিকে দিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ;···
শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে।······
···আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন

যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।…

শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র পরে
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।……

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে।

এই সর্বাত্মক বিশ্বব্যাকুলতা সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি', উৎসর্গের ১৩ ও ১৪ সংখ্যক কবিতা, বনবাণীর 'আম্রবন' এবং আরও অসংখ্য কবিতায়-রচনায় পাওয়া যাইবে।

ভূমিকা দীর্ঘ হইল, কিন্তু 'অহল্যার প্রতি' কবিতার ভাববস্তুর অন্তরঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে রবীন্দ্রকাব্যের সহিত যে সাধারণ পরিচয়টুকু থাকা দরকার, তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বলা বাহুল্য, পরবর্তী কালে যাহা গভীর বিশ্বাসে পরিণত, 'অহল্যার প্রতি'তে তাহাই ক্ষীণ আকারে দেখা দিয়াছে। এই দিক দিয়া কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ।

**বস্তুসংক্ষেপ**

পাষাণরূপে অভিশপ্ত অহল্যা শূন্য পরিত্যক্ত তপোবনে প্রস্তরীভূত হইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যেন জীবদেহে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছে ; কবি এখন মৃৎশায়িত প্রস্তর-জীবন সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা জানিতে চাহিতেছেন। যে বিশ্বজননীর সহিত পাষাণ হইয়া অহল্যা মিশিয়াছিল, সেই জননীর মাতৃস্নেহের বেদনা, নীরব সুখদুঃখ ও তাঁহার সহিষ্ণুতার স্বরূপ জানিবার জন্য কবির কৌতূহলের সীমা নাই। মৃত্তিকার ঊর্ধ্বস্তরে জীবন্ত প্রাণীর মিলন-কলহ-ক্রন্দন-গর্জন ও পদধ্বনি কি মৃত্তিকার নিম্নস্তরে মহাশব্দ রূপে প্রবেশ করিয়া জননীর সহিত অহল্যার অর্ধজাগ্রত সত্তায় প্রবেশ করিত এবং মাতাকে নিত্য নিদ্রাহীনতার বেদনায় পীড়িত করিত, ইহাই কবির প্রশ্ন। যখন পৃথিবীর বক্ষে বসন্ত-বায়ু সর্বদিকে যৌবন-রোমাঞ্চ সঞ্চার করিত, সেদিন সেই ঊর্ধ্বমৃত্তিকার সার্বভৌম জীবন-প্রবাহ কি ভূনিম্নের অনুর্বরত্বকে দূর করিয়া অহল্যার পাষাণদেহে জীবনের কম্পন জাগাইয়া তুলিত না ? কিংবা দিবাবসানে যখন মনুষ্যলোকের সকল চাঞ্চল্য, জীবের সকল দুঃখশ্রম একটি সকরুণ শান্তি ও নিদ্রায় বিরাম লাভ করিত, তখন শতকোটি সন্তানের শিথিল অঙ্গের স্পর্শে ধরিত্রী-জননীর বক্ষে যে মাতৃসুলভ তৃপ্তি জাগিত, ধরিত্রীর বক্ষের কাছাকাছি থাকিয়া অহল্যা তাহার কতটুকু অনুভব করিয়াছিল, ইহাই কবির জিজ্ঞাসা। ( প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক )

বিশ্বের বর্ণকরোজ্জ্বল পুষ্পপত্রের অন্তরালে এক অসূর্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বসিয়া জননী বসুন্ধরা নিগূঢ় আনন্দরস দিয়া তাঁহার সন্তানদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ করিতেছেন, তাহাদের জীবন-যৌবন পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। ইহজীবনের লক্ষ কোটি জীব, প্রকৃতির পুষ্পপল্লব, আকাশের তারা, মানুষের সব কীর্তি, সব দুঃখদাহ মৃন্ময় লীলার অনিবার্য পরিণামে সেই গোপন মাতৃবক্ষে পরমা নির্বৃতি ও ধূলিস্নিগ্ধ বিরাম লাভ করে। সেই মাতৃবক্ষ-সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল কালচিহ্নহীন সুশীতল সুপ্তি ও শান্তির মধ্যে কাটাইয়া অহল্যা আবার ইহ-জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে—তাই মাতৃরহস্য সবই তাহার সুগোচর হইবার কথা। জননীর হৃদয়ঘনিষ্ঠ থাকিবার জন্য জননী আপন হাতে তাহার জীবনের সকল মালিন্য নিঃশেষে মুছাইয়া দিয়াছেন। তাই সদ্যোজাত অহল্যা শুভ্র নিরঞ্জন কুমারীর বেশে প্রভাত আলোয় জগতের প্রতি অবাক্ দৃষ্টি মেলিয়া আবির্ভূতা হইয়াছে। তাহার এলায়িত কেশে রাত্রির শিশির-বিন্দু পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল তাহার পাষাণের উপর যে সতেজ শ্যামল শৈবাল ঘন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিরাভরণ দেহের উপর তাহা যেন মাতার স্নেহপ্রদত্ত বস্ত্রের মত বিলগ্ন হইয়া আছে। ( তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক )

পাষাণ হইতে নারীদেহে রূপান্বিতা অহল্যার উদাসীন অপলক দৃষ্টির সম্মুখে পরিচিত সংসার হাসিমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। অহল্যা যেন কোন দূরজন্মের স্মৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। চারিপার্শ্বের কৌতূহলী জীবন অহল্যার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে আসিয়া সহসা নির্বাক হইয়া গেল। সেই পুরাতন অহল্যা আজ যেন এক নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। তাহার শৈশব যৌবনে বিকশিত, একই বৃন্তে পুষ্প ও ফলের মত। অপূর্ব রহস্যময়ী তাহার নিরাভরণ তনুদেহ—বিস্মরণের নীল সমুদ্র হইতে সদ্যোস্নাত উষার মত আবির্ভূতা হইয়াছে। ধরিত্রীর মাতৃজঠর হইতে সদ্যোপ্রসূত এই সৌন্দর্যময়ীর দিকে সমগ্র বিশ্ব নিষ্পলক বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া যেন চাহিয়া আছে, অহল্যাও সৃষ্টির রহস্য হইতে উদ্ভূতা হইয়া তাহার পূর্ব পরিচিত বিশ্বের দিকে অবাক্ মানিয়া চাহিয়া আছে—এক বিস্মরণের অধ্যায় হইতে ফিরিয়া পুরাতন পরিচয় যেন এক নবপরিচয়ে রহস্যময় হইয়া উঠিল। ( পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক )

## আলোচনা

'অহল্যার প্রতি' কবিতার পটভূমি এবং এই কবিতায় প্রকাশিত কবির বিশ্বচেতনার স্বরূপ কী, তাহা পরবর্তী রবীন্দ্র রচনা-অবলম্বনে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অহল্যার পৌরাণিক ইতিহাস এই কবিতায় অবান্তর, যদিও কবিতাটিতে তাহার প্রসঙ্গ দুই একবার আছে। এই দিক দিয়া 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটির কথাও স্বাভাবিকভাবে মনে পড়িবে। সুরদাস নামটিকেও কবি প্রাচীন ইতিকথা-কিংবদন্তী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিতার সুরদাস ও তাঁহার সমস্যা ছিল একান্তই রবীন্দ্রনাথের। মানসীর অন্যান্য কবিতায় প্রতিফলিত রূপ সৌন্দর্য ও প্রেমের যে সমস্যা কবি ইতিপূর্বে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই সুরদাসের জবানিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র—অথচ তথাকথিত সুরদাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য রক্ষা করিবার জন্য কবি হরিনামগান প্রভৃতি অনুষঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। আলোচ্য 'অহল্যার প্রতি' কবিতাতেও অহল্যাকে উদ্দেশ করিয়া কবি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব—অহল্যা একটি নাম ও উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু পৌরাণিক আভাস

কবিতায় পৌরাণিকতা

'সুরদাসের প্রার্থনা'র সঙ্গে তুলনা

অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কবি অহল্যার তপোবনাদিরও উল্লেখ করিয়াছেন। কবিতার মর্মবস্তুর সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। নামকরণের সার্থকতা রক্ষার জন্যই তাহার প্রয়োজন ছিল।

কবিতাটির সূচনা একটি জিজ্ঞাসার দ্বারা, এই জিজ্ঞাসা কবির নবজাত বিশ্বব্যাকুলতারই নামান্তর। যে বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্বধরিত্রী এতকাল আভাসে ইঙ্গিতে রূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া কবির নিকট এক বিপুল বিস্ময় হইয়া দেখা দিয়াছে, অকস্মাৎ তাহার মর্মবাণীটি কবি অহল্যার কাছে শুনিতে চাহিয়াছেন। কবির নিকট বিশ্ব মৃন্ময় জড় স্তূপ মাত্র নয়। এই জাগ্রত জননী-সত্তার অন্তরের পরিচয় লাভ করিবার জন্য তাই তাঁহার এত উৎকণ্ঠা। জননী-চিত্তের যে বিপুল বেদনা, মৌন মূক সুখদুঃখ, মাতৃধৈর্য ও স্নেহব্যাকুলতা লক্ষ কোটি জীবন ও তরুলতাগুল্মের সজীব প্রাণস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার উৎস কোথায়, *ইহাই কবির জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দু*। কবিও এই বিশ্ব-জননীর সন্তান—সন্তানের মাতৃকাতরতা লইয়াই তিনি ধরিত্রীর সকল তৃণলতা তরুশস্য জীবপ্রাণী, এক কথায় প্রকৃতির সকল বস্তু ও প্রাণের প্রতি এক বোধহীন নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করেন। সেই আকর্ষণের কোনো ভাষা নাই কোনো রূপ নাই—'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান'। জননীর প্রতি সন্তানের এই জন্মান্তরীণ আকর্ষণ যেন মর্ত্যদেহ ধারণের সহিত কিছুটা বিস্মৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাই 'সদ্যোজাত কুমারী'র নিকট মাতৃবক্ষের রহস্যস্পন্দন শুনিবার তাঁহার এই ব্যগ্রতা। একদা যে ভুবন-জ্রূণের মধ্যে কবিও লীন হইয়া ছিলেন, মৃত্তিকার সহিত ব্যাপ্ত হইয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, সূর্যালোকে সঞ্জীবিত ও বর্ষাধারায় রোমাঞ্চিত হইয়াছেন, তৃণরূপে অঙ্কুরিত ও বসন্ত পবনে মর্মরিত হইয়াছেন, সেই ভুবনের মধ্যে আজ আর নূতন করিয়া প্রবেশ করিবার কোনো অধিকার যেন তাঁহার নাই। কেবল অর্ধজাগ্রত কল্পনায়, জাতিস্মর অনুভবের দ্বারা সেই মাতৃকক্ষের রহস্য চেতনা তাঁহাকে কম্পিত করে মাত্র। তাই যে প্রশ্ন অহল্যার নিকট করা হইয়াছে, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি এই কবিতায় দেন নাই, প্রকৃতপক্ষে ইহা তো প্রশ্নমাত্র নয়। ইহার উত্তর তো কবির নিজেরই জানা। 'বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে একদেহ' হইয়া অহল্যা যখন বিলীন ছিল—

জিজ্ঞাসায় সূচনা

বিশ্বসৃষ্টির উৎস সন্ধানে

অহল্যার নিকট প্রশ্নের স্বরূপ

তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা-মাঝে ?

এই জিজ্ঞাসা অহল্যার প্রতি প্রসারিত হইলেও, পৌরাণিক অহল্যার দিক হইতে ইহার উত্তর শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ঐ মাতৃহৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে কবির সংশয়-মাত্র নাই। জীবধাত্রী ধরিত্রী জননীর অন্তঃপুরে যে সৃষ্টিপালনের বিপুল আয়োজন হইতেছে, লক্ষকোটি সন্তানের সুখদুঃখের রহস্য যে একটি কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতেছে, এই বিষয়ে কবির বিশ্বাস অকম্পিত বলিয়াই প্রশ্নগুলি এত সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণাত্মক হইতে পারিয়াছে। কিন্তু কবিতার তৃতীয় স্তবকে আসিয়া দেখি প্রশ্নের অবসান হইয়াছে। ধরণীর অন্তঃপুরের একটি আশ্চর্য কবিকল্পনার পরিচয় পাই—

সত্যই কি ইহা জিজ্ঞাসা মাত্র !

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে—
বিচিত্রিতা যবনিকা পত্র পুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা—তারই অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চির রাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে···

কালিদাস যেমন উত্তরমেঘে বর্ণিত অপার্থিব সৌন্দর্যস্বর্গে কবিকে লইয়া গিয়াছিলেন, অহল্যাও সেইরূপ কবিকে সেই অসূর্যম্পশ্য জগদভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছে। এই অন্তঃপুরটির জন্য কবির অন্তর শিশুকাল হইতেই উদ্‌গ্রীব।

'অহল্যার প্রতি' কবিতায় স্পষ্টত দুইটি অংশ আছে। ধরিত্রীর অন্তঃপুরে, সৃষ্টির রহস্য-নিলয়ের কেন্দ্রে, মাতৃবক্ষের 'স্নেহোৎসারের উৎসে

অনুগমনের আকাঙ্ক্ষা অহল্যার প্রতি সম্বোধনের আকারে প্রথম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবির বিশ্বানুসন্ধিৎসা অহল্যার নারীমূর্তির ধ্যানকল্পনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। কবি যেন সহসা কবিতাটির নামকরণের কথা স্মরণ করিয়া অহল্যার দিকে তাকাইয়াছেন। এই অহল্যা, যাহাকে তিনি রামচন্দ্রের পর পুনরায় মৃৎপ্রস্তর হইতে কল্পনার স্পর্শে সজীবিত করিলেন, তাহাকেই লইয়া এখন কী করিবেন? ধরিত্রীর সদ্যোজাত এই কুমারী সদ্যোস্নাত নিরঞ্জন সৌন্দর্য লইয়া আবির্ভূতা, বিস্মৃতিসমুদ্র হইতে উত্থিতা সৌন্দর্যের ভেনাসমূর্তি—কবি যেন নিজেই অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যের দেবীপ্রতিমাকে তো আর পৌরাণিক তপোবনে প্রেরণ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত কবিও এই ব্যাপারে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই—পুনরায় যেন স্থির প্রস্তরীভূত প্রতিমা করিয়াই তাহার দিকে বিশ্বের অপলক দৃষ্টি আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় লইয়াছেন—

কবিতাটির দুই অংশ

সৌন্দর্যের কবিতা

> তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়
> বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
> দোঁহে মুখোমুখী। অপার রহস্যতীরে
> চিরপরিচয়মাঝে সব পরিচয়।

এ রহস্য এ বিস্ময় বিশ্বের নয়, ইহা আপন সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টারই। জিজ্ঞাসা দিয়া যাহার সূচনা, বিস্ময়ে তাহার সমাপ্তি। বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত রহস্য ভেদ করিবার আগ্রহে যে কবিতার সূত্রপাত, আপন সৃষ্টির বিস্ময়ে সেই কবিতার পরিণাম। এমন অপরূপ কবিতা 'মেঘদূত' ছাড়া মানসী কাব্যে আর নাই। ছন্দে, সৌন্দর্য-প্রকাশে, বিশ্বচেতনায়, সৌন্দর্য সম্পর্কে গভীর দার্শনিকবোধে, কবিকল্পনা ও প্রতিভা মানসী কাব্যে কত পরিণত হইয়াছে, 'অহল্যার প্রতি' তাহার নিদর্শন।

জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়

## রূপতত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

(প্রথম স্তবক)

**কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি**—রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী অহল্যা দীর্ঘকাল পাষাণ হইয়া অভিশপ্ত ছিল, তারপর রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে

অহল্যা তাহার নারীদেহ পুনরায় লাভ করে। কিন্তু পাষাণে পরিণত হইলেও অহল্যা তো তাহার জীবলীলার অবসান ঘটায় নাই, কেবল তাহার সজীবতা সাময়িকভাবে, হয়ত বা কোনো অলৌকিকভাবে স্তব্ধীকৃত ছিল মাত্র। সুতরাং এই অব্যক্ত জীবনের সহিত মৃত্তিকার ভূগর্ভের প্রাণরহস্যের কোনো আপাতগোপন সম্পর্ক থাকিতে পারে ইহাই আলোচ্য কবিতার মূল কবিকল্পনা। এই জন্য পাষাণীভূত অহল্যার জীবন যেন এক দীর্ঘকালবাহিত স্বপ্ন মাত্র। একটি সুবিশাল নিদ্রার পর অহল্যা যেন রিপ্ ভ্যান্ উইংকল্‌এর মত আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিদ্রিতা স্তব্ধপ্রাণ প্রস্তরীভূত কালে অহল্যার কি কোনোই চেতনা ছিল না? না হয় তাহার জাগ্রত চৈতন্য সুপ্ত ছিল, কিন্তু অর্ধজাগ্রত অবচেতন কোনো মনক্রিয়া চলিয়াছিল কিনা তাহাই কবি জানিতে চাহেন। হয়ত সেই অবচেতন সময়েই অহল্যা মনুষ্যদুর্লভ এক স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই স্বপ্নটির পরিচয়ই জানিতে চাহিয়াছেন কবি। **অহল্যা**—রামায়ণ কাহিনী অনুযায়ী গৌতম ঋষির পত্নী, ইন্দ্র কর্তৃক উপভুক্তা। অহল্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। "হল শব্দের একটি অর্থ কদর্যতা। সকল প্রকার হল্য বা বিরূপতাশূন্য অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলে সত্যযুগে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট মানসপুত্রীকে অহল্যা নাম দিয়েছিলেন।" পাষাণী অহল্যাকে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র উদ্ধার করেন। সুতরাং এই সত্যযুগ হইতে দ্বাপর ও ত্রেতাযুগ পর্যন্ত অহল্যা প্রস্তরীভূতা ছিল। অহল্যা অর্থে কদর্যতাহীনা, রবীন্দ্রনাথ এই ব্যঞ্জনাটিকেও কবিতার শেষাংশে অপূর্বভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে অবশ্য অহল্যা শব্দটিকে কবি হলকর্ষণ-অযোগ্য ভূমি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ( রক্তকরবীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে কবির অভিমত জানা যাইবে। তবে এই সূত্রে তাহা অবান্তর। ) **নির্বাপিত-হোম-অগ্নি**—অহল্যাকে পাষাণীতে পরিণত করিয়া মহর্ষি গৌতম আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেই তপোবন আজ নির্জন অরণ্য মাত্র—সেখানকার হোম-যজ্ঞ চিরকালের মত নির্বাপিত। **আছিলে বিলীন……একদেহ**—অহল্যা প্রস্তরীভূত হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু কবির মতে অহল্যা যেন এই পৃথিবীর মৃন্ময় সত্তার সহিত একীভূত হইয়াছিল। **তখন কি জেনেছিলে তার মাতৃস্নেহ**—এই বসুন্ধরা এই মর্ত্য পৃথিবীকে কবি জননীরূপে দেখিতে চান। তাই মর্ত্যধূলির সহিত একীভূত প্রতিটি

পদার্থের মধ্যেই পৃথিবীর স্নেহবৎসলতা ও মাতৃকাতরতা মিশ্রিত বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন। অহল্যা যেহেতু মৃত্তিকাতলে বিলীন ছিল, সেইজন্য মৃন্ময়ী ধরিত্রীর স্নেহব্যাকুলতার অংশ তাহারও অনুভব করার কথা। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বসুন্ধরাকে জননীর পূর্ণগরীয়সী মূর্তিতে দেখিয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।

**ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা**—জড়প্রস্তরে পরিণত পৌরাণিক অহল্যার কোনো চেতনা থাকিবার কথা নয়, কিন্তু রোমান্টিক কবির পক্ষে সে যুক্তি চলে না। তিনি অহল্যাকে চেতনাহীন পাষাণ ভাবিবেন কিরূপে? অহল্যা তো অব্যক্ত জীবনে পরিণত হইয়াছিল, তাহার তো মৃত্যু হয় নাই। সুতরাং যে অস্পষ্ট চেতনা থাকিলে পৃথিবীর জননী হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য ও বক্ষোস্পন্দ অনুভব করা যায়, অহল্যার সেই চেতনামাত্র ছিল, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। **জীবধাত্রী……ধরণীর আত্মা-মাঝে**—এই ভূমণ্ডলরূপ জননী শত কোটি প্রাণের জন্ম দিতেছে, তাহার অন্তর্গূঢ় সত্তায় জীবনের রহস্য অঙ্কুরিত হইতেছে। মাতৃত্বের সকল লক্ষণই তাহার পূর্ণমাত্রায় থাকিবার কথা। সুতরাং জননী হইবার যে গভীর বেদনা, যে নীরব সহিষ্ণুতা—অহল্যা সেই জননীর গোপন সত্তায় একাত্ম থাকিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিল কিনা ইহাই কবির জিজ্ঞাসা। সন্তানধারণক্ষমা জননীর বক্ষোকাতরতা সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতে সমুদ্রের উপর অনুরূপ ভাষায় আরোপিত হইয়াছে—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

**ব্যাখ্যা—দিবারাত্রি অহরহ……অর্ধ জাগরণে**—'অহল্যার প্রতি'

কবিতায় পৌরাণিক অহল্যার প্রস্তরীভূত সত্তাকে বিশ্বধরিত্রীর সহিত একীভূত রূপে কল্পনা করিয়া কবি অহল্যার মধ্যস্থতায় জননী বসুন্ধরার মাতৃহৃদয়ের নিগূঢ় স্নেহবৎসলতা ও সৃষ্টিরহস্যের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন। অহল্যা একদা স্বামী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল এই মৃন্ময়ী জননীর সহিত মিশিয়াছিল। পৃথিবীর ধূলিকণার সহিত একাত্ম হইবার ফলে জননী হৃদয়ের যে সুখদুঃখ বেদনা-বিহ্বলতা স্নেহকাতরতা ও নির্বাক সহিষ্ণুতা, অহল্যার অর্ধজাগর সত্তায় তাহার অনুরণন উঠিত কিনা, কবি তাহাই জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। এই ভূমণ্ডলের উপরিভাগে চলিতেছে জীবলীলা। জননীর সৃষ্ট সন্তানগণ তাহাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ ক্রোধহিংসা স্নেহপ্রেমের লীলায় অবিশ্রাম প্রমত্ত হইয়া আছে। কখনও মিলনের আগ্রহ, কখনও বিচ্ছেদের বেদনা মিলিয়া সুখদুঃখের ধারায় যে মহাধ্বনি উঠিতেছে, তাহা জননীর ভূমিতলস্থ অন্তরে কি প্রতিধ্বনি তোলে? এই পৃথিবীর উপরিভাগে যে লক্ষ কোটি সন্তান চলাফেরা করিতেছে, তাহার সমবেত পদধ্বনি ভূমিগর্ভে কী গভীর শব্দের সৃষ্টি করে, তাহাই বা কে জানে? সন্তানের জীবনলীলার এই সকল ধ্বনি মাতৃবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ইহা জানিবার জন্য কবির আগ্রহের সীমা নাই, অথচ তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই বলিয়াই কবি অহল্যাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। পাষাণরূপে অভিশপ্ত থাকিলেও অহল্যা মাতৃবক্ষের কাছাকাছি ছিল। তাই পৃথিবীর ঊর্ধ্বভাগের সন্তানদের জীবনযাত্রায় মাতৃচিত্তের প্রতিক্রিয়ার সন্ধান অহল্যার পক্ষে জানা সম্ভব, এই অনুমানেই কবি অহল্যাকে এই সকল প্রশ্ন করিয়াছেন। পাষাণ হইলেও অহল্যা যেন একপ্রকার অব্যক্ত জীবনের অধিকারিণী ছিল। তাহার দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু অনুভব করিবার ইন্দ্রিয় হয়ত ছিল। হয়ত প্রাণলীলার সূক্ষ্ম বিকাশের অনুভূতি তাহাকে স্পর্শ করিত। চেতনা ও অচেতনার মধ্যবর্তী অবস্থা লইয়া অহল্যা যেন অর্ধজাগ্রত অবস্থায় মাটির মধ্যে বিলীন থাকিত, ইহাই কবির বিশ্বাস।

**বুঝিতে কি……মহাজননীর?**—পূর্ববর্তী চরণে 'তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ,' 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা' ইত্যাদি অংশেরই ইহা পুনরাবৃত্তি মাত্র। **যেদিন বহিত……করিত তোরে?**—ঋতুচক্রের আবর্তন ঘটে ভূমিরাজ্যের ঊর্ধ্বলোকে, পৃথিবীর উপরিতলে। বসন্তের বায়ুহিল্লোলে বনে বনে জাগে পুলকপ্রবাহ—সেই বসন্তের সমীরচাঞ্চল্য মৃত্তিকার তলদেশে

প্রবেশ করে কি না, উর্ধ্বলোকের তরুলতার পল্লবমর্মর নিগূঢ় শাখা-প্রশাখায় মাটির গভীরে পৌঁছায় কিনা, ইহা অহল্যার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কবির প্রশ্ন। তুলনীয়—"বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে। তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেখানে দুটো ফল ধরিবে, সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে"— (বসন্তযাপন: বিচিত্র প্রবন্ধ) **জীবন-উৎসাহ……সহস্র আকারে**—বসন্ত ফুল-ফোটানোর প্রাণ-ধরানোর ঋতু—সে শুষ্কতার অবসান ঘটাইয়া সবুজ প্রাণের কীর্তিকেতন উড়াইতে আসে। পৃথিবীর বুকে মরুভূমির মত যাহা কিছু রসহীন জীর্ণ প্রান্তর, তাহাকে তৃণময় করিয়া তোলাই তো বসন্তের কাজ। **উঠিত সে ক্ষুব্ধ……তব দেহ?**—পৃথিবীর বুকের উপর যখন বসন্তের প্রাণবাহিনী সবুজের সমারোহ লইয়া, শুষ্কতা জীর্ণতার অবসান ঘটাইয়া, তৃণলতা-তরুগুল্ম-ফলফুলের দ্বারা মরুভূমির সীমা সংকীর্ণ করিয়া তোলে, তখন মাটির তলদেশে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, কবি তাহা জানিতে চান। বিধাতৃশাপে অহল্যা মৃৎগর্ভে পাষাণ হইয়াছিল, সুতরাং যে বসন্ত ধরার উর্ধ্বে বন্ধ্যা মরুভূমিকে পুষ্পসম্ভব করিয়া তুলিত, সেই বসন্তের প্রাণচাঞ্চল্য মৃত্তিকার তলদেশে এই পাষাণ জড়স্তূপকে উর্বরা করিবার জন্য কি উন্মত্ত হইয়া উঠিত না? অর্থাৎ বসন্তের আগমনে যখন সবকিছুই মুকুলিত হইত, অহল্যার পাষাণ দেহ তখন সেই প্রস্তরীভূত বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিত না?

(দ্বিতীয় স্তবক)

**ধরণী লইত……বক্ষ 'পরে**—রাত্রি-আগমনে পৃথিবীর অসংখ্য জীবজন্তু প্রাণী ও মানুষ দিবসের শ্রমশেষে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হয়। কবির মতে, জননী বসুন্ধরাই যেন তাহার পরিশ্রান্ত অবসন্ন সন্তানদের আপন বক্ষে টানিয়া লয় এবং তাহাদের তাপ দূর করে। **তাদের শিথিল……ধরণীর বুক**—ইহাও কবিকল্পনা। বৃহৎ মাতৃবক্ষে শতকোটি জীব শ্রান্তিবশত নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে। তাহাদের অঙ্গগুলিকে তাহারা মেলিয়া দিয়াছে আলস্যে বিরতিতে অবসাদে। তাহাদের সেই শারীরিক আলস্য, নিদ্রাভিভূত শ্রান্ত নিশ্বাস সন্তানদের জন্য মাতার গভীর স্নেহ যেন উজাড় করিয়া আনে। নৈশ প্রহরে ঘুমন্ত সন্তানদের দেখিয়া জননী যেমন তৃপ্তি লাভ করে, অন্ধকার রাত্রে

এই ঘুমন্ত পৃথিবীর প্রাণীদের দেখিয়াও পৃথিবীর মাতৃবক্ষ সেইরূপ পূর্ণ হইয়া উঠে বলিয়া কবির বিশ্বাস। **মাতৃ-অঙ্গে……আপনার মাঝে**—শতকোটি অগণ্য জীব যখন পৃথিবীর কোলে পরম শ্রান্তি ও অবসাদে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নাই। যে প্রাণীদ্বয়ের মধ্যে আহারী-আহার্যের সম্পর্ক তাহারাও এক নিদ্রাবন্ধনে মাতৃস্নেহের প্রসাদ লাভ করিতেছে। এই যে নিখিল নিদ্রাভিভূত সন্তানের জন্য মাতৃবক্ষের তৃপ্তি ও গভীরতা, সকলের অঙ্গতাপ আপনার কোমল স্নেহঘন বক্ষের কাছে অনুভব করার আনন্দ, তাহার স্বরূপ লাভ করা তো জীববিশেষের পক্ষে অকল্পনীয়। তাই কবি অহল্যার নিকট তাঁহার জিজ্ঞাসা মেলিয়া দিয়াছেন, মাতৃবক্ষ-ঘনিষ্ঠ থাকিবার জন্য অহল্যা যদি সেই নিদ্রিত-সন্তান-শিয়রে মাতার স্নেহবিহ্বল করুণাছলছল অনুভূতির সন্ধান লাভ করিয়া থাকে।

( তৃতীয় স্তবক )

**যে গোপন……বর্ণের লেখা**—ধরিত্রীর গভীর কোনো অতল রহস্য-নিকেতনে বসুন্ধরার জননীরূপ বিরাজ করিতেছে—এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অনুপম কবিকল্পনার দৃষ্টান্ত। সেই অন্তঃপুর বহির্বিশ্বের নিকট চিরপ্রচ্ছন্ন, অথচ বহির্বিশ্বের সকল চাঞ্চল্য কোলাহল সেখানে প্রবেশ করিতেছে, বিশ্বের শতকোটি জীবের অঙ্গস্পর্শ সেই অন্তঃপুরে জননীদেহে আসিয়া পৌঁছায়। সেই অন্তঃপুরটি একটি সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। জগতের যত বর্ণ, শোভা, সুগন্ধ, তাহাই যেন নির্যাসরূপে এই বিচিত্র পত্রপুষ্প-সংবলিত আব্রু রচনা করিয়াছে। **তারি অন্তরালে……যৌবনে**—ধরিত্রীর নিগূঢ় অনির্দেশ্য কোন্ গোপন রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রকৃতি-নিসর্গের সমীভূত শোভা সমারোহের আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন বিশ্বজননী—সেখানে সূর্যের আলোককণাও প্রবেশ করে না। সেই গোপনতম রহস্যময় অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জননীর সত্তা বিশ্বের সকল পদার্থ প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে এক নিগূঢ় সম্পর্কে গাঁথা রহিয়াছে। তিনি গোপন থাকিয়াই সন্তানকে মৃত্তিকার প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিতেছেন, তাহার গৃহ ধনধান্যে শস্যে-সম্পদে ভরাইয়া দিতেছেন, বীজকে অঙ্কুররূপে, মুকুলকে পুষ্পরূপে, শৈশবকে যৌবনরূপে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। **সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে**—এই বিশ্বভূমিই জননী, জীবধাত্রী জননী বসুন্ধরা বলিয়া কবি একাধিকবার সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু জননীর আর একটি সূক্ষ্মরূপ আছে যেখানে তিনি কেবল জীবধাত্রী বলিয়াই জননী নহেন, যেখানে তিনি

নারীর প্রতীক মাত্র। তাই তাঁহার অন্তঃপুরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। মাতার এই গোপন কক্ষের সংবাদ বহির্বিশ্বের অগোচর। তুলনীয়—

ধরণীর অন্তঃপুরে
রাবরাশ্মি নামে যবে তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ( প্রণাম : পরিশেষ )

**সেই গূঢ়……বিস্মৃতি আলয়ে**—পাষাণী অহল্যা যেন জীবদেহ হইতে অভিশপ্ত হইয়া মাতার সেই গোপন অন্তঃপুর কক্ষে শান্তি ও বিস্মরণের শীতল শয্যায় অনন্তকাল ধরিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। জীবদেহের পরিণাম আমাদের নিকট মৃত্যু, কিন্তু কবির মতে তাহা জননীর এই আপন গোপন অন্তঃপুরে মাতার নিকট শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন মাত্র। ইহার তাৎপর্য এই যে, সশরীরে জননীর নিকট উপনীত হওয়া যায় না, সূক্ষ্ম শরীরেই কেবল মাতার স্পর্শসান্নিধ্য লাভ করা যায়।

**ব্যাখ্যা—যেথায় অনন্তকাল……দুঃখ দাহহারা**—এই পৃথিবীর প্রাণীসকল জীবলীলা-অবসানে মাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করে, মাতৃকক্ষের শান্ত ধূলির শয্যায় তাহারা অনন্তকাল নিরুপদ্রব নিদ্রায় বিভোর থাকে। পৃথিবীর উপরিতলে চলিতেছে প্রাণধারণের সংগ্রাম, প্রখর জীবনযুদ্ধ, আর্তনাদ, বিদ্বেষ ও শ্রান্তি। প্রতি মুহূর্তে যেমন শত শত প্রাণ জন্মলাভ করিতেছে, তেমনি আবার মুহূর্তে মুহূর্তে শত শত জীবনের অবসান ঘটিতেছে। দেহাবসানে সেই সকল পার্থিব প্রাণ ও পদার্থ বিরাম লাভ করিতেছে বিশ্বের মৃত্তিকার তলদেশে, মাতা যেখানে পরম স্নেহে সন্তানের জন্য শয়ন পাতিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে আর কোন সংগ্রামের আর্তনাদ নাই, জীবনযুদ্ধ নাই, জীবদেহ ধারণের শ্রান্তি নাই, দুঃখদৈন্য নাই। দিনের প্রখর তাপে ফুল শুকাইয়া পড়িতেছে, জরাগ্রস্ত পল্লব ধূলিতে খসিয়া পড়িতেছে, আকাশের তারার মত কোনো সুন্দর জীবন জ্বলিয়া নিঃশেষ হইতেছে, মানুষের কত কীর্তি ধূলায় মিশিতেছে, কত সুখ শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, কত দুঃখ উত্তাপ হারাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু কোথাও কোনো অনুতাপ নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই, অচরিতার্থতার আর্তস্বর উঠে না। মাতা সব কিছুকেই আপনার কোমল স্নেহঘন প্রশান্ত কোলে টানিয়া লইতেছেন।

( চতুর্থ স্তবক )

**সেথা স্নিগ্ধ……দিয়াছে মাতা**—মাতৃকক্ষের নিগূঢ় শান্তিনিকেতনে ক্লান্ত জীব যখন জীবনলীলা অবসানে বিরাম লাভ করে, তখন মাতা তাহার স্নেহসিঞ্চিত করুণাঘন করস্পর্শের দ্বারা সন্তানের ঐহিক জীবনের দুঃখতাপ পাপদৈন্য সব নিঃশেষে মুছাইয়া দেন। অহল্যা যে ভ্রষ্টাচারের অপরাধে অভিশপ্ত হইয়া প্রস্তরীভূত মৃৎশায়িত জীবন যাপন করিল, সেই মৃত্তিকা স্পর্শে তাহার অভিশাপ স্বতঃই মুছিয়া গেল। জননীর স্নেহসান্নিধ্যই অহল্যার অভিশাপ মোচনের কারণ—রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শের ইঙ্গিত কবি এখানে করেন নাই। ইহাই এই কবিতার আধুনিকতা। **দিলে আজি……সরল শুভ্র**—পাষাণ-অভিশাপ-মোচনের পর অহল্যা পুনরায় মাতৃজঠর হইতে এই মৃৎপৃথিবীর উপর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু অহল্যা প্রাপ্তবয়স্কা অবস্থায় অভিশপ্ত হইয়াছিল। এখনও তাহার সেই বয়সই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সেদিন অহল্যা ছিল পরিণীতা, আজ জীবনের সকল মালিন্য মুক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া অহল্যা শুভ পবিত্র নিষ্পাপ কুমারী—সে মাতা কন্যা বধূ কিছুই নয়। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার পূর্বাভাস। **হয়ে বাক্যহত ……জগতের পানে**—মৃৎগর্ভ হইতে সদ্যোজাত কুমারী অহল্যার বিস্ময়াবির্ভাবটিকে চিত্রিত করিয়াছেন কবি এই ছত্রগুলিতে—অহল্যা প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে এই জগতের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে বাক্যহীন মৌনী হইয়া চাহিয়া আছে। একদা এই বিশ্বের সহিত জড়িত ছিল কিন্তু দীর্ঘ বিস্মৃতির পর আবার সেই বিশ্বে ফিরিয়া আসার বিস্ময়ই যেন এই বাক্যহীনতার কারণ। **যে শিশির……কৃষ্ণ কেশপাশে**—অহল্যার যে রূপমূর্তি বর্তমান স্তবকে কবি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কোনো পৌরাণিক নারীর নয়, তাহা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-কল্পনা, কবির কল্পনারী ideal beauty মাত্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য দিয়াই এই নারী-সৌন্দর্য নির্মিত। ইহা যেন শেলি কথিত Intellectual Beauty, যাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

> Spirit of Beauty, that dost consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form.

তাই সেই আজানুলম্বিতকেশা সদ্যোজাত নির্ণিমেষনয়না বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জ্যোতির্ময়ী রূপখানির ধ্যানমূর্তি আঁকিতে বসিয়া কবি প্রকৃতির নির্মল উপকরণ

আহরণ করিয়াছেন। রাত্রিবেলা পাষাণের উপর যে শিশিরবিন্দুপাত হইয়াছিল, তাহা এই সুন্দরীর কৃষ্ণকেশে কাঁপিতেছে। **যে শৈবাল……সুকোমল স্নেহে**—পূর্ব চরণের মত এখানেও সেই প্রাকৃত পদার্থের ভূষণে অহল্যাকে সাজাইবার প্রয়াস। পাষাণীরূপে পড়িয়া থাকিবার জন্য অহল্যার দেহের উপর ঘন শৈবাল জন্মিয়াছিল, বহু বর্ষার জল পাইয়া তাহা ক্রমশ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন অহল্যার নিরাবরণ দেহের উপর সেই শৈবালের স্তর যেন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক বস্ত্র বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মূর্তি, তাহার লজ্জা নিবারণের জন্য মনুষ্য সমাজের বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। ধরিত্রী জননী যেন আপন স্নেহকেই শৈবালরূপ আবরণ করিয়া অহল্যার তনুদেহে সাজাইয়া দিয়াছেন।

( পঞ্চম স্তবক )

**হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার**—দীর্ঘকাল পরে অহল্যা জীবদেহ ধারণ করিয়া তাহার পরিচিত সংসারে আশ্রম তপোবনে, এক কথায় এই পৃথিবীর মৃত্তিকা'পরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইহা যেন তাহার এক বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবন, এক জীবন হইতে আর এক জীবনে রূপান্তরিত হওয়াও নয়—কারণ অহল্যার স্মৃতি সম্ভবত লুপ্ত হয় নাই, আর তাহাকে দেখিয়া পরিচিত সংসার চিনিতেও পারিতেছে। মাঝখানে কেবল একটি নীরব বিস্মরণ বিরাজ করিতেছে। **তুমি চেয়ে নির্ণিমেষ**—প্রত্যহের চেনা জগৎ প্রসন্ন স্মিতহাস্যের দ্বারা অহল্যাকে অভ্যর্থনা জানাইল, কিন্তু অহল্যা দেহলাভ করিয়া, চেতনা লাভ করিয়া যেন বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এতকাল সে কোথায় ছিল, তাহার চেতনা কোথায় ছিল, অবচেতন সত্তা হইতে তাহা স্মরণ করিতে করিতে যেন সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল—অপলক দৃষ্টিতে বহুকাল পরে দেখা এই জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—এই ছবিটি কবি এখানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। **হৃদয় তোমার……চিনে চিনে**—আপনার প্রস্তরীভূত জড়তা হইতে মুক্তি পাইয়া অহল্যা যখন তাহার পরিচিত তপোবনে পুনরায় জীবন্ত মানবীর দেহ ধারণ করিল, সেই মুহূর্তে তাহার স্মৃতি জাগরণের অধ্যায়টি কবি নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একদা যে তপোবন অহল্যার দৈনন্দিন শত কাজের দ্বারা পরিচিত ছিল, সেই তপোবন তাহার নিকট এখন অপরিচিতবৎ; সেই তপোবনের যে পথে অহল্যা নিয়মিত যাতায়াত করিয়াছিল, আজ যেন ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে তাহার

নিকট সেই পথের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হইতেছে। [ অহল্যার দিক দিয়া এই মনোভাব যেমন সত্য, তেমনি কবির দিক দিয়াও ইহার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। এই পৃথিবীর সহিত কবিও একদা অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, পৃথিবীর ধূলিকণার সহিত মিশিয়া ছিলেন। ইহার বিবর্তনের স্তরগুলি একে একে পার হইয়া, আজ কবি যে জীবদেহ ধারণ করিয়াছেন, ইহাও সেই অহল্যার মতই পাষাণ হইতে মানবীতে রূপান্তরিত হওয়ার মত। সুতরাং এই জীবদেহ ধারণের পর জননী বসুন্ধরা—যাহার অভ্যন্তরে কবি একদা লীন হইয়া ছিলেন, কবির নিকট অপরিচিত মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অপরিচয়ের রহস্য পার হইয়া যায়—তখন এই পৃথিবীর সহিত কবির বহু জন্মান্তরের নিগূঢ় নাড়িবন্ধনের স্মৃতি মনে পড়িয়া যায়। বিশ্বের সহিত মানবমনের সেই জাতিস্মরতার কথাই যেন অহল্যার অনুভূতির মাধ্যমে কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।] **চারিভিতে**—চতুর্দিকে। **কৌতুহলে……সম্মুখে তোমার**—যে সংসারের একজন হইয়া একদা অহল্যা বর্তমান ছিল, আজ যখন জন্মান্তর লাভ করিয়া কুন্দশুভ্র সৌন্দর্যস্নাত রূপে সেই সংসারে তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিল, তখন তাহার সেই পরিচিত সংসার অহল্যাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে যেন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। **থেমে গেল……অনিমেষে**—অহল্যা আজ যে মূর্তিতে পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছে সে মূর্তি তাহার তপোবনের নারীরূপ মাত্র নয়—এখন বিশ্বের গভীর প্রাণকেন্দ্র হইতে সৃষ্টিরহস্যের অতলান্ত হইতে তাহার প্রত্যাবর্তন ঘটিয়াছে—সে এখন জাগতিক পাপতাপমুক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। মালিন্যহীন কলুষমুক্ত এই সৌন্দর্যপ্রতিমা দেখিয়া তাই প্রত্যহের পরিচিত সংসার বিস্ময়ে নির্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। [ রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাতেও ( চিত্রা ) দেখা যায়, বসনহীন অতুল সৌন্দর্যের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক প্রতিমারূপিণী নারীর সম্মুখে ফুলধনুর্ধর মদন বিস্মিত হইয়া ফুলধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।]

( ষষ্ঠ স্তবক )

**অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন**—অহল্যার এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমূর্তির পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, ইহার সহিত পৌরাণিক কল্পনার সম্পর্ক নাই। যাহা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, তাহাকে বিবসনা নারীরূপেই কবি অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চিত্রার 'বিজয়িনী' কবিতা দ্রষ্টব্য। আদিম বসন্ত প্রাতে সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী উর্বশীর বর্ণনাও তাই—'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি

সুরেন্দ্রবন্দিতা'। এই বিশুদ্ধ বাসনাহীন সৌন্দর্যের সহিত যে বিস্ময় জড়িত তাহাই তাহাকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। **নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন**—অহল্যা যৌবনের পূর্ণতায় দাঁড়াইয়া, কিন্তু বিশ্বজননীর অকলঙ্ক ক্রোড় হইতে নামিয়া আসিল বলিয়া তাহার যৌবন নিষ্পাপ, বাসনাহীন। সেই যৌবন ফুলের মত শুভ্র, তাহার নির্দোষ শুচিতা বুঝাইতেই শৈশব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বয়সের দিক দিয়া অহল্যা পূর্ণ যুবতী, কিন্তু মনের দিক দিয়া শৈশবসুরল। তুলনীয়, চিত্রার 'উর্বশী' কবিতায়---

যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

**পূর্ণস্ফুট পুষ্প……এক বৃন্তে**—শ্যামসবুজ পত্রপল্লবের বুকে যেমন ফুলটি সৌরভে ফুটিয়া উঠে, তেমনি শ্যামল শৈশবতুল্য সরলতার পর্ণপুটে ফুলের মত অহল্যার যৌবনখানি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেন একই বৃন্তে শৈশব ও যৌবন, সরলতা ও রূপশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। **বিস্মৃতি সাগর……উঠিয়াছ ধীরে**—সৌন্দর্যপ্রতিমা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছে, এই রূপকল্পটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু অহল্যা তো ভূমিগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, সুতরাং সেক্ষেত্রে সাগরের কল্পনা সম্ভব হয় না। তাই কবি বলিয়াছেন যে, অহল্যা যেন বিস্মৃতিরূপ নীল সমুদ্রগর্ভ হইতে নবাবির্ভূত প্রভাতের মত শুভ্রবেশে সদ্যস্নাতা রূপে উত্থিতা হইল। তুলনীয়,

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত। (উর্বশী—চিত্রা)

**তুমি বিশ্বপানে……কথা নাহি কয়**—জন্মান্তরিত অহল্যার নিকট এই একদা পরিচিত বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতের নিকট একদা পরিচিত অহল্যা উভয়ই পরম বিস্ময়ের উপাদান। তাই উভয়ে উভয়ের দিকে রহস্যাতুর নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই। তুলনীয়,

"অনেকদিন পরে আবার এই ব'ড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা সাক্ষাৎ হল। সেও বললে, 'এই যে'। আমি বললুম, 'এই যে'। তারপরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি, আর কোনো কথাবার্তা নেই।" (ছিন্নপত্র)

**ব্যাখ্যা—তুমি বিশ্বপানে……নব পরিচয়**—অন্ধ ভূমিগর্ভ হইতে অহল্যা যেদিন জীবদেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্যমানবীরূপে এই সংসারে আবির্ভূতা হইল সেদিন তাহার অপূর্ব রহস্যময়ী বিবসনা সৌন্দর্য দেখিয়া পরিচিত বিশ্বজগৎ অবাক্ বিস্ময়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মৃত্তিকার তলদেশে জীবধাত্রী বসুন্ধরা জননীমূর্তিতে যেখানে পৃথিবীর প্রাণসৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, সেই মাতৃক্রোড় হইতে অহল্যা নতনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পার্থিব জীবনের সকল পাপতাপ জননী আপনার হস্তে মুছাইয়া দিয়া তাহাকে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। পরিপূর্ণ যৌবনে প্রস্ফুটিতা অহল্যার দেহে কোনো কালিমা কলুষতা নাই—শিশুর মত সরল পবিত্র তাহার রূপ—তাই অহল্যা আদিম দেহে বাসনাহীন বিকশিত সৌন্দর্য লইয়া আবির্ভূতা হইয়াছে। এইভাবে অহল্যা তাহার পূর্বজন্মের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়াছে, অথচ পূর্বজন্মের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। পরিচিত সংসারও অহল্যাকে চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু তথাপি নবরূপে অহল্যাকে দেখিয়া একপ্রকার রহস্য অনুভব করিতেছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে অস্পষ্ট রহস্যের সম্পর্ক। প্রতিদিনের চেনাশোনা সংসার আর অহল্যার মাঝখানে যেন একটি রহস্যের নদী স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহারই তীরে উভয় উভয়কে চেনা-অচেনার মিশ্রিত অনুভূতি দিয়া দর্শন করিতেছে।

## প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ১। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর।** আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ২। জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণময়ী সত্তার অনুভব, প্রকৃতির অভ্যন্তরে মাতৃমূর্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য। 'অহল্যার প্রতি' কবিতা অবলম্বনে ইহা আলোচনা কর।**

**উত্তর।** ভূমিকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ৩। পৌরাণিক আধারে পরিকল্পিত হইলেও 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রোমাণ্টিক সৌন্দর্যকল্পনার দ্বারা যেমন**

**প্রভাবিত হইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সত্যকেও তেমনি অস্বীকার করেন নাই—এইরূপ মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।**

**উত্তর।** 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটির বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে পুরাণ হইতে সংগৃহীত। রামায়ণে অহল্যার প্রস্তরীভবন ও শাপমুক্তির ঘটনা আছে। সত্যযুগে ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যা ইন্দ্রের সহিত অসৎ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য স্বামী-কর্তৃক পাষাণস্তূপে পরিণত হয় এবং ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পাদ-স্পর্শে অহল্যা পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে পুনর্দেহ-প্রাপ্তির পর শূন্য পরিত্যক্ত তপোবনে পাষাণ-আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, মৃত্তিকান্ধকার ভেদ করিয়া উত্থিতা, পূর্ণ-বিকশিতা সৌন্দর্যরূপিণী অহল্যাকে সম্বোধনপূর্বক কবি 'অহল্যার প্রতি' লিখিয়াছেন। এইটুকুই এই কবিতার পৌরাণিকত্ব।

নামমাত্রেই অহল্যা পৌরাণিক নারী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিকল্পনায় অহল্যার পৌরাণিক প্রতিকৃতির পরিবর্তে একটি নূতন সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অহল্যাকে কবি কেবল শাপমুক্তা রূপে দেখেন নাই, তাহার নূতন মানবজন্ম পরিগ্রহণকে কবি বিশ্বের মৃৎসত্তার সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়াছেন। এই পৃথিবীর জীব জগৎ ও প্রাণীসমাজ এই বৃহৎ পৃথিবীর একই প্রাণের বিবর্তনে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন। একটি গানে কবি গাহিয়াছেন,

আমি তোমারই মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা॥
পবিত্র জানি যে তুমি পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা প্রাণের পুণ্যে ভরা॥
কোন স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে
রহি তোমার বক্ষ-'পরে।
আমি যে তোমারই আছি নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার মোহিনী শক্তি দাও আমারে হৃদয়-প্রাণ-হরা॥

কবির অহল্যা এই গানের ভাষার মত 'জননী বসুন্ধরা'র 'মাটির কন্যা,' এখন মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। জননীর বক্ষের সান্নিধ্য হইতে সে সদ্য ভূমির উপরিতলে আবির্ভূতা। পৌরাণিক অহল্যা নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়া কোন্ মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল এই বিষয়ে পুরাণকারের কোনো কৌতূহল

ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিগর্ভে মাতৃজঠরের গোপন কক্ষে সংগুপ্ত থাকিয়া যে সত্য দেহ ধারণ করিল, তাহার নিকট রোমান্টিক কবির প্রশ্নাকুলতার শেষ নাই। এই ভূমণ্ডলের অপরিচিত কোন্ রহস্যকেন্দ্রে প্রাণসৃষ্টির উৎস বিরাজ করিতেছে, তাহাই অহল্যার মধ্যস্থতায় কবি জানিতে চান। যে অহল্যা মাতৃদেহের সহিত একদেহ হইয়াছিল, সে কি সেই বিশ্বজননীর স্নেহ-বেদনার সন্ধান পাইয়াছিল?

ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা-মাঝে?

অহল্যার নিকট কবির এই জিজ্ঞাসা ঠিক পুরাণ-জনোচিত নয়। এইজন্যই 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবি পুরাণের প্রসঙ্গমাত্র গ্রহণ করিয়া অহল্যাকে একটি নূতন নারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কবিকল্পনায় তাঁহার রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বচেতনা যুগপৎ কার্যকরী হইয়াছে।

রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা বলিতে এক প্রকার আদর্শবাদী বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি এক জাতীয় কবিপ্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহকে বুঝায়, যাহা এই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগতের তুচ্ছতার মালিন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমাদের প্রাত্যহিক সংসার তাহার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার দ্বারা প্রতিদিন জীর্ণ হইতেছে বলিয়া এখানে কোনো সৌন্দর্যই বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহাকিছু নিকটবর্তী, তাহা ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা মলিন। তাই রোমান্টিক কবিদৃষ্টি এমন এক কল্পসৌন্দর্যের সন্ধান করে, যাহা আমাদের প্রাপ্তির অগম্য, যাহা কোনো লোকায়ত সংসারের প্রয়োজনের দাসত্ব করে না। পৌরাণিক অহল্যার পুনর্জাগরিত রূপের মধ্যে কবি সেই মালিন্যহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কল্পমুরতিখানি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মৃত্তিকার পাষাণস্তূপ হইতে অহল্যা যখন পুনরায় তাহার অনিন্দিত নারীরূপখানি ফিরিয়া পাইল; পুরাণকাহিনী মতে তখন তাহার শাপমোচন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রোমান্টিক কবির নিকট অহল্যার সেই নারীরূপটি আরও প্রসারিত সত্যে উদ্ভাসিত, আরও বিশুদ্ধ নির্বস্তুক হইয়া দেখা দিল। মাতৃজঠর হইতে সদ্যোভূমিষ্ঠ সন্তান

যেমন পবিত্র ও নিষ্পাপ, অহল্যাও বিশ্বজননীর গোপন বক্ষ হইতে মৃৎ-পৃথিবীতে তেমনি নিষ্কলঙ্করূপে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অথচ তাহার অঙ্গে তখন ললিত যৌবন, তাহার তণুদেহে তখন যৌবন-শোণিমা, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব তখন শোভাশ্রীতে হিল্লোলিত। প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য তাহার প্রসাধন, মাতৃপ্রদত্ত শৈবাল তাহার আবরণ, রজনীর শিশির তাহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণকেশের শোভা। ইহাই অহল্যাকে রোমান্টিক কবিকল্পনায় চিত্রিত করা—কারণ অহল্যার এই সদ্যোজাত সৌকুমার্য কোনো পার্থিব সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। অহল্যা এখন কাহারও মাতা কন্যা প্রিয়া বা পত্নী নয়। অহল্যা এখন সর্ব-সৌন্দর্য-আধার বিশ্বজননীর সন্তান—মাটির উৎপন্ন ফুলটির মতই বিশুদ্ধ। তাই পরিচিত হইয়াও অপরিচিত বিস্ময়ে আবৃত এই অনিন্দিত তণুদেহের দিকে পরিচিত সংসার রহস্যগর্ভ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা পানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখী ! অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।

এই সৌন্দর্যচেতনার সহিত কবি 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টির উদ্ভব ও বিকাশের রহস্যলোকে অনুপ্রবেশের জন্য এক প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেরও পরিচয় দিয়াছেন। কবি বিবর্তনবাদী, তিনি এক হিসাবে বিশ্বসৃষ্টির বিবর্তনবাদী তত্ত্বে ( theory of evolution ) বিশ্বাস করেন। এই বিশ্ব যে ভাবেই সূর্যোৎক্ষিপ্ত গ্রহরূপে সৃষ্ট হোক না কেন, এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় প্রাণসৃষ্টির আদি রূপটি ছিল একই প্রকার, এবং সেই এক প্রাণের বিকাশেই লক্ষ কোটি বর্ষ ধরিয়া পৃথিবীর তরুলতা শত সহস্র জীবপ্রাণী মানুষের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের সহিত, তরুলতা জীবজন্তুর সহিত এইরূপে একটি আদিম জন্মগত সহজাত সম্পর্ক আছে। প্রাণের এই সর্বাত্মকতার তত্ত্বটি জীববিজ্ঞানও অস্বীকার করে না। একই জীবকোষের বিবর্তনেই যে পৃথিবীর লতাগুল্ম হইতে সুরু করিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণীর জন্ম ঘটিয়াছে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি স্মরণ রাখিলে 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটির আবেদন সহজেই অনুভব করা যাইবে। জীববিজ্ঞানের প্রাণ-সৃষ্টির তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়াই কবি এই বিশ্বের সকল প্রাণ সকল জড়-সচেতন জীবসত্তা

প্রাণসত্তার সহিত আত্মার একটি নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক চেতনাই কাব্যগত একটি সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া এই মৃৎপৃথিবীর অবিশ্রান্ত অন্তঃপুরে একটি ধৈর্যময়ী স্নেহশীল জননীর কল্পনায় নিয়োজিত হইয়াছে। একটিমাত্র বিশ্বজননীর অস্তিত্বে কবি বিশ্বাস করেন, সুতরাং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ, মৃত্তিকার উপরিতলের যাবতীয় প্রাণ, সবই সেই জননীরই সন্তান। সুতরাং সেই জননীর রহস্যকেন্দ্রে, মাতৃকক্ষের সেই অন্তঃপুর-নিকেতনে, সৃষ্টিরহস্যের সেই চিরঅজ্ঞাত অন্ধগর্ভে অনুপ্রবেশের অক্ষমতায় কবি তাঁহার অপরূপ বিশ্বচেতনাটিকে একটি আকুল সনির্বন্ধ প্রশ্নের আকারে অহল্যার নিকট মেলিয়া ধরিয়াছেন, যে এইমাত্র সেই রহস্যকেন্দ্র হইতে, সেই মাতৃকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্ভুবনে আবির্ভূত হইয়াছে। এই যে কবির বিশ্বচেতনা, ইহা একটি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং রোমাণ্টিক সৌন্দর্যচেতনা ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে মিশ্রিত করিয়াই পৌরাণিক অহল্যার আধারে কবি এই অনবদ্য কবিতাটি রচনা করিয়াছেন।

---